Title

কিতা দিতাম!

আরিফ আজাদ

এর ফেসবুক ও ব্লগ পোস্ট

কে এই আরিফ আজাদ?

কে জানে!!!

আমরা মুল টেক্সট এর কোন রুপ পরিবরতন করি নি। ফেসবুক ও আরিফ আজাদের ব্লগ থেকে যেমন কপি করেছিলাম তেমনি রেখে দিয়েছি। তবে বিভিন্ন যায়গায় হাইলাইট করেছি, বোল্ড করেছি ইত্যাদি। যেগুলো টাইটেল নাই সেগুলো টাইটেল আমরা দিয়েছি। আরিফ আজাদ ভাইয়া দেয় নাই দেখে দিতে হয়েছে। আরিফ আজাদ ভাইয়া যেগুলোর নাম দিয়েছেন সেগুলোতে ‘’ আছে। প্রথমে চিন্তা হয়েছিল যে আরিফ আজাদ ভাইয়ার পারমিসান ছাড়া ই-বুক তৈরি উচিত হবে কিনা। পরে মনে হল নাস্তিক্রা খারাপ উদ্দেশে তো একাজ করেছে, তাহলে আমরা কি ভাল কাজের জন্য এটি করতে পারি না? আরিফ আজাদ ভাইয়ার অসাধারণ লেখা আরও সুন্দর করে উপস্থাপনের চেষ্টা করেছি। আরিফ আজাদ ভাইয়ার লেখা গুলো একসঙ্গে এঈ ই বুক এ রেখেছি। নতুন লেখা আসলে নতুন ই-বুক হবে। অবশেষে আরিফ আজাদ ভাইয়া কাছ হতে অন্তরের গভির হতে ক্ষমা চাচ্ছি যদি তিনি রাগ করে থাকেন। আশা করি তিনি মাফ করবেন। আসলে আমরা জানতাম না কিভাবে পারমিসান নিব.........সালাম।

কোনরকম সমস্যা এর ব্যপারে জানানোর জন্য ই-মেইল করতে পারেন এইখানে kanababa183@gmail.com

সংক্ষেপে প্যারাডক্সিক্যাল সাজিদ

বর্তমান যুগ হলো প্রেজেন্টাশানের যুগ। একটা জিনিসকে আপনি কিভাবে, কতোটা সহজে, কতোটা সাবলীলভাবে, কতোটা মাধুর্যতায় প্রেজেন্টেশান করছেন তার উপর কিন্তু অনেক কিছুই নির্ভর করে। ন্যাচারালি, মানুষের একটা স্বভাব হচ্ছে –এরা তত্বকথা খুব কম হজম করতে পারে। এরা চায় সহজবোধ্যতা। প্যারাডক্সিক্যাল সাজিদ এর লেখক আরিফ আজাদ ঠিক এই পদ্ধতিই বেছে নিয়েছেন। তিনি গতানুগতিক লেকচার বা তত্বকথার ধাঁচে না গিয়ে, বক্তব্যের বিষয়গুলোকে গল্পের ধাঁচে ফেলে সাজিয়েছেন। প্রতিটি গল্পের শুরুতেই আছে মজার, আগ্রহ উদ্দীপক একটি সূচনা। কোথাও বা গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র সাজিদের সাথে তাঁর বন্ধু আরিফের খুনসুটি, কোথাও বা মজার কোন স্মৃতির রোমন্থন, কোথাও বা আছে সিরিয়াস কোন ব্যাপারে সিরিয়াস কোন হুশিয়ারি। গল্পে মজা আছে, আনন্দ আছে। মোটামুটি, সার্থক গল্পে যা যা উপাদান থাকা দরকার, যা যা থাকলে পাঠকের গল্প পাঠে বিরক্তি আসেনা, রুচি হারায় না– তার সবকিছুর এক সম্মিলিত সন্নিবেশ যেন লেখক আরিফ আজাদের এই সিরিজের একেকটি এপিসোড।

গল্পে গল্পে যুক্তি খন্ডন, পাল্টা যুক্তি ছুঁড়ে দেওয়া, পরম মমতায় অবিশ্বাসের অন্ধকার দূরীকরণে এ যেন এক বিশ্বস্ত শিল্পী।

যেখানে পাবেন প্যারাডক্সিক্যাল সাজিদ

প্যারাডক্সিক্যাল সাজিদ MON, 02 April 2017
অনলাইনে অর্ডার করুন–

- ১/ রকমারি – https://www.rokomari.com/book/129384/প্যারাডক্সিক্যাল-সাজিদ
- ২/ বইবাজার– http://boibajar.com/product/paradoxicalsajid
- ৩/ ওয়াফী লাইফ– http://www.wafilife.com/shop/uncategorized/paradoxical-sajid/
- ৪/ইত্যাদিশপ– http://www.ittadishop.com/products/details/88d321d2f5b311e6af9f04018da4a601/paradoxikal-sajid.html

যেকোন প্রয়োজনে–
Guardianpubs@gmail.com, ০১৭১০–১৯৭৫৫৮, ০১৯৯৮–৫৮৪৯৫৮

"প্যারাডক্সিক্যাল সাজিদের দুরন্ত
পথচলায় আপনাদের আরেকবার অভিনন্দন,
এ কৃতিত্ব আপনাদেরই। "

আরিফ আজাদ

খুব ছোটবেলায় যখন বই পড়তাম, তখন বইয়ের লেখকের প্রতি অন্যরকম একটা ভালো লাগা কাজ করতো। মনে মনে লেখককে নিয়ে অনেক কিছুই ভেবে রাখতাম।
উনি আসলে দেখতে কেমন? কীভাবে কথা বলেন? কীভাবে হাসেন? উনার কী দুঃখবোধ আছে?
প্রচন্ড ভালো লাগার মূহুর্তে উনি কীরকম হয়ে যান?
উনি কোন রঙ পছন্দ করেন? কী খেতে ভালোবাসেন?
যদি সৌভাগ্যবশত উনার সাক্ষাৎ পেয়েও যাই, কী বলবো তখন?
এসবই মনের মধ্যে কুটকুট করতো সারাক্ষণ।
কখনো স্বপ্নেও ভাবিনি, একদিন আমিও লেখক হবো। কেউ আমার অটোগ্রাফ চাইবে। আমার জন্য তাঁদের অকৃত্রিম ভালোবাসা জানাতে বিশাল বড় মেইল করবে- যেখানে প্রতিটা শব্দে শব্দে থাকবে আমার জন্য তাঁদের ভালোবাসার কথা...
আমার সাথে একটু সাক্ষাৎ, একান্ত আলাপের জন্য উদগ্রীব হয়ে পড়বে।
সত্যি! কখনো ভাবি নি। কখনো ভাবিনি, আমি বই লিখবো। আর সেই বই নিয়ে সবার মাঝে এরকম সাড়া পড়বে, কাড়াকাড়ি পড়বে- এটা স্বপ্নে দেখলে স্বপ্নের মধ্যেই তো চমকে উঠতাম।

অনেক অনেক মানুষের ভালোবাসা, দোয়া পেয়েছি আলহামদুলিল্লাহ্। অনেক বড় বড় মানুষ- যারা আমার চেয়ে বয়সে, যোগ্যতায় যোজন যোজন এগিয়ে, তারা যখন আমার কাজের প্রশংসা করেন, যখন তারা আমায় বুকে জড়িয়ে ধরেন, কপালে চুমু খান- তখন মহান র'বের দরবারে শুকরিয়া জানিয়ে বলি- আলহামদুলিল্লাহ্...

কিছুদিন আগে একজন ভাঈ নক করেছিলেন ইনবক্সে। তিনি যা লিখেছেন, তা হুবহু তুলে ধরছি-

"আমার সেজো মামা ঢাকার এক মাদরাসায় শিক্ষকতা করেন। জামিয়া আরাবিয়া হাজী ইউনুছ ক্বওমী মাদরাসায়। মাদ্রাসাটা জুরাইন থেকে অল্প দক্ষিণে।
তো,উনার মাদরাসায় যারা বেফাকে পরীক্ষা দিয়ে সারা দেশে মধ্যে সিরিয়াল পায় (যাদের গড় নাম্বার ৮০ এর উপরে) তাদেরকে সবসময় বই উপহার দেয়া হয় মাদরাসার পক্ষ থেকে।এবার মাদরাসার পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয় যে, যার যার পছন্দের বই দেয়া হবে।তাই সবাইকে বলা হয় পছন্দের বইয়ের নাম লিখে দিতে।।উপহার পাবে মোট ২৭জন। সবাই নাম জমা দেয়।অফিসে গিয়ে কাগজ খুলে দেখা যায় ২৭ জনের সবাই আপনার

প্যারাডক্সিক্যাল সাজিদের নাম লিখে দিয়েছে।
আমি যখন শুনলাম মামার কাছ থেকে চোখে পানি চলে আসছিলো।।অনেক দোয়া করেছি আপনার জন্য।
আমি নিশ্চিত গল্পটা সুন্দর। কিন্তু আমার উপস্থাপনা ভালো হয়নি তাই হয়তো শুনতেও ভালো লাগবেনা।"

গল্পটা আসলেই সুন্দর। এতো বেশিই সুন্দর, এতো বেশিই হৃদয়ছোঁয়া যে, পড়তে পড়তেই আমার চোখ দিয়ে পানি চলে এসেছে।

গতকাল আরেকজন নক দিলেন। যা লিখলেন তা হুবহু এরকম–

"আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া।
আপনাকে কিছু বলার ছিলো। অনেকদিন ধরেই কথাগুলো বলবো কি বলবো না একটা সংকোচে ছিলাম। আপনি হয়তো আমার মেসেজগুলো পড়ার সময়ও পাবেন না।কিন্তু ধৈর্যের বাধ ভাঙলো।

তিনমাস আগের কথা। কিছু মানুষের ফাঁদে পা দিয়ে ধর্ম অনেকটা সংশয়ের সম্মুখীন হতে হয়েছিলো। ঠিক তখনই আমার এক বন্ধু আপনার প্যারাডক্সিক্যাল সাজিদ বইটি আমাকে পড়তে বললো। আমার সব প্রশ্নের উত্তরই নাকি আপনার বইটিতে পাবো। আমিও পড়লাম। বলে বুঝাতে পারবো না ভাই।
বইয়ের প্রতিটি শব্দ আমি পড়তে থাকলাম আর আমার ঈমান শক্ত হতে থাকলো।
আপনাকে ধন্যবাদ জানানোর ভাষা আমার জানা নেই। আপনার বইটি আমার জীবনধারাকে সম্পূর্ণ পাল্টে দিয়েছে।

পরে শুনলাম আপনি ফেসবুকেও লিখালিখি করেন। আপনার টাইমলাইনে গিয়ে আপনার পোস্ট পড়ি আর কেমন যেনো একটা ভালো লাগা কাজ করে।
ধীরে ধীরে আমি সঠিক পথে ফিরে আসি। এই তিন মাসে আমার মধ্যে অনেক পরিবর্তন এসেছে।

আগে গান শুনতাম প্রচুর।
গান শোনা বাদ দিলাম।
নামাজ অবশ্য আগেও পড়তাম এখনো পড়ি।
ফেসবুকে ছবি দেয়ার ব্যাপারে ইসলাম কি বলেছে জানি না। কিন্তু চিত্রাঙ্কন হারাম এইটা জানি।
তবে আপনি আপনার কোনো ছবি ফেসবুকে দেননি তাই আমিও আমার ছবিগুলো সরিয়ে নিলাম।
মোট কথায় আমি এখন সঠিক পথ খুঁজে পেয়েছি। আর মানুষদের মধ্যে এই কৃতিত্বের সিংহভাগটাই আপনার।
আল্লাহ আমাকে হেদায়েত করার উছিলা হিসেবে আমাকে আপনার অনুসন্ধান দিয়েছে।"

এই ম্যাসেজ যে রাতে পাই, সে রাতের ইবাদাতে দাঁড়িয়ে আমি মহান র'বের দরবারে হাত তুলে বললাম,- 'হে আমার রব! মানুষের হৃদয়ে দোলা দিতে পারার, চিন্তার জগতে ভাবান্তর ঘটাতে পারার যে ক্ষমতা দিয়ে আপনি আমাকে অনুগ্রহ করেছেন, যে নিয়া'মাত আপনি আমার কলমে দান করেছেন, তা আপনার পথে ব্যয় করার জন্যও আমাকে কবুল করে নিন। কিয়ামতের মাঠে যখন হিমালয় পর্বত সমান পাপরাশি নিয়ে হাজির হবো, তখন যেন অন্তত এই উসিলায় আমি আপনার অনুগ্রহ লাভ করতে পারি।'

আরিফ আজাদ
I'M BACK ON THE SCENE
THE NO.1 DEEN
I'M PROUD TO BE DOWN WITH THE MUSLIM CREED
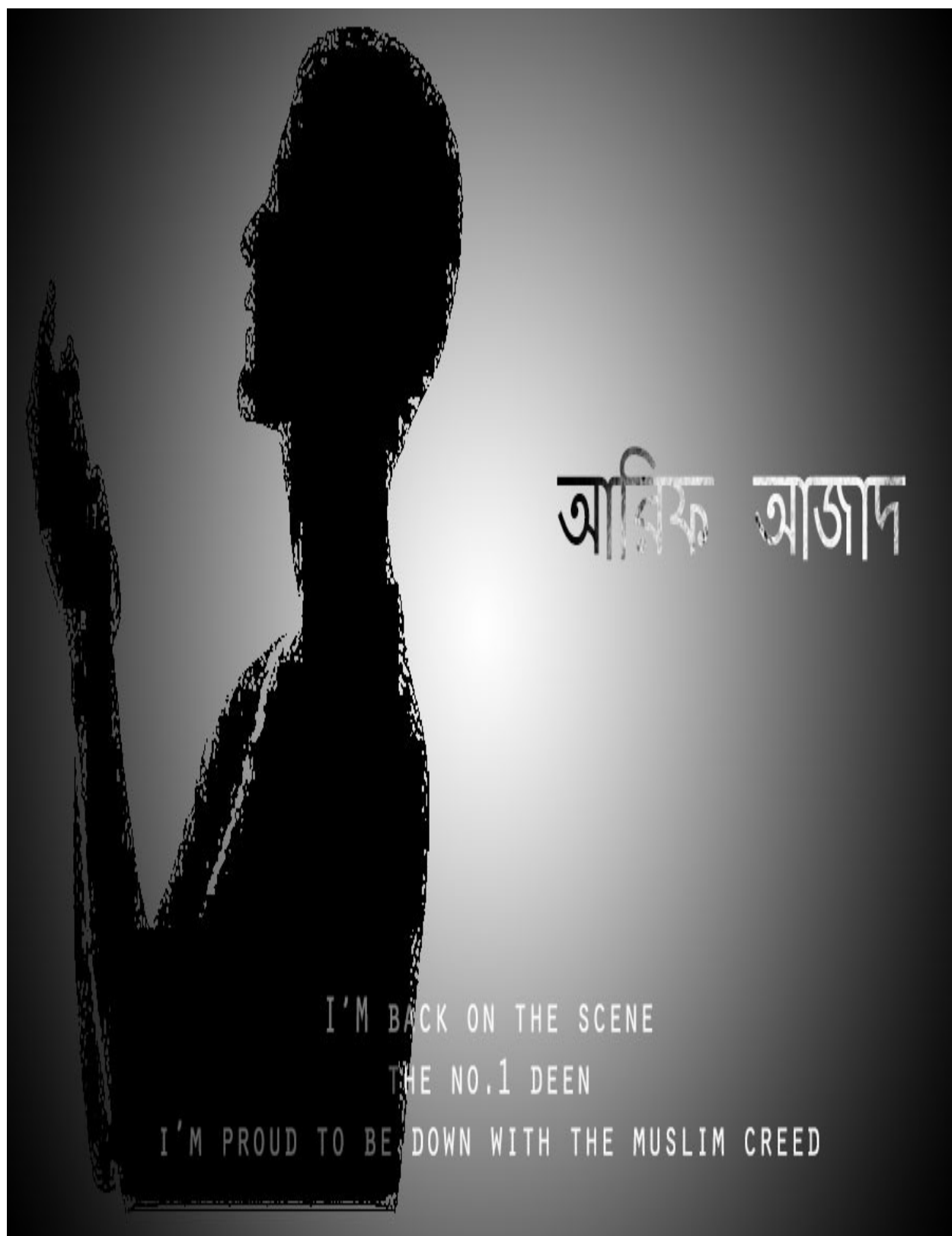
সাজিদ

মাঝে মাঝে অনেকে আমাকে ইনবক্সে নক দিয়ে বলে,- 'ভাই, সাজিদ ভাইয়ার একটি ছবি হবে?' আমি মুচকি হাসি। আমার মধ্যে ভীষণরকম একটা ভালোলাগা কাজ করে তখন। আমি ভাবি, কতোটা গ্রহণযোগ্যতা পেলে, কতোটা আন্তরিকতার সাথে গ্রহণ করলে মানুষ স্রেফ একটা কাল্পনিক চরিত্রকে বাস্তব ভেবে নিতে পারে?
আমি যদি বলি, - না, সাজিদের ছবি নেই। চরিত্রটা কাল্পনিক'
তাহলে তারা হয়তো কষ্ট পাবে। আমি তাদের কষ্ট দিতে চাইনা। তারা ভাবুক না সাজিদকে নিজেদের মতো। নিজেদের নিজস্ব ভাবনায় গড়ে উঠুক অনেক অনেক সাজিদের প্রতিবিম্ব। এজন্যে আমি তাদের এই প্রশ্নটা এড়িয়ে যাই প্রায়ই।

কেমন ছিলো সাজিদ? এই প্রশ্নটার উত্তর পাওয়ার জন্য বইটার প্রথম গল্পটাই যথেষ্ট। গল্পের সাজিদ অন্যরকম। সে প্রথমে আস্তিক, বিশ্ববিদ্যালয়ে নাস্তিক, এবং তার বিশ্বাসী বন্ধু আরিফের সাথে যুক্তি-তর্ক, বাক-বিতন্ডার পরে একটা পর্যায়ে গিয়ে আবারো আস্তিক। গল্পের সাজিদের মধ্যে গোঁড়ামি নেই। তার বন্ধু মহলে আস্তিক, নাস্তিক, সংশয়বাদী সবাইকেই দেখা যায়। সে সবার সাথেই মিশে। হেসে-খেলে কথা বলে। সে হালকা গুরুগম্ভীর।

মাঝে মাঝে যখন প্রশ্নের সম্মুখীন হই 'আমার লাইফে সাজিদ টাইপের কারো ছায়া আছে কীনা', আমি তখন ভাবি, আসলেই তো। এরকম কোন বন্ধু কী আমার আছে?
আমি তখন আমার বন্ধুগুলোকে কল্পনা করি। কারো মাঝেই আমি সাজিদকে পাই না। কিন্তু, একজন আছে, যার মাঝে অনায়েশে আমি সাজিদকে দেখতে পাই।
সে হলো **তোয়াহা আকবর** ভাই।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী মুখ।জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ছাত্র। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে পা দেওয়ার পরে সংশয়বাদে জড়িয়ে পড়ে অন্য দশজন জেনারেল শিক্ষিত ছেলের মতোই। স্রষ্টা কী সত্যিই আছে? থাকলে কোথায়? দেখি না কেনো?
আচ্ছা, বিজ্ঞান কী স্রষ্টা কে বাতিল করে দিয়েছে?
বিবর্তনবাদ কী স্রষ্টার অস্তিত্বকে প্রশ্নবিদ্ধ করে?
ধর্মের এই বিষয়টা এমন কেনো? অই বিষয়টা এমন কেনো?
এরকম নানাবিধ প্রশ্নের মুখোমুখি হয়। যুতসই উত্তর খুঁজে ফিরে উৎসুক মন। কিন্তু, পায় না কোথাও.........
ইন্টারনেট, অন্তর্জাল সবখানে ইসলাম বিদ্বেষীদের নানান রসালো লেখাজোখা। পড়লেই মনে হয়, - এগুলোই বুঝি ধ্রুব সত্য.......

এর বাইরে, জ্ঞান বিজ্ঞানে মুসলিমদের পিছিয়ে পড়া, ধর্মকে মসজিদ কেন্দ্রিক করে ফেলার যে আপ্রাণ চেষ্টা তদবির, তা বিষিয়ে তুলে তার তারুণ্যদীপ্ত মনকে। সে বুঝে নেয়- ধর্ম যদি এমন হয়, তবে তা কখনোই মুক্তির পথ হতে পারে না।
বিশ্বাসী হৃদয় আস্তে আস্তে ছেঁয়ে যায় অবিশ্বাসের করাল ছায়ায়। একসময়ের দাপুটে বিশ্বাসী ছেলেটা হয়ে পড়ে সংশয়বাদী। নাস্তিক।
সাজিদের সাথে তোয়াহা ভাইয়ের সাদৃশ্য শুধু এখানেই নয়।
সংশয়বাদী বা নাস্তিক হলেও, দু'জনের কেউই ধর্মবিদ্বেষী হয়ে পড়েনি।
তাদের মন যা খুঁজে-ফিরে, যা জানার জন্য, বোঝার জন্য চাতক পাখির মতো উৎসুক হয়ে থাকে চোখ, তা তারা জেনেই ছাড়ে।
তারা ফিরে পায় আলো। বুঝতে পারে- বিশ্বাসী-অবিশ্বাসীদের এই দ্বন্ধ আজকের নয়। মানব সভ্যতার শুরু থেকেই।
তারা আবারো খুঁজে পায় বিশ্বাসের রাস্তা। তার অতলে ডুব দেয়। এবং, যখন তারা ফিরে আসে, তখন যেন একেকজন একেকটা হীরের টুকরো.....

সাজিদ কেবল বইয়ের পাতায় থাকলেও, তোয়াহা ভাই বাস্তবেও আছেন।
মনে আছে, তোয়াহা ভাই তার প্রত্যাবর্তনের গল্প শেয়ার করতেন আমার সাথে। আমি মুগ্ধ শ্রোতার মতো ফোনের ও'প্রান্ত থেকে শুনতাম।
একদিন বললাম,- 'লিখে ফেলুন তো......'
ব্যস! আস্তিক থেকে নাস্তিক, এবং পুনঃরায় বিশ্বাসীদের কাফেলায় ফিরে আসার গল্প, এবং কেনো তিনি ফিরে এলেন তার বিস্তারিত গল্পগুলো আস্তে আস্তে লেখা হয়ে গেলো।

গল্পের শুরু হয় 'একটি অন্যরকম পাথরের গল্প' দিয়ে...
এরপর আসে নানান ফিলোসফিক্যাল, সাইন্টিফিক টার্ম।
আছে ব্যাকটেরিয়ার লেজের গল্প। শিরোনাম- 'জীবনকষা-প্রিয় লেজ'
আমাদের পৃথিবীতে আগমনের হেতু সন্ধানের গল্প আছে 'আমি কে? আমি এখানে কেনো?' শিরোনামে....
আছে স্রষ্টার কারুকার্যময় সৃষ্টির গল্প 'ডিজাইন কী নিঁখুত হতেই হবে?' শিরোনামের গল্প। আরো আছে বিবর্তনবাদের গল্প। আছে একজন বুদ্ধিমান সত্বার উপস্থিতির পক্ষে যুক্তি, সাক্ষ্য,প্রমাণ........

এভাবেই এগিয়ে যায় উনার বিশ্বাসের স্বপক্ষের কথামালা। লেখা শেষ হলে তোয়াহা ভাই আমাকে মেইল করে পাঠান।
আমি পড়ে মনে মনে বলেছিলাম,- 'আলহামদুলিল্লাহ্। নাস্তিকতার বিরুদ্ধে রচিত বাংলা সাহিত্যে এটি নিঃসন্দেহে একটি অনন্য সংযোজন।'

অত্যন্ত সুখকর ব্যাপার হলো, বইটি গত পরশুদিন হার্ড কপি আকারে বাজারে এসেছে। প্রেস থেকে বই হাতে পাওয়া মাত্রই তোয়াহা ভাই আমাকে ফোন দিয়ে বললেন,- 'ভাই, বই প্রেস থেকে পাওয়া মাত্র আপনাকেই প্রথম ফোন দিলাম।'
আমি আরেকবার বললাম,- 'আলহামদুলিল্লাহ্।'

বইটার নাম রাখা হয়েছে 'উল্টো নির্ণয়।'
কেনো এই নাম? তোয়াহা ভাই আমাকে মেইলে লিখেছিলেন এরকম– 'যেহেতু ভুল নির্ণয়ের মাধ্যমে নাস্তিকতায় জড়িয়ে পড়েছিলাম, এবার তার উল্টো নির্ণয় করে (অর্থাৎ, ভুলটাকে উল্টিয়ে শুদ্ধ করে) ফিরে আসার গল্পটাও লিখে ফেললাম। তাই এই নাম।'
মাশা'আল্লাহ। অত্যন্ত চমৎকার নাম।
বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের সমাপ্তি ঘটায় তোয়াহা ভাইয়ের সাথে মুখোমুখি সাক্ষাৎ হয়নি এখনো। তবে, খুব ইচ্ছে, একদিন, পুরো একটা বিকেল আমরা দু'জনে আমাদের এভাবে ফিরে আসার গল্প বলতে বলতেই কাটিয়ে দেবো, ইনশাআল্লাহ।
কারণ, আমাদের দু'জনের জীবন যে একই ধারায় প্রবাহমান।

যারা আমার কাছে 'প্যারাডক্সিক্যাল সাজিদ' এর মতো আর কোন বই আছে কীনা প্রায়ই জানতে চান, তাদের জন্য 'উল্টো নির্ণয়' বইটি খুব সহায়ক হবে, আশা করি।
যারা তোয়াহা কিংবা সাজিদের মতো প্রথম জীবনে খাবি খাচ্ছেন, বের হবার রাস্তা খুঁজছেন, তাদের জন্যও বইটা দরকারি। যারা নিজেদের বিশ্বাসের স্বপক্ষে কিছু পড়তে ভালোবাসেন, তাদের জন্যও এটি হতে পারে একটি দারুন সংগ্রহ।
আল্লাহ ভাইকে, এবং এতদসংশ্লিষ্ট সকলকে কবুল করুন, আ-মী-ন।

যারা জানতে চাইবেন বইটা কোথায় পাবেনঃ

[বইটি বের হয়েছে চট্টগ্রাম থেকে। যারা অনলাইনে অর্ডার করতে চান, তাদের জন্য অনলাইন বুক শপ Boi Pustak হতে পারে একটি উত্তম ঠিকানা। বইটি পেতে তাদের ম্যাসেজ করে অর্ডার করতে পারেন অথবা যোগাযোগ করতে পারেন 01611711822 নাম্বারে।]

সূচীপত্র

Interactive link সহ, ক্লিক করবেন আর চলে আসবে

মোরালিটি ও নাস্তিকতা

মোরালিটি (নৈতিকতা) সাবজেক্টিভ না অবজেক্টিভ এটা দর্শন শাস্ত্রের খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন।

অবজেক্টিভ মোরালিটি হচ্ছে এরকম– যা ভালো, তা সর্বাবস্থায় ভালো, আর যা খারাপ, তা সর্বাবস্থায় খারাপ। অবজেক্টিভ মোরালিটির ক্ষেত্রে ব্যক্তি বিশেষের পছন্দের কোন স্থান নেই। আপনি পছন্দ করলেন কী করলেন না– এটা অবজেক্টিভ মোরালিটিতে ম্যাটার করে না।

যেমন– মিথ্যা বলা খারাপ। এটা আপনি পছন্দ করেন বা না করেন, এটা খারাপ।

মানুষ হত্যা খারাপ। এটা আপনি পছন্দ করেন বা না করেন, এটা খারাপ।

ক্ষমা একটা মহৎ গুণ। এটা আপনি পছন্দ করেন বা না করেন, এটা ভালো।

সাবজেক্টিভ মোরালিটি হলো আত্মকেন্দ্রিক। ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বিশেষের পছন্দের ব্যাপারকে সাবজেক্টিভ মোরালিটি বলা হয়।

যেমন– আপনি বা আপনারা ঠিক করলেন যে মিথ্যা বলা মোটেও খারাপ না, এই বিশ্বাসটাকে বলা হয় সাবজেক্টিভ মোরালিটি.....

এখন, অবজেক্টিভ মোরালিটি বলে যদি কিছু পৃথিবীতে থাকে, তাহলে একজন স্রষ্টা থাকা আবশ্যক। কেননা, ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বিশেষের কাছ থেকে কখনোই অবজেক্টিভ মোরালিটি আসতে পারে না। কারণ, যা খারাপ, তা সর্বাবস্থায়, সর্বস্থানে, সর্বস্তরে খারাপ। যা ভালো, তা সর্বাবস্থায়, সর্বস্থানে, সর্বস্তরে ভালো। এখানে ব্যক্তি বা গোষ্ঠী প্রিফারেন্স বলে কিছু নেই।

ভালোকে সর্বাবস্থায় ভালো, আর খারাপকে সর্বাবস্থায় খারাপ বলে নির্ধারণ করে দেওয়ার জন্য একজন Supreme Law Giver দরকার। আর, এই Supreme Law Giver হলো স্রষ্টা।

এখন প্রশ্ন হলো, মোরালিটি সাবজেক্টিভ না অবজেক্টিভ?

মোরালিটি যদি সাবজেক্টিভ হয়, তাহলে একসময়ের 'দাসপ্রথা' কে আজকে বসে আপনি 'ভুল' বলতে পারেন না। বর্ণপ্রথাকে খারাপ বলা যায় না। হিটলার কর্তৃক 'ইহুদি নিধন' গণহত্যাকে আজকে বসে আপনি 'ভুল' বলতে পারেন না।

পল পট কর্তৃক কম্বোডিয়ার গণহত্যাকে আপনি কোনভাবেই 'ভুল' বলতে পারেন না।

কারণ, একসময়ের লোক দাসপ্রথাকে ভুল মনে করতো না, ভালো মনে করতো।

হিটলার তথা নাযী সম্প্রদায় ইহুদি হত্যাকে জায়েজ মনে করতো।

তাহলে, যদি মোরালিটি সাবজেক্টিভ (ব্যক্তি বা গোষ্ঠী নির্ভর) হয়, তাহলে একসময়ের দাসপ্রথা, হিটলার, পলপট, মাও সে তুং- প্রত্যেকেই সঠিক ছিলো।

মোরালিটি সাবজেক্টিভ হলে তাদের প্রত্যেকে নিজ নিজ জায়গায় ঠিক।

কিন্তু, কমন সেন্স কী বলে? দাসপ্রথা কী ঠিক? মানুষ হত্যা কী ঠিক? হিটলার কী তার অবস্থানে ঠিক ছিলো?

উত্তর যদি 'না' হয়, তাহলে মোরালিটি সাবজেক্টিভ না, অবজেক্টিভ...

মোরালিটি সাবজেক্টিভ না অবজেক্টিভ- এটা একটা দারুন ফিলোসফিক্যাল প্রশ্ন।

এই প্রশ্নে নাস্তিকরা প্রায়ই 'ঢোঁক' গিলে চেপে যান।

বার্ট্রান্ড রাসেলের মতো একসময়ের বাঘা বাঘা নাস্তিকও এই প্রশ্নটাকে স্কিপ করে যেতো।

ইদানীং কালের নাস্তিকরা অবশ্য কিছু আলাপ করে এটা নিয়ে।

তাদের পয়েন্ট হলো- মোরালিটি অবজেক্টিভ হলেও, এটা কোনভাবেই স্রষ্টার অস্তিত্ব প্রমাণ করেনা। এটা স্রষ্টার কাছ থেকে আসতে হবে, এমন কোন কথা নেই।

একজন নাস্তিকের সাথে আলাপ হচ্ছিলো কিছুদিন আগে। সেও বললো,- 'ঠিক আছে, মোরালিটি অবজেক্টিভ। কিন্তু এটা কী প্রমাণ করে যে মোরালিটি স্রষ্টা নির্ধারণ করে দেয়?'

আমি বললাম,- 'চুরি করা কী খারাপ?'

সে বললো- 'হ্যাঁ।'

- 'চুরি করা খারাপ, এই সেন্সটা মানুষের মধ্যে কীভাবে এলো?'

- 'সভ্যতার সাথে সাথে।'

- 'যেমন?'

সে এক্সপ্লেইন করলো এভাবে–

'ধরুন, আপনি আমার কাছ থেকে সবকিছু চুরি করে নিয়ে গেলেন। এরপর দেখলেন, পরেরদিন আমি একেবারে নিঃস্ব হয়ে গেলাম। না খেয়ে মরতে বসলাম। তখন আপনি ফিল করলেন যে আপনি ঠিক করেন নি। কাজটা ঠিক হয় নি। চুরি করা খারাপ। এভাবেই মোরালিটি আস্তে আস্তে গ্রো আপ হয়। মানুষ বুঝতে শিখে, চুরি করা অপরাধ।'

আমি বললাম,- 'এটা তো একটা এসাম্পশন মাত্র। এমনও তো হতে পারতো, ধরুন– আমি আপনার সবকিছু চুরি করে নিয়ে গেলাম। এরপর দেখলাম, আরেব্বাস! কাজটা তো খারাপ না। রাতারাতি ধনী হয়ে যাওয়া যায়। আমি ফিল করলাম, চুরি করা তো ভালো। রাতারাতি অবস্থার পরিবর্তন। এরপর আমি আরো জোরেশোরে চুরিতে নামলাম।

আরো ধরুন, আপনিও ফিল করলেন, চুরি করে যদি আমি যদি ধনী হয়ে যেতে পারি, আপনি কেনো পারবেন না? এরপর, আপনিও চুরি তে নামলেন।

এমনও তো হতে পারতো। কিন্তু এরকম না হয়ে চুরিকে মানুষ অপরাধ হিসেবে দেখা শুরু করলো কেনো? এটা কীভাবে হলো?'

মজার ব্যাপার। অই নাস্তিক সেদিন বলেছিলো,- 'এমনি এমনি হয়ে গেছে....'

আসলেই, নাস্তিকতায় সবকিছু এমনি এমনিই হয়ে যায়। ম্যাজিক শো দেখতে গেলেও, ম্যাজিকের পেছনে একজন ম্যাজিশিয়ান থাকে, নাস্তিকতায় বিলিভ করতে গেলে ম্যাজিককেও ঠুনকো মনে হবে।

নাস্তিকতা মতে, পৃথিবীতে ভালো,মন্দ বলে কিছু নেই।

বিখ্যাত নাস্তিক রিচার্ড ডকিন্স বলেছিলো– "The universe we observe has precisely the properties we should expect if there is at the bottom, no design, no purpose, no evil and

no good. Nothing but blind pitiless indifference. . . . DNA neither knows nor cares. DNA just is, and we dance to its music.”

রিচার্ড ডকিন্সের মতে, দুনিয়ায় ভালো-খারাপ বলে কিছু নেই।আমরা যা করি, তা কেবলমাত্র আমাদের DNA তে ক্যামিকেল মিউজিকের জন্যই করি।

- ডকিন্সের লজিক অনুযায়ী, একজন ধর্ষণকারী ধর্ষণ করলে তাকে ব্লেইম করা যাবে না। কারণ, এই ধর্ষণে ধর্ষণকারীর কোন ভূমিকা নেই। সব দোষ তার DNA 'র।
- একজন খুনীকে খুনের জন্য ব্লেইম করা যাবে না। কারণ, সে তার DNA'র মিউজিক সম্পন্ন করেছে, তার দোষ নেই।

এজন্য দেখবেন, নাস্তিকরা সবকিছুর পেছনে ন্যাচারাল কজ খুঁজে। এইযে, সমকামীতাকে বৈধতা, ন্যাচারাল বানানোর জন্য Gay Gene নিয়ে কী কাহিনীটাই না করলো।

নাস্তিকরা কিছুদিন আগে Crime Gene নিয়েও কাহিনী করেছে।

অর্থাৎ, মানুষ যে অপরাধ করে, মূলত তাতে মানুষের কোন হাত নেই। সে Crime Gene নিয়ে জন্মালে, Crime করবেই। এটা ন্যাচারাল প্রসেস।

এজন্য তাকে শাস্তি দেওয়া যাবে না, ব্লেইম করা যাবে না।

নাস্তিকদের প্রস্তাবিত পৃথিবী কেমন হবে?

যেখানে খুন, ধর্ষণ কোন অপরাধ না। অপরাধ বলে কিছু সেখানে নেই। কোন শাস্তি নেই, কিচ্ছু নেই।

ভাবতেই গা শিউরে উঠে।

মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করোনা

আল্লাহ বলছেন,- ["হে বিশ্বাসীগণ! ইসলামের মধ্যে পরিপূর্ণভাবে প্রবেশ করো"] – বাক্কারা ২০৮

আচ্ছা, এই আয়াতটা পড়তে গিয়ে কখনো কী ভেবেছেন যে আল্লাহ সুবাহান ওয়া'তালা ঠিক কী বুঝাতে চাচ্ছেন?

খেয়াল করুন, আল্লাহ তা'লা প্রথম সম্বোধনটাই করেছেন " ইয়া আইয়্যুহাল লাজীনা আমানু" বা "হে বিশ্বাসীগণ" বলে।

এখন, বিশ্বাসী বলে সম্বোধন করার পরে তাহলে নতুন করে আবার ইসলামে প্রবেশের কী থাকতে পারে?

যারা এক আল্লাহ, পরকাল, জান্নাত–জাহান্নাম, নবী–রাসূলগণ, ফেরেস্তা, আসমানী কিতাব ইত্যাদি বিষয়ে প্রাথমিকভাবে ঈমান আনে, তাদের বলা হয় বিশ্বাসী। ঈমানদার।

তাহলে, একজন বিশ্বাসী কী পরিপূর্ণভাবে ইসলামে থাকে পারে না?

উত্তরটা এরকম– পারে, আবার পারে না।

কীভাবে একটু ব্যাখ্যা করি।

একজন মানুষ যদি ঈমানের প্রাথমিক শর্তগুলো ফিলাপ করে (বিশ্বাস করে), তাহলে সে বিশ্বাসী।

যখন সে একনিষ্ঠভাবে ইসলামের নিয়ম কানুন মানা শুরু করবে, নামাজ, রোজা, যাকাত, হজ্ব, পর্দা, দাঁড়ি সহ সকল ইসলামী অনুশাসনকে নিজের বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করবে, তখন সে মুসলিম। একজন মুসলিম সে, যে নিজের ইচ্ছাকে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করে। আরো

ক্লিয়ারলি, একজন মুসলিম সে, যে নিজেকে আল্লাহর কাছে সঁপে দেয়। তার ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপরে আল্লাহর হুকুম আহকামকে প্রাধান্য দেয়।

প্রাথমিকভাবে একজন বিশ্বাসী আবার একজন মুসলিম নাও হতে পারে, কিন্তু প্রত্যেকটা মুসলিম অবশ্যই অবশ্যই বিশ্বাসী।

এজন্য, কোরআনে আল্লাহ যখন ইবরাহীম (আঃ) এর পরিচয় দিচ্ছেন, তখন বলছেন-

["Ibrahim was neither a Jew nor a Christian, but he was one inclining toward truth, a Muslim" -Al Imran- 67]

[" ইব্রাহীম না খ্রিষ্টান ছিলেন, না ইহুদী। বরং, তিনি ছিলেন একজন মুসলিম (একনিষ্ঠ আত্মসমর্পণকারী")]

এখানে, আল্লাহ তা'লা ইবরাহীম (আঃ) এর পরিচয় দেওয়ার সময় উনাকে 'মুসলিম' বলেছেন।

আবার, সূরা ইমরানে বলা হচ্ছে-

["**হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে যথাযথভাবে ভয় কর এবং তোমরা মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করোনা।"]- আল ইমরান, ১০২**

খেয়াল করুন, বিশ্বাসীগণকে উদ্দেশ্য করে বলা হচ্ছে আল্লাহকে ভয় করতে, আবার বলা হচ্ছে 'তোমরা মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।'...

আল্লাহ সুবাহান ওয়া'তালা অবশ্যই জানেন যে, আমাদের মধ্যে ঈমান থাকা সত্ত্বেও আমরা (অনেকে) মুসলিম হতে পারবো না।

আল্লাহ জানেন, আমাদের মধ্যে ঈমানের টইটুম্বুর অবস্থা। ঈমানী জোশে আমরা ঈসরাঈলকে ঘৃণা করি। এই যে আল আকসাতে হামলা করছে ঈসরাঈল, আমাদের ভাইদের শহীদ করছে,

জুমা আটকে দিচ্ছে, আমরা কিন্তু প্রতিবাদে ফেঁটে পড়ছি। ইয়ায়ায়ায়ায়া লম্বা আবেগঘন পোস্ট লিখছি ফেইসবুকে। হ্যাশট্যাগে দিচ্ছি #FreePalestine । সবকিছুই কিন্তু ঈমান থেকে।

কিন্তু দেখা যায়, পরেরদিন আমার ফজ্বর কাযা।

ঘুম থেকে জাগতে জাগতেই বেজে গেছে ১০ টা (চাকরি বা কাজ থাকলে। নাহলে টাইমটা কমপক্ষে দুপুর ১২ টা)।

এরপর ব্যস্ততার দোহাই দিয়ে যোহরও কাযা। আসর আর মাগরিব চলে যায় আড্ডায়। এশা'টা আর পড়া হয়েই উঠে না.....

আল্লাহ জানেন, আমরা বিশ্বাস করি যে বিবাহ বহিঃভূত রিলেশনশীপ ইসলামে হারাম। আমরা আরো জানি,ইসলামে কঠোর পর্দাপ্রথার নিয়ম আছে।

কিন্তু জানা এবং বিশ্বাস করা সত্বেও আমরা জি এফ, বি এফ রাখতে পছন্দ করি। রাতভর তাদের সাথে ফোনালাপ, দিনভর রিক্সায় পাশাপাশি চেপে ঘুরাঘুরিও কিন্তু আমরা করি।

আমরা বিশ্বাস করি ইসলাম অশ্লীল কিছুই সমর্থন করে না, কিন্তু তবুও, রাতভর "বাহুবলী-২" দেখেই কিন্তু আমরা ঘুমাতে যাই।

<u>এই যে "বিশ্বাস করা" আর বিশ্বাস করে "পালন করা"র মধ্যে গূঢ় যে পার্থক্য, এটাই হচ্ছে বিশ্বাসী আর মুসলিমের মধ্যে পার্থক্য।</u>

আমি একজন বিশ্বাসী হয়ে মুসলিম নাও হতে পারি, কিন্তু একজন মুসলিম হয়ে আলটিমেটলি আমি একজন বিশ্বাসী।

এজন্য আল্লাহ তালা বলেছেন- "হে বিশ্বাসীগণ! ইসলামের মধ্যে পরিপূর্ণভাবে প্রবেশ করো"

আল্লাহ বলছেন,- তুমি আমায় বিশ্বাস করো, পরকালে বিশ্বাস করো, জান্নাত-জাহান্নামে বিশ্বাস করো। নবী-রাসূল, কিতাবে বিশ্বাস করো। কিন্তু, এর পাশাপাশি যে নামাজ পড়ো না, মুভি দেখো, হারাম রিলেশনে জড়াও, পর্দা করো না, দাঁড়ি রাখো না, গালি দাও, মিথ্যা কথা বলো, সুদ খাও, ঘুষ নাও, মানুষের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করো- এসবকিছু ছেড়ে পরিপূর্ণভাবে ইসলামে চলে এসো। মুসলিম হয়ে যাও।

ঈমানের প্রাথমিক শর্তাবলী পূরণ করার পরেও যারা মুসলিম হতে পারেনা, এই আয়াত তাদের জন্য।

আমরা যারা এই আয়াতের ক্রাইটেরিয়ার (যা উল্লেখ করেছি) মধ্যে পড়ি, তাদের কী উচিত কেবল একজন বিশ্বাসী হয়ে বসে থাকা? নাকী, মুসলিম বনে যাওয়া?

যদি কেবল বিশ্বাসী হয়েই পার পাওয়া যেতো, আল্লাহ নিশ্চই পরিপূর্ণভাবে আমাদের ইসলামে দাখিল হবার জন্য বলতেন না।

'পানি রহস্য-০১'

আপনাকে যদি প্রশ্ন করি,- 'পৃথিবীর সবচেয়ে বিশুদ্ধ পানির উৎস কী?'

আপনি কয়েক সেকেন্ড ভাববেন। একটু মাথা চুলকাবেন। এরপর হয়তো অনেকটা আত্মবিশ্বাসের সাথেই বলবেন,- 'বৃষ্টির পানি...'

আপনার উত্তর যদি 'বৃষ্টির পানি' হয়, তাহলে আপনার উত্তরটা একেবারেই সঠিক...

আসলেই, পৃথিবীর সবচেয়ে বিশুদ্ধ পানির উৎসই হলো বৃষ্টির পানি। পানি নিয়ে গবেষণা করে এরকম একটি বিখ্যাত জার্নালে (IWA- The International Water Association) সেদিন বৃষ্টির পানি নিয়ে একটি আর্টিকেল পড়ছিলাম। একটা জায়গায় তারা লিখলো- 'The bottled water that we consider to be the purest form of water actually comes from rainwater'....

নদী-সমুদ্রের পানিকে বৃষ্টির পানি হিসেবে পেতে যে প্রসেসগুলো অতিক্রম করতে হয়, তা অত্যন্ত বিস্ময়কর! সূর্যের তাপে নদী এবং সমুদ্রের পানি জলীয় বাষ্প আকারে উপরে উঠে গিয়ে মেঘমালা আকারে জমা হয়। এরপর যখন ঘনত্ব একসময় বেড়ে যায়, আকাশ থেকে সেই মেঘমালা বৃষ্টি আকারে আবার পৃথিবীতে ফেরত আসে।

এই পানিতে নানান রকম উপাদান থাকে যা মানুষের জন্য অত্যন্ত উপকারী। শুধু উপকারীই না, জীবন রক্ষার সহায়ক। এজন্যই পানির অপর নাম জীবন....

এই পানিতে থাকে আয়রন, কপার, অ্যালুমিনিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, সোডিয়াম, ক্যালসিয়াম। থাকে ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস এবং সল্ট।

কিন্তু, বৃষ্টি আকারে আকাশ থেকে নিচে পতিত হবার সময় তাতে সবরকম উপাদান মিশ্রিত থাকে না। বৃষ্টির পানি যখন নিচে পতিত হয়ে বিভিন্নভাবে নদী, মাটির অভ্যন্তরে পৌঁছায়,

তখন তার সাথে বিভিন্ন উপাদান (আয়রন, কপার, সোডিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ইত্যাদি) মিশে যায়। সেই পানিকে তখন বলা হয় 'মিনারেল ওয়াটার'...

বলা বাহুল্য, বৃষ্টির পানি সবথেকে শুদ্ধতম পানি হলেও, তা অনেকটাই বিস্বাদ। অর্থাৎ, স্বাদহীন।

বৃষ্টির পানির সাথে পরে অন্যান্য উপাদান যোগ হবার পরে তা স্বাদযুক্ত পানিতে পরিণত হয়ে আমাদের জন্য পানযোগ্য হয়.....

এখান থেকে আমরা পানির দুটি ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা সম্পর্কে জানতে পারি।

১/ বৃষ্টির পানি হলো বিশুদ্ধ পানি কিন্তু তা স্বাদহীন (Tasteless)।

২/ বৃষ্টির পানি যখন পতিত হয়ে নদী, মাটির অভ্যন্তরে ইত্যাদিতে পৌঁছায়, তখন তার সাথে বিভিন্ন উপাদান মিশ্রণের ফলে তা হয়ে উঠে স্বাদযুক্ত পানি, যাকে আমরা মিনারেল ওয়াটার বলি এক কথায়........

এই দুই প্রকার পানির বাইরে আরো এক প্রকার পানি আছে, তা হলো- সাগরের লবণাক্ত পানি...

এটাকে তিন নাম্বার ক্যাটাগরিতে রাখলে যা দাঁড়ায়-

৩/ সাগরের পানি হলো এমন পানি- যা লবণাক্ত, বিস্বাদ, পানের অযোগ্য....

এই হলো মোটামুটি ৩ রকমের পানির অবস্থা। একটি বিশুদ্ধ, অথচ স্বাদহীন। একটি পুরোপুরিভাবে বিশুদ্ধ না হলেও (যেহেতু বিভিন্ন প্রসেসিংয়ের মাধ্যমে এই পানি আসে) স্বাদযুক্ত এবং পানযোগ্য, অন্যটি খুব বেশিই লবণাক্ত, পানের অযোগ্য.....

এবার আসুন। আল কোরআনের সূরা ফুরকানের ৪৮ নাম্বার আয়াতে বলা হচ্ছে-

'And We send down pure water from the sky'

['এবং, আমি আকাশ থেকে বর্ষণ করি বিশুদ্ধ পানি']

শব্দচয়ন খেয়াল করে দেখুন, আল্লাহ সুবাহান ওয়া'তালা এই আয়াতে বৃষ্টির পানি বর্ষণের ব্যাপারে বলছেন। এবং, বৃষ্টির পানির গুণ বা মান বর্ণনার জন্য তিনি যে শব্দটা ব্যবহার করেছেন সেটা হলো– 'Tahura'। আরবি 'তাহির' শব্দ থেকেই থেকে 'তাহুরা' এসেছে। তাহুরা অর্থ বিশুদ্ধ, Pure.....

বৃষ্টির পানিকে আল্লাহ সুবাহান ওয়া'তালা বর্ণনা করেছেন– বিশুদ্ধ পানি হিসেবে যা এখন সাইন্টিফিকেলি প্রমাণিত।

বলতে পারেন, এর মধ্যে এমন কী আর জারিজুরি?

অপেক্ষা করুন। একটু আগেই বলেছি, এই বৃষ্টির পানি যখন পতিত হয়, তখন বিভিন্ন খনিজ উপাদান তার সাথে মিশ্রিত হয়। ফলে, তাকে বলা হয় মিনারেল ওয়াটার, যা খাবার যোগ্য...

এই মিনারেল ওয়াটার সবসময় বিশুদ্ধ না। কারণ, প্রকৃতির মধ্যে বিভিন্ন উপায়ে পরিশোষিত হয়ে যাওয়ার ফলে তার সাথে যেমন দরকারি অনেক খনিজ মিশে, ঠিক তেমনি অদরকারি অনেক পদার্থও মিশে যায়। যেমন– Dust...

আয়রন, সালফার, সল্ট ইত্যাদি মিশে যাওয়ার ফলে এই পানি যখন সুস্বাদু হয়, তখনি আমরা সেটাকে পানযোগ্য পানি বলি। এই পানি গভীর নলকূপ দিয়ে মাটির অভ্যন্তর থেকে উঠানো যায়, এবং নদীতেও পাওয়া যায়। নদীর পানিও মিষ্টি....

তবে, বৃষ্টির পানি একটি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাওয়ার ফলে তার 'Purity' ফর্মটা হারায়, কারণ, কিছু অদরকারি পদার্থ মিশে যাওয়ার ফলে তাকে আর 'Purest' বিশেষণে ফেলা যায় না। কিন্তু এই প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যাওয়ার ফলেই তা পানযোগ্য হয়, সুস্বাদু হয়।

এবার দেখুন, আল্লাহ তা'লা সূরা আল মুরসালা'তের ২৭ নাম্বার আয়াতে বলছেন–

'And (we) have given you to drink sweet water'

['এবং, পান করার জন্য আমি তোমাদের দিয়েছি সুমিষ্ট পানি']

খেয়াল করলে দেখবেন, পানির কথা বলতে গিয়ে আগের আয়াতে আল্লাহ তা'লা যে বিশেষণ ব্যবহার করেছিলেন, তা ছিলো– Tahura (Pure)

কিন্তু, এবারও আরেকটি জায়গায় পানির বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি কিন্তু আর আগের বিশেষণটি ব্যবহার করেন নি।

এবার তিনি ব্যবহার করেছেন– Fura't শব্দ, যার অর্থ– Sweet, সুস্বাদু। অর্থাৎ– পানযোগ্য।

বৃষ্টির পানিতে বিভিন্নভাবে, বিভিন্ন উপাদান মিশে তা আমাদের জন্য পানযোগ্য হয়। এই কথা উল্লেখ করতে গিয়ে আল্লাহ সুবাহান ওয়া'তালা ঠিকঠাক বিশেষণটাই ব্যবহার করেছেন। পানযোগ্য পানির জন্য তিনি Tahura (Pure) শব্দ ব্যবহার না করে Fura't (Sweet) শব্দ ব্যবহার করেছেন।

এবার, সূরা আল-ফাতিরের ১২ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ বলছেন–

' And not alike are the two bodies of water. One is fresh and sweet, palatable for drinking, and one is salty and bitter'

['(পাশাপাশি) পানির দুটো অংশও এক রকম নয়। একটি (অংশ) সুমিষ্ট, সুস্বাদু, সুপেয়, অন্যটি লবণাক্ত, বিস্বাদ']

এখানে শেষের দিকে যে পানির কথা বলা হচ্ছে, তা হলো সমুদ্রের পানি। সমুদ্রের পানিতে লবণের ঘনত্ব এতোই বেশি যে, সেই পানি মুখেও নেওয়া যায় না সাধারণত।

সমুদ্রের পানির লবণাক্ততা বুঝাতে আয়াতটিতে দুটি বিশেষণ আছে। একটি হলো 'মিলহুন' (লোণা) অন্যটি হলো 'উজ্বাজ'....

সাধারণত, কোনকিছুর তীব্রতা বোঝাতে এই উজ্বাজ শব্দটা ব্যবহার করা হয়। এর আগের শব্দ, 'মিলহুন– লোণা' শব্দের পরে, লবণের পরিমাণের দিকে নির্দেশ করে আল্লাহ তা'লা এই শব্দ ব্যবহার করেছেন। কোনকিছুর অতিরিক্ততা বুঝাতেই এটি ব্যবহার করা হয়।

তাহলে, প্রশ্ন আসে, সমুদ্রের পানিকে 'মিলহুন' (লোণা) শব্দ দিয়ে বিশেষায়িত করার পরে 'উজ্বাজ' শব্দ দিয়ে জোর দেওয়ার কী কারণ?

কারণ হচ্ছে, নদীতে, বা মিনারেল ওয়াটার হিসেবে আমরা যে পানি পান করি, কম হলেও তাতে কিন্তু লবণ (সল্ট) থাকে। নাহলে, সেটা বিস্বাদ লাগতো। লিঙ্গুইস্টিক দিক থেকে, আমরা যে পানি পান করি, তাতেও যেহেতু লবণ থাকে, তাই সেই লবণের পরিমাণ থেকে সমুদ্রের পানির লবণের পরিমাণকে আলাদা করতেই আল্লাহ তা'লা একটি বাড়তি বিশেষণ লাগিয়ে জিনিসটাকে আরো সুন্দর,সুস্পষ্ট করেছেন, আলহামদুলিল্লাহ্।

এই কোরআনের প্রত্যেকটা শব্দ, প্রত্যেকটা অক্ষর চিন্তার দাবি রাখে।

This is a miracle. The miracle from our Lord.....

Heart and Brain: The connection

আমাদের শরীরে যে হার্ট আছে, সেটা নিয়ে মেডিকেল সাইন্স ব্যাপক চমৎকার তথ্য জানিয়েছে সম্প্রতি।

বিজ্ঞান আমাদের জানাচ্ছে আরো নতুন কিছু, বিশদভাবে।

Heart-Mind intersection ফিল্ডের সাম্প্রতিক গবেষণা বলছে, হার্টের সাথে আমাদের ব্রেইনের একটা ডাইনামিক যোগাযোগ রয়েছে।

অর্থাৎ, আমাদের ব্রেইনের যে Thinking ক্যাপাসিটি, তার সাথে আমাদের হার্টের রয়েছে একটা On Going রিলেশান।

গবেষণা বলছে, আমাদের হার্ট ব্রেইনের সাথে চারটি মেজর ওয়েতে যোগাযোগ করে।

'Science Of the heart: Exploring the role of the heart in human performance' নামক গবেষণা পত্রে ৪ টি পদ্ধতির উল্লেখ আছে যার মাধ্যমে হার্ট এবং ব্রেইনের মধ্যে যোগাযোগ হয়।

1/ Neurological communication (nervous system)

2/ Biophysical communication (pulse wave)

3/ Biochemical communication (hormones)

4/ Energetic communication (electromagnetic fields)

এই চারটি পদ্ধতিতে হার্ট আমাদের ব্রেইনের সাথে কমিউনিকেট করে, এবং আমাদের ব্রেইনের কাজে (Thinking Process) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

মোদ্দাকথা, আমাদের চিন্তা-ভাবনাশক্তির অনেকাংশেই রয়েছে আমাদের হার্টের ভূমিকা।

"And certainly We have created for hell many of the jinn and the men; they have hearts with which they do not understand'- Al A'raf, 179

['আমি বহু সংখ্যক জ্বীন এবং মানুষকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি। তাদের অন্তর (Heart) রয়েছে কিন্তু তারা উপলব্ধি করেনা']

"As to those who reject Faith it is the same to them whether thou warn them or do not warn them; they will not believe. Allah hath set a seal on their hearts and on their hearing and on their eyes is a veil great is the penalty they incur." - Al Baqara 6-7

['যারা সত্যকে প্রত্যাখ্যান করেছে, তাদের আপনি সাবধান করুন আর না করুন, তারা বিশ্বাস করবেনা। আল্লাহ তাদের অন্তরে (Hearts) এবং তাদের কর্ণ এবং চক্ষু সমূহে মোহর মেরে দিয়েছেন।']

"Then do they not reflect upon the Qur'an, or are there locks upon [their] hearts?"- Muhammad 24

['তারা কী কোরআন সম্পর্কে গভীর চিন্তা-ভাবনা করেনা? নাকী তাদের অন্তর তালাবদ্ধ?']

একটা সময় ইসলাম বিদ্বেষীরা উপরের আয়াতগুলো দেখিয়ে প্রশ্ন করতো,- আচ্ছা, আমরা তো চিন্তা করি, ফিল (অনুভব, অনুধাবন) করি ব্রেইনের মাধ্যমে। তাহলে কোরআন কেনো 'চিন্তা-ভাবনা' করার কথা বলার সময় ব্রেইনের কথা না বলে হার্টের কথা বলে? এটা কী বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে ভুল নয়?

জ্বি না। আধুনিক বিজ্ঞান অনুসারে কোরআন এখানে ভুল নয়।

(আধুনিক বিজ্ঞান কোরআনের মাপকাঠিও নয়। কেবল কথার পিঠে কথা)।

কারণ, আধুনিক বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে আমাদের ব্রেইনের সাথে হার্টের একটা যোগসাজেশ আছে যেটা আমাদের চিন্তা-ভাবনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

এমনকি, Dr. Yasha Kresh (PhD, Professor of Cardiothoracic Surgery and Medicine, Research Director of Cardiothoracic Surgery) হার্টের ব্যাপারে বলতে গিয়ে বলেছেন–

"It turns out that the heart has its own 'brain' - an intrinsic nervous system."

আমাদের হার্টের Nervous System, যার মাধ্যমে হার্ট ব্রেইনের সাথে Neurological Communication সম্পন্ন করে, তাকে Dr. Yasha Kresh হার্টের 'নিজস্ব ব্রেইন' বলেই উল্লেখ করেছেন।

সুতরাং, হার্টের সাথে ব্রেইনের এই ইন্টারেকশান সত্ত্বেও, 'হার্ট চিন্তা–ভাবনার জগতে কোন ভূমিকা রাখেনা' এই চিন্তাটাই বরং এখন অবৈজ্ঞানিক।

কোরআন এখানে শতভাগ সঠিক, আলহামদুলিল্লাহ্‌।

আধুনিক বিজ্ঞানকে একপাশে রেখে, সাহিত্যমানের বিচারেও যদি কোরআনকে বিচারের মানদন্ডে দাঁড় করানো হয়, তবুও এক্ষেত্রে কোরআন সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে উত্তীর্ণ হবে, আলহামদুলিল্লাহ্‌।

যেমন– ধরা যাক, আমাদের চিন্তাশক্তি, অনুভব শক্তিতে হার্টের কোন ভূমিকা নেই। ব্রেইনেরই ভূমিকা সব।

এখন, আমরা কী বলি,- 'I Love you from the core of my Brain?' অথবা, 'I miss you from the deepest corner of my Brain?'

আমরা এরকম বলি না। Love, miss এগুলো হলো ইমোশান,ফিলিংস। এগুলো আসে ব্রেইন থেকে।

তাহলে, আক্ষরিক অর্থে আমাদের বলা উচিত 'I Love you from the core of my brain' অথবা 'I Love you from the deepest corner of my brain'....

কিন্তু আমরা কী বলি? আমরা বলি,- 'I Love you from the core of my heart'।

এটা হচ্ছে সাহিত্যের মুন্সিয়ানা। সুতরাং, কোরআনকে আপনি যে দৃষ্টিকোণ থেকেই দেখুন, কোরআন ঠিকই উতরে যাবে।

কুরবানী নিয়ে নাস্তিকদের পাগলামি

কোরবান আসন্ন হলেই আমাদের ইসলাম বিদ্বেষী নাস্তিক এবং কথিত সেক্যুলারদের গাত্রদাহ শুরু হয়ে যায়।

পুরো বছরের 'পশুপ্রেম' তাদের এই একটি বিশেষ দিনেই কেবল উত্থিত হয়ে উপচে পড়ে।

ভাবখানা এমন,- দুনিয়ার আর কোথাও কখনো পশু জবাই হয়না। কেবল কোরবানির দিনেই মাথামোটা (তাদের মতে) মুসলিমরা পৃথিবীতে এই নৃশংস হত্যালীলায় মেতে উঠে।

অথচ, এই ইসলাম বিদ্বেষী মহল যে ভারতকে তাদের 'ক্বিবলা' মনে করে, সেই ভারত হলো গরুর মাংশ রপ্তানীতে পৃথিবীতে শীর্ষস্থানীয় দেশ।

পুরো বছরে ভারতে যে পরিমাণ গরু জবাই হয় তার পরিমাণ এতোই বেশি যে- পুরো পৃথিবীতে মুসলিমরা টানা ১০ বছর ঈদুল আযহা উদযাপন করেও সে পরিমাণ পশু জবাই করে না।

কিন্তু, আমাদের ইসলাম বিদ্বেষী চক্রের বিশেষ ফিল্টারে ভারতের সেই গরু জবাই কোনভাবেই নৃশংসতা নয়। বরং তা আমিষ সরবরাহের উত্তম উপায়।

কিন্তু, যেই না তার সাথে অচ্ছুৎ মুসলমানদের ঈদ উৎসব এবং ধর্মের নাম যোগ হয়, তক্ষুণি সেটা নৃশংস, হত্যাযজ্ঞ, হত্যালীলায় পরিণত হয়।

তখন তারা মুরগির রানে কামড় দিয়ে বলে,- 'আহা! মুসলিমের বাচ্চারা কী খারাপ! এভাবে প্রাণ হত্যা করার নাম ধর্ম হয়?'.....

ইসলাম বিদ্বেষী চক্রের এসব পুরনো কাসুন্দী পাবলিক এখন আর খায় না।

এখন এরা নতুন থিওরি দাঁড় করিয়েছে। নতুন থিওরিটা সুন্দর। আগের মতো এ্যাটাকিং কোন মুড নেই।

তারা আবেগমিশ্রিত গলায় বলতে চাচ্ছে- 'মুসলিমর ভাইয়েরা আমার! আপনারা কোরবানে গরু জবাই করেন, ভালো কথা। সমস্যা নেই।

কিন্তু, একবার বন্যা দূর্গত মানুষদের কথা ভাবুন। দেশের বন্যা কবলিত অঞ্চলের মানুষদের দিকে তাকান। দেখুন তারা কী কষ্টের মধ্যে দিনানিপাত করছে। আবহাওয়াবিদরা জানাচ্ছেন, দেশে ২০০ বছরের ইতিহাসের ভয়াবহতম বন্যা সংঘটিত হতে যাচ্ছে।

আপনারা যারা কোরবানির পশু জবাই করে আল্লাহকে খুশি করতে চান, তারা কী সেই টাকাগুলো দিয়ে বন্যা কবলিত মানুষের পাশে দাঁড়াতে পারেন না? পশু জবাই করেন আল্লাহকে খুশি করার জন্য। এসব দুস্থদেরও সাহায্য করলেও নিশ্চই আল্লাহ খুশি হবেন....'

নিঃসন্দেহে চমৎকার থিওরি। সেক্যুলারদের পক্ষ থেকে মুসলিমদের জন্য স্মরণকালের সেরা নরম সুরের নাসীহাহ মনে হয় এটিই।

কিন্তু, কথা হলো গিয়ে, বন্যা তো দেশে এবার নতুন হচ্ছেনা। **প্রত্যেক বছরই দেশে বন্যা হয়।** কই, পহেলা বৈশাখ গেলো, পান্তা-ইলিশ উৎসব গেলো, ভুভুজেলা-মুখোশ পরে মঙ্গল শোভাযাত্রা করে বৈশাখকে বরণ করে নেওয়া হলো।
খরচ হলো লক্ষ লক্ষ টাকা....
তখন তো বন্যা কবলিতদের নিয়ে ভাবা হয় নাই।
বলা হয় নাই- **'আপনারা দয়া করে পান্তা-ইলিশ খেয়ে, বৈশাখী রঙ-বেরঙের ড্রেস কিনে, রঙ-তুলি মেখে, মুখোশ পরে, মিছিল-শোভাযাত্রা করে লাখ লাখ টাকা খরচ করবেন না। এই টাকাগুলো দিয়ে আপনারা বন্য দূর্গতদের সাহায্য করবেন।'**
বলেছিলেন কী?

দেশে লাভ ডে যায়, হাগ ডে, কিস ডে, ফ্রেন্ডশিপ ডে'র মতো এত্তো এত্তো ডে যাওয়া-আসা করে।
কই, আপনেরা কী বলেন যে- 'আপনারা প্রেমিকা নিয়ে ঘুরে, ডেটিং করে যা টাকা খরচ করবেন, তা বন্যা দূর্গতদের জন্য রেখে দেন।'
বলেন কী? বলেন না।
মুসলমানদের ঈদ নিয়ে আপনারা কিন্তু ঠিকই নতুন ফর্মূলা দাঁড় করে ফেলেছেন। আপনারা ভেবেছেন- ইসলাম ধর্মের বিধি বিধানগুলো আপনাদের মানবরচিত সংবিধানের নীতিমালার মতো। ৬ জনের মধ্যে ৪ জন মত দিলেই চেইঞ্জ করে ফেলা যায়। যখন ইচ্ছে নিজেদের মতো করে মানিয়ে নেওয়া যায়।

ডিয়ার ইসলাম বিদ্বেষী সেক্যুলার ভাই-সকল,
এটা আপনাদের মানবধর্ম নয় যে নিজের মতো করে ধর্ম বানিয়ে নিবেন।
এটা আল্লাহর দ্বীন। আর আল্লাহর দ্বীন কীভাবে পালন করতে হবে তার জন্য পরিপূর্ণ গাইডলাইন তিনি সাড়ে ১৪০০ বছর আগে পাঠিয়ে দিয়েছেন।
এখানে 'চুস এন্ড পিক' এর কোন সুযোগ নেই।
দয়া করে নিজেদের ভাঁড়ামিপূর্ণ আইডিয়া দিয়ে আমাদের ধর্ম নিয়ে নাক গলাতে আসবেন না।
নিজেদের ইচ্ছেমতো ধর্ম বানিয়ে নেওয়ার রুলসটা নিজেদের জন্য জারি রাখুন। আমাদের উপর চাপাবেন না দয়া করে।
আর হ্যাঁ, বন্যা দূর্গতদের সাহায্যের কথা বলছেন না?
খোঁজ নিয়ে দেখুন, যারা ত্রাণ-তহবিল নিয়ে যাচ্ছে, তাদের ৮০ ভাগই ধর্মপ্রাণ মুসলিম।
তারা আপনাদের মতো **এসির হাওয়ার মধ্যে বসে, মুরগির রান আর গরুর কলিজা চিবাতে চিবাতে মানবতা নিয়ে হাঁ-হুতাশ করেনা।**
যারা ২ টা গরু দিয়ে কোরবানি করে, তারা দরকার হলে একটি গরু দিয়ে কোরবানি করে, একটা গরুর টাকা বন্যা দূর্গতদের জন্য পাঠিয়ে দেবে।

যারা একটা গরু দিয়ে কোরবানি করে, তারা দরকার হলে ছাগল দিয়ে কোরবানি করে বাকী টাকা বন্যা কবলিতদের জন্য পাঠিয়ে দেবে।
কিন্তু, আপনাদের পরামর্শে কোরবানি করা ছেড়ে দেবে কোন দুঃখে?

'নিদর্শনের সন্ধানে'

বর্তমান মিশরের পিরামিড কেন্দ্রিক যে অঞ্চল, তার পুরোটাই মরুভূমি। একটা সময়, প্রাচীন মিশরে এই অঞ্চলকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে একটি বৃহৎ সভ্যতা। এই অঞ্চলের লোকদের স্থাপত্যশিল্প, রন্ধনশিল্প, জ্যোতিষশাস্ত্র ইত্যাদি বিষয়ে পারদর্শিতার জন্য জগৎজোড়া খ্যাতি ছিলো। এটি আজকের কথা নয়। আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর আগেকার কথা। প্রাচীন মিশরে তখন 'ফারাও' (ফেরাউন) গোষ্ঠীর রাজত্ব।
ইতিহাসবিদরা সকলে একমত যে- বর্তমানে আমরা যে পিরামিড দেখি, তা প্রাচীন মিশরের প্রাচীন সভ্যতার প্রাচীন শাসক ফারাওদের হাতেই নির্মিত....
শুধু পিরামিডই নয়, প্রাচীন এই সভ্যতার জনগোষ্ঠীর হাতে নির্মিত হয়েছে আরো বহু স্থাপত্যশিল্প যার অনেককিছু সময়ের বিবর্তনে হারিয়ে গেছে।
আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর আগে নির্মিত পিরামিডের স্থাপত্যশৈলী দেখলে বর্তমান দুনিয়ার সু-উন্নত টেকনোলোজিকে আপনার নেহাৎ **'শিশু'** মনে হবে। তাহলে চিন্তা করুন ৫০০০ বছর আগে তারা আমাদের চেয়ে কতোটা এগিয়ে ছিলো।

প্রত্নতত্ববিদরা (Archaeologist) বিশ্বাস করতেন, এই যে, পিরামিডের মতো এসব চোখ ধাঁধানো স্থাপত্যশিল্প, এসব মরুভূমির বালুর বুকেই নির্মিত হওয়া। অর্থাৎ, তাদের ধারণা ছিলো, বর্তমান মিশরের পিরামিড অঞ্চলকে আমরা যেরকম দেখছি (মরুভূমির উপরে), আজ থেকে ৫০০০ বছর আগে নির্মিত হওয়ার সময়টাতেও (অর্থাৎ, ফেরাউনদের সময়টাতে) এই পরিবেশ ঠিক এরকমই ছিলো। অর্থাৎ, এখন যেমন আমরা মরুভূমি দেখছি, তখনও এরকম মরুভূমিই ছিলো এই অঞ্চল।

কিন্তু প্রত্নতত্ববিদদের খুব সাম্প্রতিক গবেষণা তাদের সুদীর্ঘকালের বিশ্বাসে জল ঢেলে দিলো। সাম্প্রতিক গবেষণা মতে, আজকের মিশরের পিরামিড অঞ্চলকে আমরা যেরকম মরুভূমিময় দেখছি, প্রাচীনকালে এই অঞ্চল এমন ছিলো না।
অর্থাৎ, আজ থেকে ৫০০০ বছর আগে যখন পিরামিডের মতো এসব স্থাপত্যশিল্প নির্মিত হচ্ছিলো, তখন সে অঞ্চল মরুভূমি, বালুময় ছিলো না।
তাহলে কেমন ছিলো তখন এসব অঞ্চল?
ব্রিটিশ পত্রিকা 'ডেইলি মেইল' ২০১২ সালে 'Climate change wiped out one of the world's first, great civilisations more than 4,000 years ago' নামে একটি সংবাদ কাভার করে।
সেখানে প্রত্নতত্ববিদরা তাদের গবেষণার ফসল হিসেবে জানিয়েছেন- **আজ থেকে ৪৫০০-৫০০০ বছর আগে মিশরের এই অঞ্চলগুলো ছিলো সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামলা। এখানে নদী**

ছিলো, ঝর্ণা ছিলো, পাহাড় ছিলো। এই নদী,পাহাড়, ঝর্ণার পাশেই গড়ে উঠেছে তখনকার সেই সভ্যতা।

অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির প্রত্নতত্ত্ববিদ, প্রফেসর Michael Petragliaof বলেছেন,- "that beneath these sands, there's an enormous network of rivers which once fed the Egyptian civilization and which enabled the pharaohs to establish a great kingdom almost five thousand years ago"

অর্থাৎ, তারা এই মরুভূমির বালুকণা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে, স্যাটেলাইট ডাটার মাধ্যমে দেখেছেন যে, এইসব অঞ্চলে একসময় নদীর অস্তিত্ব ছিলো, এবং এই নদীগুলো ফারাওদের তাদের রাজত্ব নির্মাণে সহায়তা করেছে।

তাহলে এইসব নদী, পাহাড়, ঝর্ণা সহ এরকম সবুজাভ প্রকৃতি কোথায় মিলিয়ে গেলো? কেনোই বা সেখানে এখন দৃষ্টির দূরতম সীমানা পর্যন্ত শুধু মরুভূমির বালুকণা?
প্রত্নতত্ত্ববিদরা বলেছেন- এর কারণ জলবায়ুর পরিবর্তন।
অর্থাৎ, জলবায়ুর ব্যাপক পরিবর্তনের সাথে সাথে একসময়কার এরকম সবুজাভ প্রকৃতি মিলিয়ে গিয়ে মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে।

ফারাও, তাদের রাজত্ব এবং তাদের সভ্যতা নিয়ে প্রত্নতত্ত্ববিদগণ তাদের ধারণা পাল্টেছেন। তারা উপসংহারে এসেছেন যে- এখন যে মরুভূমিময় অঞ্চল আমরা দেখছি, একটা সময় এটি এরকম ছিলো না। ৫০০০ বছর আগে এটি একটি সবুজাভ সভ্যতা ছিলো। সেখানে ছিলো প্রাণের উৎস। **ছিলো পাখ-পাখালির কোলাহল।**

ফারাওদের (ফেরাউনদের) ঘটনা আমরা পবিত্র আল কোরআনেও দেখতে পাই। আল্লাহ তা'লা ফেরাউনের ঘটনা বর্ণনা করেছেন কোরআনের বেশকিছু জায়গায়।

কয়েকটি জায়গায় আছে-

"And Pharaoh proclaimed among his people, saying: "O my people! does not the dominion of Egypt belong to me, (witness) these streams flowing underneath my (palace)? What! See ye not then?"

["ফেরাউন তার সম্প্রদায়ের মাঝে ঘোষণা দিল। বলল- হে আমার সম্প্রদায়! মিসরের রাজত্ব কী আমার নয়? আর এ সব নদনদী (যা আমার প্রাসাদের) নীচ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে, তোমরা কি তা দেখ না? " - সূরা যুখরুফ, ৫১]

<u>এই আয়াতে প্রাচীন মিশরের ফারাওদের রাজত্বকালে তাদের অঞ্চলের আশপাশে নদ-নদীর যে অস্তিত্ব ছিলো, তার একটি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত।</u>

এতোদিন ধরে মনে করা হতো, ৫০০০ বছর আগ থেকেই তাদের অঞ্চল আজকের মতো মরুভূমিময় ছিলো। কিন্তু কোরআন সেই সময়কার ঘটনা উল্লেখ করতে গিয়ে তাদের অঞ্চলে নদ-নদীর অস্তিত্বের ইঙ্গিত দিচ্ছে।

ফেরাউনের ঘটনা বলতে গিয়ে আরেকটি জায়গায় বলা হচ্ছে-

"And we removed them from gardens & springs" - Ash-Shuara 57

অর্থাৎ- ["এবং আমি তাদেরকে বিতাড়িত করলাম উদ্যানরাজি এবং ঝর্ণাসমূহ থেকে "]

এখানেও ফেরাউনের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে তার সময়কার উদ্যান (যা মরুভূমিতে অসম্ভব) এবং ঝর্ণারাজির কথা বলছে।

আরো একটি আয়াতে বলা হচ্ছে-

"How many were the gardens and springs they left behind, And corn-fields and noble buildings,"- Dukham 25-26

" [তারা পশ্চাতে রেখে গিয়েছিলো কতো উদ্যান এবং ঝর্ণাধারা। কতো শস্যক্ষেত এবং অভিজাত অট্টালিকা "]

এই আয়াতেও, ফেরাউন (ফারাওদের) এবং তাদের শেষ পরিণতি সম্পর্কে বলতে গিয়ে এমন কিছু (উদ্যান, ঝর্ণাধারা, শস্যক্ষেত এবং অভিজাত অট্টালিকা) ইঙ্গিত দিচ্ছে, যা প্রত্নতত্ববিদরা আমাদের নিশ্চিত করেছেন কেবল সেদিন।

প্রত্নতত্ববিদরা এতোদিন ভাবতেন যে- প্রাচীন ফারাওদের রাজত্ব ছিলো মরুভূমিতেই। এই সভ্যতা টিকেই ছিলো মরুভূমির উপরে। কিন্তু মাত্র সেদিন তারা জানালেন যে- তারা এতোদিন যা ধারণা করেছে, তা ভুল। প্রাচীন ফারাওরা কখনোই মরুভূমির লোক ছিলো না। তারা শস্য-শ্যামল, সবুজাভ প্রকৃতির মধ্যে বাস করতো। তাদের অভিজাত অট্টালিকা (পিরামিড, ইত্যাদি....) মরুভূমিতে নির্মিত হয়নি। তা হয়েছে নদীর পাড়ে, নদীর অববাহিকায়.... ঠিক একই তথ্যগুলো, একই চিত্রপট আজ থেকে সাড়ে চৌদ্দ শ বছর আগে আল কোরআন আমাদের জানাচ্ছে, আলহামদুলিল্লাহ্।

এই যে এই ব্যাপারগুলো, এই নিদর্শনগুলো অবিশ্বাসীদের দেখানোর জন্য লিখি না। এগুলো লিখি নিজেদের জন্য। কোরআন নিয়ে ভাবতে ভালো লাগে। কারণ, আল্লাহ কোরআন নিয়ে ভাবতে বলেছেন।

'নিখাদ ভালোবাসার গল্প'

মেডিকেলের ফাইনাল ইয়ারের সময় একটি মেয়ে আমাকে প্রায়ই বিরক্ত করতো।
এটাকে ঠিক 'বিরক্ত' বলা যাবে কীনা সন্দেহ।
বিরক্ত না বলে এটাকে 'উত্যক্ত' বলাটাই বোধহয় যুক্তিযুক্ত। কেননা, ফ্রেন্ড সার্কেলে 'হাড় বজ্জাত' টাইপ এমন অনেকেই ছিলো, যারা আমাকে বিরক্ত করে একরকম পৈশাচিক আনন্দ পেতো।

বন্ধুমহলে আমি ছিলাম একটু ভোলাভালা টাইপের। চোখে হাল আমলের মোটা, কালো ফ্রেমের একটি চশমা থাকতো।
এই চশমাটির জন্যে ক্যাম্পাসে আমার নাম রটে যায় 'কালিদাস পন্ডিত'। কি বিচ্ছিরি নাম! মোটা ফ্রেমের চশমার ভিতর দিয়ে স্যারের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকতাম। দুষ্টুমি, আড্ডা সহ অন্যান্য সবকিছুতে সবার চেয়ে পিছিয়ে থাকলেও, পড়াশুনায় বরাবরই আমি ভালো ছিলাম।

থার্ড ইয়ারে আমাদের একজন নতুন স্যার আসেন। বড় বড় চোখে সবার দিকে ড্যাব ড্যাব করে তাকান। চেহারায় সবসময় একটা 'সিরিয়াস সিরিয়াস' ভাব থাকে। মেডিকেল কলেজের প্রফেসর বলেই হয়তো এরকম একটা মুড নিয়ে চলেন।

প্রথম ক্লাশেই স্যার এসে জিজ্ঞেস করলেন,- 'একটি প্রশ্ন করবো। যে সঠিক উত্তর দিতে পারবে, ধরে নেবো সেই-ই হবে এই ব্যাচের সবচেয়ে সেরা সাইকিয়াট্রিষ্ট। কে আগে উত্তর দিতে চাও হাত তুলো।'
রুমকি ক্লাশে চঞ্চলা হিসেবে পরিচিত ছিলো। যথেষ্ট মেধাবী এবং বুদ্ধিমতী। সেই-ই একমাত্র হাত তুললো।
স্যার বললেন,- 'Very good girl. Anyone from the gentlemen?'
আমাদের কেউই হাত তুলিনি। স্যারকে উত্তর দেবো কী, স্যারের চেহারার অবস্থা দেখেই আমরা ভয়ে কুঁকড়ে যাচ্ছি।
স্যার রুমকিকে প্রশ্ন করলেন,- 'বলো দেখি, উত্তেজিত অবস্থায় মানুষের শরীরের কোন অঙ্গটি স্বাভাবিকের চেয়ে দশগুণ বড় হয়ে যায়?'
এতক্ষণ ক্লাশে যারা চুপচাপ ছিল সবাই স্যারের দিকে মাথা তুলে হাঁ করে তাকালো। অবস্থা এমন,- এই প্রশ্নের উত্তর এমন কিছু, যা জনসমক্ষে বা ক্লাশ রুমে সবার সামনে দেওয়া যাবে না।

রুমকির অবস্থাও সেরকম। সে লজ্জায় লাল হয়ে বললো,- 'স্যার, দুঃখিত! উত্তরটি আমি জানি। কিন্তু বলতে পারবোনা।'
ক্লাশের সবাই হঠাৎ হোঁ হোঁ করে হেসে উঠলো। কেন হেসে উঠলো আমি বুঝিনি। আমি চুপচাপ।
স্যার আমার দিকে তাকিয়ে বললেন,- 'সবাই হাসলো, তুমি চুপচাপ কেনো?'
আমি মাথা নিঁচু করে বললাম,- 'স্যার, সবাই কেন হাসলো আমি ঠিক জানিনা। May be I've missed the point'
স্যার বললেন,- 'তুমি কী প্রশ্নটির উত্তর দিতে পারো?'
আমি বললাম,- 'জ্বি।'
-- 'Fine। বলো দেখি, উত্তেজিত অবস্থায় মানুষের শরীরের কোন অঙ্গটি স্বাভাবিকের চেয়ে দশগুণ বড় হয়ে যায়?'...

এটা নিয়ে একটি গল্প প্রচলিত আছে। গল্পটি আমার জানা ছিলো।
আমি বললাম,- 'স্যার, উত্তেজিত অবস্থায় মানুষের চোখের মণি স্বাভাবিকের চেয়ে দশগুণ বড় হয়ে যায়।'
স্যার খুশিয়াল গলায় বললেন,- 'Exactly. You are absolutely right my son. I'm looking a very bright future of you...'
এরপর স্যার ক্লাশে আরো ৩০ মিনিট লেকচার দিলেন। লেকচারের সারমর্ম ছিলো– 'মানুষ স্বাভাবিকভাবে নেগেটিভ জিনিসের প্রতি বেশিই আকর্ষিত। জগতে যাদের সফল মানুষ হিসেবে আমরা চিনি, তাদের ন্যাচার অনুসন্ধান করে জানা গেছে, কোনকিছুর ব্যাপারে তারা নেগেটিভ জিনিসটা ভাবার আগে, পজিটিভ জিনিসটা ভাবতেন এবং পজিটিভ রেজাল্ট নিয়ে কাজ করতেন।'

দীর্ঘ লেকচার শেষ করে স্যার আবার আমার দিকে তাকালেন। বললেন,- 'তোমার নাম?'
আমার নামটি আমাকে বলার কেউই সুযোগ দিলোনা। ক্লাশের সবাই একযোগে বলে উঠলো,- 'কালিদাসসসসসসস পন্ডিত।'

এটা তো আমাকে বিরক্ত করার একটা ঘটনা মাত্র। আমাকে তারা যে কী পরিমাণ জ্বালাতন করতো তা ল্যাব,লাইব্রেরি আর আমার চশমাটাই জানে।
কিন্তু ফাইনাল ইয়ারে এসে এই মেয়েটির জ্বালাতনকে ঠিক বিরক্ত বলতে পারছিনা।

ফাইনাল ইয়ারে আছি। লাষ্ট প্রফটা শেষ হলেই ইন্টার্ণি। দিন–রাত এক করে পড়তে হচ্ছে। টেবিলেই খাওয়া,টেবিলেই পড়া, টেবিলেই ঘুম।

মেয়েটির জ্বালাতনের ধরনটি বড্ড অদ্ভুত ধরনের। মাঝরাতে ফোন দিতো। ফোন দিয়ে বলতো,- 'আপনার কী একমিনিট সময় হবে,প্লিজ?'
আমি তখন আছি ভীষণ প্যারার মধ্যে।

তখন একমিনিট আমার কাছে এক বছরের মতো।
তবু আমি বলতাম, - 'জ্বি, বলুন?'
মেয়েটা বলতো,- 'আমাকে একটি মরার রাস্তা বলে দেবেন?'
কী বিদঘুটে প্রশ্ন। এত রাতে এরকম ফাজলামো করার কোন মানে হয়?
মেয়েটা বলে যেতো,- 'আমি বাঁচতে চাইনা। ওরা আবার আসবে। ওরা আমাকে আবার নিয়ে যাবে। আমি তার আগেই মরে যেতে চাই,প্লিজ।'
আমি ফোনের লাইন কেটে দিই। মেয়েটা আবার ফোন করে,- 'আপনার কী একমিনিট সময় হবে,প্লিজ?'
আমি বলতাম,- 'বলুন।'
- 'আমাকে একটি মরার রাস্তা বলে দেবেন?'
আমি কিছু না বলেই লাইন কেটে দিই। একবার ভাবি, আমার বন্ধুদের কেউ এই ফাইজলামিটা করছে না তো?
পরক্ষনে ভাবি, 'ধুর! তারাও তো আমার মত পরীক্ষা নিয়ে ব্যস্ত! এসব করার তাদের সময় কই?'
তাহলে কে এই মেয়ে?

মেয়েটা প্রত্যেকদিন ওই সময়েই আমাকে ফোন দিতো। ফোন দিয়ে খালি একই প্রশ্ন করতো।
'একটি মরার রাস্তা বলে দেবেন?'
প্রথম প্রথম দু'চার কথা শোনাতাম। পরে ফোন আসলেই কেটে দিতাম। উপদ্রব!!
ফোনের সুইচ অফ রাখতেও পারতাম না বিভিন্ন কারনে। মেয়েটা ফোনে না পেয়ে ম্যাসেজ করতো। লিখতো- 'আমাকে একটি মরার রাস্তা বলে দেবেন?'
আমি বিরক্ত হতাম প্রচন্ড। এরকম প্রশ্নের কোন উত্তর হয়?
মেয়েটা এভাবেই আমাকে টানা দুই মাস বিরক্ত করে। পরে কোথায় চলে গেলো কে জানে। বেঁচে আছে না মরার কোন রাস্তা পেয়ে সত্যিই মরে গেছে জানিনা। আমিও আর পরে কোন খবর নিইনি। ভুলেই গিয়েছিলাম ব্যাপারটা।

আমি তখন দেশের একজন নামকরা সাইকিয়াট্রিষ্ট। আমার নিজের দুটো রিসার্চ পেপার এ্যামেরিকার 'মেডিকেল অফ সান ফ্রান্সিস্কো' তে ব্যাপক সাড়া ফেলে দেয়।
'পেপার অফ সাইকোলজি' নামক বিশ্বখ্যাত জার্নালে প্রকাশিত হয় আমার পেপার দুটো।
বিদেশের নামী-দামী জায়গা থেকে অফার আসে জয়েন করার জন্য। কিন্তু আমি দেশেই রয়ে যাই।

একবার আমার চেম্বারে একজন মহিলা রোগি আসেন। সাথে মহিলার স্বামী।
মহিলা হালকা-পাতলা গড়নের। একটি খয়েরি রঙের শাড়ী পরে এসেছেন।
মহিলার স্বামীর গায়ে একটি চকোলেট কালারের শার্ট।

লোকটির মনে হয় রঙ সম্পর্কে কোন ধারনাই নেই। এরকম কাঠফাঁটা রোদে কেউ চকোলেট কালারের শার্ট গায়ে দেয়? রঙটা দেখতেই তো গরম গরম লাগে।

মহিলা আমার চেম্বারে ঢুকা মাত্রই আমার ঠিক সামনের চেয়ারে এসে ধপাস করে বসলেন। বুঝলাম, ইনিই রোগী। বসার স্টাইলটাও স্বাভাবিক। একজন সাইকিয়াট্রিষ্টের চেম্বারে রোগীরা এভাবে বসবে না তো কিভাবে বসবে? এটা মেন্ট্যাল ডিস-অর্ডারের ফল। এদের কাছে এটাই ঠিক। এটাই শুদ্ধ।
আমি উনার স্বামীর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম,- 'কি সমস্যা উনার?'
মহিলার স্বামী কিছু বলার আগেই মহিলা আমার হাত ধরে বললেন,- 'আপনি কী আমাকে মরার একটি রাস্তা বলে দেবেন,প্লিজ? ওরা আবার আসবে। ওরা আমাকে নিয়ে যাবে। তার আগেই আমি মরে যেতে চাই,প্লিজ?'
ঘটনার আকস্মিকতা এবং মহিলার কথায় আমি মূহুর্তে চমকে উঠি। এই মহিলাই কী সেই, যে আজ থেকে আট বছর আগে আমাকে মাঝ রাত্তিরে ফোন দিয়ে মরার উপায় জানতে চাইতো? এটা কী করে সম্ভব? আমি অবাক হই।

আমার হাত ধরা অবস্থাতেই মহিলা সেন্সলেস হয়ে পড়ে যান। আমি উনার স্বামীর কাছে বিস্তারিত জানতে চাইলাম। তিনি বলতে লাগলেন-

'আজ থেকে আট বছর আগে আমাদের দেখা। কমলাপুর রেল স্টেশানে। রাতের ট্রেনে করে আমি চিটাগং যাবো। ট্রেন ছাড়ার একটু আগে, ট্রেনে উঠতে যাবো, এমন সময়ে আমি দেখলাম, রেল লাইনের উপর একটি মেয়ে উপুড় হয়ে পড়ে আছে। আমি দ্রুত গিয়ে মেয়েটাকে টেনে সরিয়ে নিই।'
আমি খুব মনোযোগী শ্রোতা। এটুক বলে মহিলার স্বামী থামলেন। আমি বললাম,- 'তারপর?'
লোকটা পাশের বেডে শোয়া তাঁর স্ত্রীর দিকে তাকালেন। এরপর বললেন,- 'মেয়েটা তার নাম, ঠিকানা কিছুই বলতে পারেনা। শুধু বলে, - আমাকে একটি মরার রাস্তা বলে দেবেন,প্লিজ? ওরা আবার আসবে। তার আগেই আমি মরে যেতে চাই....ওরা মানে কারা আমি বুঝতে পারিনা। মেয়েটিও বলতে পারেনা।'

- 'এরপর?'

- 'এরপর মেয়েটিকে আমি বিয়ে করি।'
- 'বিয়ে? কেনো?'
লোকটি আমার এ প্রশ্নের উত্তর দেন নি। আমি আবার বললাম, - 'আপনার পেশা?'
- 'মেয়েটিকে যখন বিয়ে করি, তখন আমি ছিলাম একজন সরকারী কর্মকর্তা।'
- 'আপনি কী জানতেন না যে, মেয়েটি মানসিকভাবে অসুস্থ?'
- 'জানতাম...'

-'তবুও বিয়ে করলেন?'
লোকটি আমার এই প্রশ্নটিরও কোন উত্তর দিলেন না। উনি উনার মতো বলে যেতে লাগলেন-

'বিয়ের পরে যখন তাঁর ম্যান্টাল সমস্যাটা বেড়ে যেতো, তখন সে ঘরের আসবাবপত্র ভেঙে ফেলতো। হাতের কাছে যা পেতো, ছুঁড়ে মারতো। আমাদের প্রথম সন্তানকে একরাতে গলা টিপে হত্যা করে ফেলে সে।'
এই কথা শোনার পর আমি শিউরে উঠি। কী সাংঘাতিক! কিন্তু লোকটাকে খুব শান্ত মনে হলো। উনার সন্তানকে তাঁর অসুস্থ স্ত্রী গলা টিপে মেরে ফেলেছে এটা যেন খুব স্বাভাবিক কোন ব্যাপার!
লোকটা বলে যেতে লাগলো-

'একরাতে আমি অফিসের খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি ফাইল রেডি করছিলাম। এমন সময় তাঁর মধ্যে পাগলাটে ভাবটা চলে আসে।'
আমি আমার মোটা, কালো ফ্রেমের চশমাটা ঠিক করে নিয়ে বললাম,- 'তারপর?'
'এরপর সে আমার টেবিল থেকে ফাইলটা নিয়ে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে।'
আমি আবারো শিউরে উঠি। বললাম,- 'এরপর?'
লোকটা বলেন,- 'এরপর আর কী! আমার সরকারি চাকরিটা চলে গেলো।'
আমি তৃতীয়বারের মতো চমকে উঠলাম। বললাম,- 'বলেন কী? এতোকিছুর পরও আপনি ঘর-সংসার করছেন?'
লোকটা স্মিত হাসলো। খুবই সুন্দর হাসি। এরকম হাসিটা খুব সুখী মানুষরাই কেবল হাসতে পারে। একজন সাইকিয়াট্রিষ্ট হিসেবে এটা আমি ভালোভাবেই জানি।
লোকটা বললেন,- 'ডাক্তার সাহেব! আমি আমার স্ত্রীকে মন-প্রাণ দিয়ে ভালোবাসি। তার জন্য চাকরি, সন্তান কেনো, আমি আমার প্রাণটাও দিতে প্রস্তুত।'

লোকটার কথা শুনে আমার চোখে পানি চলে এলো। জীবনে এই প্রথম আমি এতোটা আবেগাপ্লুত হলাম।
আজ থেকে আট বছর আগে যাকে আমি ফোনে দুই মিনিট সহ্য করতে পারিনি, তাকে এই লোকটা কীভাবে এতোগুলো বছর, এতোটা ভালোবেসে যাচ্ছেন? এতোটা সহ্য করে যাচ্ছেন? এটাই মনে হয় প্রেম! এটাই মনে হয় ভালোবাসা। এরাই তো তারা, যারা পৃথিবীতে ভালোবাসা ফেরি করে বাঁচে।
আমি মনে মনে বললাম,- 'হাজার বছর বেঁচে থাকুক এই ভালোবাসা।'

পুনশ্চঃ (মহিলাটিকে পরে আমি চিকিৎসা করে সারিয়েছিলাম)

লিখেছিলাম গত বছরের ১৬ ই মে তে। ঈষৎ পরিমার্জিত করে আবার দেওয়া হলো।

দ্বীনের শিক্ষা

(১)

বসা ছিলাম অফিসে। একটি ইয়াং ছেলে আসলো। ছেলেটার মুখে দাঁড়ি, গায়ে পাঞ্জাবি, পায়জামা।
কথা বলার এক পর্যায়ে জানতে পারলাম সে ক্বওমী মাদ্রাসা থেকে সবে দাওরায়ে হাদীস শেষ করেছে।
অনেক গল্পগুজব করার পরে তার জন্য নাস্তার ব্যবস্থা করলাম। নাস্তা হিসেবে আনা হলো ড্রিংস এবং বিস্কিট।
গ্লাসে করে তাকে ড্রিংস পরিবেশন করা হলো। ছেলেটা বিস্কিট মুখে দিলেও কোনভাবেই ড্রিংস মুখে নিতে রাজি না।
আমি বললাম, - "প্লিজ, অল্প হলেও তো নেওয়া যায়"।
সে বললো,- "ভাইয়া, খাবার নিয়ে আমরা ভনিতা করিনা। যা খাওয়ার যোগ্য , এবং যদি আমি খাওয়ার মতো অবস্থায় থাকি, তাহলে আপনি না বললেও আমি অবশ্যই খেয়ে নিবো"।
আমি বললাম,- "ড্রিংসে কী সমস্যা?"
সে বললো,- "আসলে, এসবে (ড্রিংসে) এলকোহল থাকে। আর এলকোহল হলো একপ্রকার ড্রাগ। আমাদের ফিক্বহে এটা নিয়ে বলা আছে যে, এ জাতীয় কোনকিছুই মুখে দেওয়া যাবে না?"
- "আমার জানা মতে, এতে খুব অল্প পরিমাণই এলকোহল থাকে। তেমন তো সমস্যা নেই খেলে"।
- "স্যারি ভাইয়া, আসলে, এই একটু, অল্প অল্প এসব জিনিসই একসময় বৃহৎ আকার ধারণ করে। অল্প অল্প নেশা মানুষকে একটা পর্যায়ে নেশাখোর বানিয়ে তুলে"।

(২)

রমজান মাস। যাচ্ছিলাম রোহিঙ্গা ক্যাম্পে ত্রাণ নিয়ে। মিরপুর এরিয়া থেকে এক যুবক ছেলে এসে আমাদের সাথে যোগ দিলো। জানতে পারলাম, ছেলেটা ক্বওমীতে পড়াশুনা করে।
রাত তখন প্রায় ১২ টা। একটু পরেই বাস ছাড়বে। রাতের খাবার খাওয়ার জন্য আমরা পার্শ্ববর্তী একটি হোটেলে ঢুকলাম।
সবাই একসাথেই খাচ্ছিলাম। সবার আগে মিরপুর থেকে আসা ছেলেটির খাওয়া শেষ হয়। তার খাওয়া শেষ হলেও সে প্লেট ছেড়ে না উঠে বসেই আছে।
আমি বললাম,- "ভাই, আপনি হাত ধুয়ে আসুন, প্লিজ..."
সে কোনভাবেই হাত ধু'বে না। বললাম,- "কেনো?"
সে বললো,- "এটা সুন্নাহ"

- "কীরকম সুন্নাহ?"
- - "আল্লাহর রাসুল (সাঃ) যখন সাহাবা (রাঃ) দের নিয়ে একসাথে খেতে বসতেন, তখন তাদের কারো যদি আগে খাওয়া শেষ হতো, তবুও একজন অন্যজনের আগে আসন ছেড়ে উঠতো না। অপেক্ষা করতেন। এতে করে তাদের মধ্যকার সৌহাদ্যটা বাড়তো"।

আল্লাহু আকবর! আমি মাঝে মাঝে চিন্তা করি, আচ্ছা, এই ছেলেগুলো তো অক্সফোর্ড-ক্যামব্রিজে পড়েনি। ম্যানার, এটিচিউডের উপরে কোন কোর্স করেনি, কোন ডিপ্লোমা ডিগ্রি নেয় নি... তবুও, এরা সামান্য এলকোহলের জন্য একচুমুক ড্রিংস মুখে তুলে না। কারণ, এটা আস্তে আস্তে তার মধ্যে নেশা হয়ে উঠতে পারে, এই ভয়ে... এই ভয়টা কোত্থেকে পেলো ওরা?
দ্বীন থেকে। অথচ, নিজেকে আস্ত মুসলিম দাবি করা আমরা অনেকেই সিগারেট খাই হরদম। ইফতার করে মানুষ ইবাদাতে মগ্ন হয়, আর আমরা এমনই মুসলিম যে, কোনভাবে ইফতার করে সিগারেটে টান দিতে না পারলে যেন জান শেষ! আহা! পুরো ১৩-১৪ টা ঘন্টা কীভাবে যে কাটলো সিগারেট ছাড়া।

খাওয়া শেষে একসাথে উঠার মধ্যে সৌহাদ্যতা বাড়ে, হৃদ্যতা বাড়ে, এই জিনিসগুলো শেখার জন্য কী তাদের কোন ডিগ্রির প্রয়োজন হয়েছে? অক্সফোর্ড-ক্যামব্রিজের কোন সার্টিফিকেট? নাহ, দরকার হয়নি।
কেবল দরকার হয়েছে একটা দ্বীনী পরিবেশের, একটা দ্বীনী প্রতিষ্ঠানের... **এখানে জীবনের প্রত্যেকটা পাঠ আপনাকে হাতে-কলমে শিখিয়ে দেওয়া হবে।** এটা এমন জীবন, যে জীবনে ভনিতা নেই, কপটতা নেই। আছে মানুষের মতো মানুষ হবার দীক্ষা...
আমি বলছিনা দ্বীনী প্রতিষ্ঠানে না পড়ে এসব কেউ অর্জন করতে পারবেনা বা শিখতে পারবেনা। যেটা দরকার সেটা হলো দ্বীনের জ্ঞান, ধর্মের জ্ঞান। তখনই একজন বুঝতে শিখবে,

ফিল করতে শিখবে যে, Islam is the complete code of life....

বান্দরের বাচ্চা ডারউইন...

সকালবেলা স্যারের মন-মেজাজ খুব প্রফুল্ল থাকে। বিছানার পাশেই বিশাল একটি জানালা। জানালার ওপারেই বেলি, চম্পা, শিউলির গাছ। সকাল হলেই নতুন, মিষ্টি ফুলের গন্ধে পুরো রুম মৌ মৌ করে। আজও করছে।
একটু আগেই একটি চড়ুই পাখি জানালার কাছে এসে কিচিরমিচির করছিলো। অন্য সময় হলে চড়ুইটার এই কিচিরমিচির আওয়াজকে স্যারের কাছে বিরক্তিকর লাগতো। কিন্তু আজ স্যারের মন মেজাজ একদম ফ্রেশ। অনেকক্ষণ চড়ুইপাখির কিচিরমিচির আওয়াজ শোনার পরে স্যার পা দু'খানা খাট থেকে নিচে নামালেন।

স্যার এখন এক রাউন্ড দৌঁড়ে আসবেন। মর্নিং ওয়াক যাকে বলে। শরীর স্বাস্থ্য যদিও ফিটফাট, তবুও স্যার রোজ নিয়ম করেই ব্যায়াম করেন।
দৌঁড়ে আসার পরে স্যার ড্রয়িং রুমে এসে ধপাস করে সোপায় হেলান দিয়ে বসেন। স্যারের ঘরে যে লোকটা কেয়ার টেকারের কাজ করে, তার নাম কুদরত আলি। লোকটা নরসিংদীর। বয়স চল্লিশ কি বিয়াল্লিশ, এরকম।

স্যার প্রতিদিন এক রাউন্ড দৌঁড়ান। আজ কি মনে করে পুরো তিন রাউন্ড দৌঁড়ালেন। তিন রাউন্ড মানে পুরো তিন চক্কর। স্যার আঙুলে গুনে গুনে হিসেব করলেন। তিন চক্করে হয় মোট এক মাইল।
পুরো এক মাইল দৌঁড়ে স্যার ঘর্মাক্ত শরীর নিয়ে এসে প্রতিদিনকার মতোন সোপায় বসলেন ধপাস করে।গা এলিয়ে দিলেন। মাথার উপরে ফ্যান ঘুরছে জোরে জোরে............

'কুদরত.......?' – স্যার ডাক দিলেন। কিছুটা হাঁপাচ্ছেনও।
পাশের ঘর থেকে কুদরত আলি 'জ্বে স্যার' বলে দৌঁড় দিলো। কুদরত আলির হাতে স্যারের জন্য লেবুর শরবত।
স্যার শরবতের গ্লাসখানা হাতে নিলেন। ঢকঢক করে পুরো গ্লাসটা গলাধঃকরণ করে বললেন, 'আরেক গ্লাস দাও তো।'
'জ্বে স্যার' বলে কুদরত আলি আরেক গ্লাস লেবুর শরবত আনার জন্য ছুটলো।

- ইতোমধ্যেই স্যার অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে গেছেন। হাঁপানি কমে গেছে। দৌঁড়ালে হার্টবিট দ্রুত চলে। বুকের ধুকপুকুনি বেড়ে যায়। স্যারের হার্টবিট এখন স্বাভাবিক। স্যার সোজা হয়ে বসলেন।গুনগুন করে গাইতে শুরু করলেন, 'এই দিন যদি না শেষ হয়, তবে কেমন হতো তুমি বলো তো........?'

হঠাৎ কলিংবেল বেজে উঠলো। স্যারের মেজাজটা গেলো খারাপ হয়ে। কত্তোদিন পরে স্যার ফুরফুরে মন নিয়ে একটি গান ধরেছেন, সেটা অল্প একটু আগাতে না আগাতেই ব্যাঘাত ঘটলো। স্যারের ফুরফুরে মেজাজ এই মুহূর্তে তিরিক্ষি ভাব ধারণ করলো। ইচ্ছে করছিলো সামনে থাকা শরবতের খালি গ্লাসটাকে শূন্যে তুলে একটা আছাড় দিতে। যে ত্যাদড় অসময়ে কলিংবেল বাজিয়েছে তাকে যদি এই আছাড়টা দেওয়া যেতো তাহলে বেশ লাগতো। কিন্তু সে উপায় নেই।

কুদরত আলি গামছায় হাত মুছতে মুছতে দৌঁড়ে এসে দরজা খুলে দিলো।
দরজা খোলামাত্রই দু'জন ইয়াং ছেলে-মেয়ে হুঁড়মুড় করে ঘরে ঢুকলো।
কুদরত আলি চেঁচিয়ে বলে উঠলো, 'আরে খাঁড়ান খাঁড়ান। এইভাবে দৌঁড়াইয়া কই যাইতেছেন আপনেরা?'
মেয়েটা বাঁকা চোখে কুদরত আলির দিকে তাকালো। কুদরত আলি মেয়েটার এরকম চাহনিকে কোন পাত্তা দিলো বলে মনে হলো না। সে মনে মনে বললো, 'মোর পেডের মাইয়্যার সমান মাইয়্যা আইসা আমার সামনো ভাব নেয় রে।'
কুদরত আলির নিজের মেয়ে হলে এতোক্ষণে সে তার কানের নিচে দু চারটা চড় লাগিয়ে দিতো। 'বড় গো কিয়ানে মাইন মস্যাদা দিতে হয় এই ঢংগী মাইয়্যা পুলাপাইন শিখে নো।'- কুদরত আলি মনে মনে বিড়বিড় করে বললো।
ছেলেটা বললো, 'আমরা স্যারের সাথে দেখা করতে এসেছি। স্যার বাসায় আছে?'
কুদরত আলি এবার ছেলেটার দিকে তাকালো। বললো, 'জ্বে, আছে।' – এই বলে কুদরত আলি আগে আগে হাঁটা শুরু করলো। তার পেছনে ইয়াং ছেলে-মেয়ে দুজনও হেঁটে ড্রয়িং রুমে চলে এলো।

স্যারের তিরিক্ষি মেজাজের ভাব তখনো পুরোপুরিভাবে কাটেনি। ইতোমধ্যেই তিনি আরো বেশ কয়েকবার গানটার অন্তরা ধরার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু বারবার ব্যর্থ হলেন।
কুদরত আলির পেছনে ওরা দু'জন। স্যার উনার **মোটা কালো ফ্রেমের** চশমার ভেতর দিয়ে ওদের এক পলক দেখে নিলেন। এরপর চশমাটা একটু নড়াচড়া করে ঠিকঠাক করলেন। তারপর বললেন, 'বসো।'
এরা স্যারের পরিচিত। একজনের নাম অনিন্দিতা। অন্যজনের নাম সাকলাইন সাকিব।
সাকিবের হাতে একটি বড় প্যাকেট। তাতে বই জাতীয় মোটা কিছু মোড়ানো। দু'জনে বসলো।
স্যার পত্রিকা খুললেন। পত্রিকার নাম 'প্রথম আলো।' স্যার পত্রিকার বিনোদন পাতা উল্টাচ্ছেন। প্রথম আলোর বিনোদন পাতার মধ্যে বড় বড় হরফে শিরোনাম 'শাওনের সাথে ফারুকীর দ্বন্ধ চরমে। 'ডুব' পাচ্ছেনা সেন্সরবোর্ডের সম্মতি।'
স্যার পড়ছেন আর খুব মজা পাচ্ছেন।

সাকিব একটু গলা খাঁকারি দিলো প্রথমে। এরপর বললো, 'স্যার, আমরা আপনাকে একটা ব্যাপারে জানাতে এসেছি।'

স্যার পত্রিকা থেকে মুখ তুলে বললেন, 'কি ব্যাপার?'
সাকিব তার হাতে থাকা প্যাকেটটি স্যারের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো, 'এই যে, এইটা...'
– 'কি ওটা?'
– 'একটা বই।'
– 'কার বই?'
– 'মাওলানা বশিরুজ্জামান নামের এক লোকের।'
স্যার এবার পত্রিকা থেকে পুরোপুরিভাবে মুখ তুলে সাকিবের দিকে তাকালেন। খুব বিরক্তি উঠে গেছে স্যারের। ইচ্ছে করছে এই ছেলের বাম গালে ঠাস করে একটা চড় মেরে হাতের পাঁচ আঙুল বসিয়ে দিতে। মাওলানা বশিরুজ্জামান নামের একজন মোল্লা শ্রেণীর লোকের বই এই ছেলে আমাকে দিতে এসেছে। কতোবড়ো আস্পর্ধা!
কোনরকমে রাগ সংবরণ করে স্যার বললেন, 'কি করেন এই লোক?'
– 'একটা মাদ্রাসায় ইংরেজি পড়ান।'
এই কথা শুনে স্যারের তো চোখমুখ কপালে উঠার জোগাড়। মাওলানা গোছের কোন লোক ইংরেজি পড়ায়- এটা স্যার বিশ্বাসই করতে পারছিলেন না।
স্যার জিজ্ঞেস করলেন, 'কিরকম বই এটা?'
সাকিব বললো, 'ওরা দাবি করছে এটা নাকি শিশুতোষ বই স্যার।'
– 'হুম। তা কি লিখেছে ভিতরে? গল্প- উপন্যাস?'
– 'না স্যার।'
– 'কি তাহলে?'
– 'ছড়া-কবিতা।'
– 'ও আচ্ছা।'
এরপর স্যার আবার বললেন, 'তা এই শিশুতোষ বই আমার কাছে নিয়ে এলে কেনো? আমি কি শিশু নাকি? আমার তো শিশু ক্যাটাগরির বাচ্চা কাচ্চাও নেই।'
সাকিব নামের ছেলেটা মুখ কাঁচুমাচু করে বললো, স্যার, বইটা যদি একটু খুলে দেখতেন।'
স্যার অবাক হলেন। বিরক্তও হলেন। সকাল সকাল এরকম বিড়ম্বনার কোন মানে হয়? একটা মোল্লা শ্রেণীর লোক একটা ছড়ার বই লিখেছে বাচ্চাদের জন্য। এটা ফুটফাতে, গাড়িতে গাড়িতে বিক্রি হবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এরা দু'জন কেনো সেটা স্যারের কাছে নিয়ে এলো আর দেখার অনুনয় করছে সেটা স্যার বুঝতেই পারছেন না। স্যার অগত্যা বাধ্য হয়েই প্যাকেটটি হাতে নিলেন। হাতে নিয়ে খুললেন। প্যাকেট খোলার পরে স্যারের তো চক্ষু ছানাবড়া। স্যার উনার চশমার কাঁচ শার্টের কোণা দিয়ে একবার পরিষ্কার করে নিলেন। এরপর চশমাটা চোখে দিয়ে আবার দেখতে লাগলেন যে একটু আগে যা দেখেছেন তা ভুল না ঠিক।

নাহ। স্যার ভুল কিছু দেখেন নি। ঠিকই দেখেছেন। বইয়ের উপরে বড় বড় হরফে বইয়ের নাম লেখা। বইয়ের নাম- **'বান্দরের বাচ্চা ডারউইন।'**
নিচে লেখকের নাম- 'মাওলানা বশিরুজ্জামান'।

স্যারের মেজাজ তো আরো কয়েকগুণ গরম হয়ে গেলো এটা দেখে। চোখ মুখ রক্তবর্ণ ধারণ করেছে।
অনিন্দিতা নামের মেয়েটা এতোক্ষণ চুপ করে বসে ছিলো। সে এবার মুখ খুললো। বললো, 'স্যার, এটা দেখানোর জন্যই আপনার কাছে এটি নিয়ে এসেছি। আরো অবাক করা বিষয়, এই বই বইমেলার মতো একটি জাতীয় প্ল্যাটফর্মে বিক্রি হচ্ছে। দেশটা কোথায় চলে গেলো স্যার ভাবতে পারছেন?'

স্যার কিছুই বললেন না। এই বই হাত থেকে ধপাস করে নিচে রেখে দিলেন। বইয়ের নাম দেখে এই বইয়ের ভিতরে কি আছে সেটা উল্টিয়ে দেখার রুচিও স্যারের নেই। কি বিদঘুটে নাম!!
স্যার বললেন, 'শিশুদের ছড়ার বইয়ের নাম কেনো বান্দরের বাচ্চা ডারউইন হবে?'
অনিন্দিতা বললো, 'স্যার, ডারউইনের বিবর্তনবাদ তত্ব তো মোল্লারা স্বীকার করেনা। করবেই বা কিভাবে? এই মোল্লাগুলো কি বিজ্ঞান জানে? না বুঝে? বিবর্তনবাদ তত্বকে ব্যঙ্গ করে এই বইতে বেশকিছু ছড়া আছে স্যার। একটি ছড়ার দুটো লাইন এরকম- 'বাঘ মামা বলে শোন, আয় তোরা গান ধর
মানুষ তো মানুষ আছে, ডারউইন বান্দর।'

অনিন্দিতা নামের এই মেয়েটি দেখি ছড়ার লাইনও মুখস্ত করে ফেলেছে। স্যার বললেন, 'এটা অন্যায়! ঘোর অন্যায়! একজন প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানীর নামকে এভাবে ব্যঙ্গ করাটা কোনভাবেই মেনে নেওয়া যায় না।'
সাকিব হাত চাপড়িয়ে বললো, 'এক্স্যাক্টলি স্যার....'
স্যার আবার বললেন, 'মোল্লা শ্রেণীর কাছে এর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ তোলা হয়নি?'
– 'হয়েছে স্যার।'- অনিন্দিতা বললো।
– 'কি বললো তারা?'
– 'তারা বলতে চাচ্ছে, এই বইতে নাকি কোনভাবেই বিজ্ঞানী ডারউইনকে অসম্মান করা হয়নি। ডারউইনের বিবর্তনবাদ নিয়েও নাকি ব্যঙ্গ করা হয়নি এখানে। স্রেফ শিশুদের মনোরঞ্জন আর বিনোদনের জন্য এরকম ছড়া লিখেছে নাকি। তারা বলতে চাচ্ছে,- ডারউইন নামে কি পৃথিবীতে কেবল একজনই আছে আর ছিলো? আর কারো নাম ডারউইন হতে পারেনা?'
স্যার বললেন, 'এই মোল্লা শ্রেনীর মাথায় তো দেখি গিলু বলতে কিচ্ছু নেই। পৃথিবীতে হাজার হাজার লোক আছে যাদের নাম ডারউইন। কিন্তু কেউ যখন মুখ দিয়ে ডারউইন নামটা উচ্চারণ করে, তখন কি ইংল্যান্ডের একজন ট্যাক্সি চালক, যার নাম ডারউইন, তার কথা মানুষের মনে পড়ে? না।
জার্মানিতে ডারউইন নামের যে লোক হোটেল বয়ের কাজ করে,তার কথা মানুষের মনে পড়ে? না।
এ্যামেরিকায় ডারউইন নামের যে লোক ডাক্তারি করে, তার কথা মনে আসে? না। কানাডায়

ডারউইন নামের যে লোক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করে, তার কথা মনে আসে? না।
তাহলে ডারউইন নামটা শোনার সাথে সাথে কার কথা সর্বপ্রথম মানুষের মনে আসে?
মানুষের মনে সর্বপ্রথম তার কথাই আসে যিনি এই নামে সবচে বেশি প্রসিদ্ধ। সাইন্স শব্দটার নাম শুনেছে এমন কেউ ডারউইনের নাম শুনেনি- এমনটা মেলা ভার।
পৃথিবীতে বিলিয়ন বিলিয়ন বিজ্ঞান জানা,বোঝা, বিজ্ঞানকে সম্মান করা লোকের কাছে ডারউইন একটি শ্রদ্ধার নাম। আবেগের নাম। ভালোবাসার নাম। তাহলে তার নামকে ব্যবহার করে,ব্যঙ্গ করে যখন বই লেখা হয়, তখন সেটা নিশ্চই বিশাল এই বিজ্ঞান মনস্ক শ্রেণীর মনে আঘাত দেওয়া।'

স্যার এক নাগাড়ে একটা ছোটখাটো লেকচার শেষ করলেন। সাকিব নামের ছেলেটা বলে উঠলো, 'স্যার, ওরা দাবি করছে, এতে করে নাকি শিশুরা আনন্দ পাবে?'
স্যার কপালের ভাঁজ দীর্ঘ করে বললেন, 'আনন্দ? একজন সম্মানিত বিজ্ঞানীর নামকে নিয়ে এভাবে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করে শিশুদের আনন্দ দেওয়ার হেতু কি আমরা বুঝি না? এরা আসলে কি চায় জানো? এরা চায় শৈশবকাল থেকেই আমাদের বাচ্চারা বিবর্তনবাদ,বিজ্ঞানী ডারউইন ইত্যাদির ব্যাপারে নেগেটিভ ধারণা নিয়ে বড় হোক। ছড়া পড়ানোর নামে তারা সুকৌশলে আমাদের আগামী প্রজন্মের মনে বিজ্ঞান, বিজ্ঞানীদের বিষয়ে বিষ ঢুকিয়ে দিতে চাচ্ছে যাতে আমাদের নতুন প্রজন্ম বিজ্ঞানমুখী না হতে পারে।'
অনিন্দিতা বললো, 'হ্যাঁ স্যার, একদম তাই। এই মোল্লা শ্রেণীর দূরভিসন্ধি এটাই। এরা যতোই বলুক 'বান্দরের বাচ্চা ডারউইন' নামটা বিজ্ঞানী ডারউইনকে উদ্দেশ্য করে দেওয়া নয়, কিন্তু আমরা তো বুঝি তারা আসলে কি চায়, আর তাদের উদ্দেশ্য কি।'

(উল্লেখ্য, কাহিনীর এখানেই শেষ নয়। কাহিনী এখনো অন-গোয়িং। মাওলানা বশিরুজ্জামানের 'বান্দরের বাচ্চা ডারউইন' নামের শিশুতোষ ছড়ার বই নিয়ে এখনো সোশ্যাল মিডিয়া উত্তাল। দু পক্ষ থেকেই আসছে যুক্তি-পাল্টা যুক্তি।)

‘শয়তানের চার অঙ্গীকার’

শয়তান আল্লাহ তা’লার কাছে চারটি ব্যাপারে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছে।

সূরা আন নিসা’র ১১৯ নাম্বার আয়াতে শয়তানের ৪ টি প্রতিজ্ঞার ব্যাপারে জানা যায়।

অঙ্গীকার নম্বর-০১ “ ”

“And I will surely mislead them…”

[“আমি তাদেরকে অবশ্যই পথভ্রষ্ট করবো”]

শয়তান শপথ নিলো যে, সে আমাদেরকে অবশ্যই পথভ্রষ্ট করবে।

আমরা কীভাবে পথভ্রষ্ট হবো? যখন আমরা দ্বীন ভুলে যাবো, দ্বীন থেকে দূরে সরে যাবো।

চাকচিক্যময় পৃথিবীকেই যখন আমরা আপন করে নিয়ে পরকালের কথা ভুলে যাবো, তখনই আমরা পথভ্রষ্ট হবো।
অঙ্গীকার নম্বর-০২
“and I will surely arouse (sinful) desires in them…”

[“এবং তাদের মধ্যে আমি দুনিয়াবি কামনা বাসনা বাড়িয়ে দেবো”]

দেখুন, আজকে আমাদের ‘Aim in life’ হলো কোটিপতি হওয়া। এই লাখপতি, কোটিপতি হবার জন্যে পৃথিবীতে যা যা করা লাগে তার সবটাই আমরা করি। **ঘুষ খাওয়া, সুদ খাওয়া, মানুষ খুন, চুরি,ডাকাতি সহ এমন কোন নিকৃষ্ট কাজ নেই যা আমরা করতে দ্বিধা বোধ করি না।** কারণ, শয়তান আমাদের মনের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছে যে, যেকোন মূল্যেই হোক, আমাকে লাখপতি হতে হবে। কোটিপতি হতে হবে। আমার কয়েকটা বাড়ি থাকতে হবে, গাড়ি থাকতে হবে। প্রচুর পরিমাণে ব্যাংক-ব্যালেন্স থাকতে হবে। তবেই আমি জীবনে সফল।

শুধু তাই নয়, শয়তান আমাদেরকে ভালোভাবেই বুঝিয়ে দিয়েছে যে, সারারাত বসে বসে নেট ব্রাউজিং করো। পর্ণ দেখো, মদ খাও, গাঁজা খাও, ড্রাগ নাও। পার্টি করো, লিভ টুগেদার করো। মুভি দেখো, গান শোনো। তারকাদের রগরগে শরীর দেখে উত্তেজিত হও। সিগারেট খাও।

This is the life. Enjoy it.

নামাজের চিন্তা? আরে বাবা, সল্যুশান আছে। শুক্রবারে জুমার নামাজে গিয়ে একদম সামনের কাতারে বসবা। ঈমাম সাহেব যখন ফরজ নামাজ শেষ করে হাত তুলে মোনাজাত ধরবে- তখন জোরে জোরে আ-মীন বলা শুরু করবা,ব্যস! গুনাহ মাফ। এরপর আবার শুরু করো.......

অঙ্গীকার নম্বর-০৩

"…. and I will surely order them so they will surely cut off the ears of the cattle…"

["এবং আমি তাদেরকে নির্দেশ দেবো, ফলে তারা জন্তু জানোয়ারদের কান ছেদন করবে "]

এই লাইনটার একটা গূঢ় অর্থ আছে। প্রাক-ইসলামী যুগে প্যাগানরা করতো কী, জন্তু-জানোয়ারদের কান কেটে নিয়ে, তাদের বিদঘুটে করে, এরপর সেই জন্তু জানোয়ারদের পূজা করতো। সেই জন্তু জানোয়ারদের 'স্রষ্টা' হিসেবে প্রচার করতো।

মোদ্দাকথা, ধর্মকে বিকৃতি সাধন করাই ছিলো তাদের কাজ।

শয়তান তাদের উপমা টেনে বলছে, সেও আমাদের দিয়ে এভাবে ধর্মের বিকৃতি সাধন ঘটিয়ে ছাড়বে।

আজকে আমরা 'ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ' এর নামে নতুন ধর্ম, নতুন মতাদর্শের দেখা পাচ্ছি।

আমরাই বলছি- ধর্ম যার যার, উৎসব সবার।

আমরাই পহেলা বৈশাখ, থার্টি ফাস্ট নাইট, লাভ ডে, কিস ডে, হাগ ডে নামের বিজাতীয় সংস্কৃতিতে ধর্মের সাথে সমান্তরাল ভেবে বসেছি। **আমরা বলি, এসব করলে ধর্মের তো কোন ক্ষতি নেই।**

আমি মঙ্গল প্রদীপ জ্বালালাম, হাতি ঘোঁড়া, পেঁচার প্রতিকৃতি মাথায় নিয়ে মিছিল করে মঙ্গল অণ্বেষণ করলাম, আবার নিজেকে মুসলমানও দাবি করলাম। এটাই হচ্ছে শয়তানের অঙ্গীকার..

এখানেই শেষ নয়। দ্বীনের মধ্যে নতুন নতুন তরীকা, নতুন নতুন ইবাদাত, নতুন নতুন ফর্মুলা সংযোজন করে ভাবি,- 'আহ! আমি তো সাচ্চা ঈমানদার আছি।'

এভাবে বিদাতে পরিপূর্ণ আজ আমাদের সমাজ। শয়তান তার অঙ্গীকারে অটল...

অঙ্গীকার নম্বর-০৪

"….. and I will surely order them so they will surely change the creation of Allah."

["এবং, আমি অবশ্যই তাদেরকে নির্দেশ দেবো এবং তারা আল্লাহর সৃষ্টির বিকৃতি ঘটাবে "]

খুবই সত্য প্রতিশ্রুতি। আমরা কী আজ আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে বিকৃতি ঘটাচ্ছি না?

ছেলেরা আজকাল এমনভাবে, এতো লম্বা করে, ঝুঁটি বেঁধে চুল রাখে, দূর থেকে দেখে বোঝার উপায় নেই যে, সে আসলে ছেলে। মনে হয় কোন মেয়ে মানুষ হেঁটে যাচ্ছে।

এরপর, হাতে চুড়ি, বালা, কানে দুল পরা, গায়ে ট্যাটু করা তো আজকালকার মডার্ণ ছেলেদের কাছে ফ্যাশনের অংশ।

মেয়েরা ব্রু প্ল্যাক করে, ছেলেদের জামা কাপড় পরে এমন অবস্থায় বের হয়, দেখে বোঝার উপায় নেই সে ছেলে না মেয়ে...

এছাড়াও, আজকাল অনেক ছেলেরা সার্জারি করে মেয়ে হয়ে যাচ্ছে, অনেক মেয়েরা সার্জারি করে ছেলে হয়ে যাচ্ছে... **এসব নাকী আধুনিকতা!**

নাহ! এসব ধোঁকা! শয়তানের ধোঁকা।
শয়তান তার প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ণে অঙ্গীকারবদ্ধ।

আর, যারাই শয়তানের ফাঁদে পা দিবে, তাদের জন্য বলা হচ্ছে–

"And whoever takes Shaytan as a friend besides Allah, then surely he has suffered a manifest lost."

"আর, আল্লাহকে বাদ দিয়ে যে শয়তানকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে (তাকে অনুসরণ করে), সে অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত....... "

"আমরা শুনলাম, এবং মেনে নিলাম"

আধুনিক যুগ। বিজ্ঞান চলে গেছে অনেক দূরে। সময়ের সাথে সাথে পাল্টাচ্ছে আমাদের সবকিছু। আমাদের বলতে এখানে আমি বেসিক্যালি মুসলিমদেরকেই বোঝানোর চেষ্টা করছি।

বিজ্ঞানের যুগে বসে আমরা এখন সবকিছুতে "বিজ্ঞান" থেকে সমাধান খুঁজি। ধর্মগ্রন্থ থেকে শুরু করে রাসূল (সাঃ) এর হাদীস- সবখানে বিজ্ঞান পেলেই যেন আমরা জয়ী হয়ে যাই।

মাঝে মাঝে অনেকেই আমাকে প্রশ্ন করে,- "আরিফ ভাই, আল্লাহর রাসূল যে মি'রাজে গেছেন, এটাকে বৈজ্ঞানিকভাবে কীভাবে প্রুফ করবো?"

"আরিফ ভাই, বোরাকের মতো কোন জন্তুর পক্ষে কী আলোর চেয়ে বেশি বেগে ছুটা সম্ভব? যদি সম্ভব না হয়, তাহলে রাসূল (সাঃ) বোরাকের পিটে চড়ে কীভাবে মি'রাজে গেলেন? এটার কী বিজ্ঞানভিত্তিক কোন ব্যাখ্যা আপনার কাছে আছে?"

এই প্রশ্নগুলো আমার কাছে যারা করছে, সমস্যাটা তাদের নয়। আদতে, নাস্তিকদের কাছ থেকে তারা এই জাতীয় প্রশ্নাবলী শুনেই হতাশ হয় এবং এসবের একটা রিজনেইবল উত্তর খুঁজে। পেলে হয়তো ভাবে নাস্তিকদের তোঁথা মুখ ভোঁতা করে দেওয়া যাবে। এই জাতীয় প্রশ্ন কিন্তু নাস্তিকরাই যে প্রথম করছে, তা নয়। রাসূল (সাঃ) মি'রাজের সফর শেষ করে আসার পরে যখন এই ঘটনা বলতে লাগলেন, তখন মক্কার মুশরিক, কাফিররাও এটাতে বিশ্বাস করতে পারেনি।

আজ থেকে সাড়ে চৌদ্দ'শ বছর আগেও এরা ভাবতো, – "একটা মানুষের পক্ষে একটা জন্তুর পিঠে চড়ে সাত আসমান পরিভ্রমণ করে আসা কীভাবে সম্ভব? মুহাম্মদ নিশ্চই মিথ্যা বলছে"।

এই মুশরিক, কাফিররা তখন হজরত আবু বকর (রাঃ) এর কাছে গেলো। ব্যাঙ্গভরে বললো,- "শুনছো, তোমাদের নবী দাবি করছে সে নাকি কী এক সাদা জন্তুর পিঠে চড়ে গতরাতে বায়তুল মুকাদ্দিস থেকে ঘুরে এসেছে"।

তাদের কথা শুনে হজরত আবু বকর (রাঃ) বললেন,- **"যদি মুহাম্মদ (সাঃ) এরকম বলে থাকে, তাহলে সেটাই সত্য"।**

হজরত আবু বকর (রাঃ) এর উত্তরটা খেয়াল করুন। তিনিও কিন্তু সাড়ে চৌদ্দ'শ বছর আগের সেইসব লোকদের মতোই, যাদের কাছে একটা জন্তুর পিঠে চড়ে আসমান (বায়তুল হারাম থেকে বায়তুল মুকাদ্দিস) ভ্রমণ করতে পারাটা অসম্ভব। কিন্তু, সেটা যখন মুহাম্মদ সাঃ ঘোষণা করেছেন, তিনি নির্বিঘ্নে সেটাতে বিশ্বাস করলেন। এটার নামই হচ্ছে ঈমান। এই ঈমান যাদের আছে, তাদের ব্যাপারেই আল কোরআনে বলা হয়েছে, এরা হচ্ছে এমন যারা বলে **"আমরা শুনলাম এবং মেনে নিলাম"।**

সাড়ে চৌদ্দ'শ বছরকে আমরা অতিক্রম করে অনেকদূর চলে এসেছি। জ্ঞান-বিজ্ঞান এগিয়েছে অনেকদূর। সাড়ে চৌদ্দ'শ বছর আগে যাদের কাছে আকাশে উড়তে পারাটা 'অসম্ভব' ব্যাপার ছিলো, তারা অতীত হয়ে গেছে। আধুনিক বিজ্ঞান আমাদের দেখিয়েছে, কেবল আকাশে উড়তে পারা নয়, আলোর গতির সাথে দ্রুততায় পাল্লা দেবার ক্ষমতাও মানুষ রাখে। মানুষ এরপর উড়োজাহাজ দেখলো, প্লেন দেখলো, রকেট দেখলো। কতো দ্রুতগামী আকাশযানের সাথেই সে পরিচিত হলো। সে বর্তমানে বসে নেই আর। সে এমন দ্রুত গতির যান তৈরিতে গবেষণাগারে খেটেখুটে হয়রান, যেটা তাকে অগ্রিম "ভবিষ্যৎ" এর দুনিয়ায় পৌঁছে দেবে। অর্থাৎ, যেটাকে এখন "টাইম ট্রাভেল" বলা হয়। এই যানের পিটে চড়ে মানুষ চষে বেড়াচ্ছে মঙ্গল থেকে নেপচুন। প্লুটোর পাশ দিয়ে ঘুরে এসে ক্যামেরায় ধারণ করে আসছে সে গ্রহের পরিবেশ। পাড়ি জমাচ্ছে মহাকাশের এ প্রান্ত থেকে ও'প্রান্ত। মানুষ যে আকাশে উড়তেও পারে, তা সম্ভব করে দেখিয়েছে বিজ্ঞান। আমরা দেখছি আজ ।

কিন্তু তবুও, সেই চৌদ্দ'শ বছর আগের সেই প্রশ্ন কী বন্ধ হয়ে গেছে? নাহ, হয়নি। সে প্রশ্ন এখনো জিইয়ে আছে। **পৃথিবীর শেষদিন পর্যন্তই থাকবে।**

বাহনের পিটে চড়ে আকাশেও যে উড়া যায় এই কনসেপ্ট এখন ক্লিয়ার। তবুও প্রশ্ন,- "ভাই, রাসূলের মি'রাজ গমনের কী কোন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আছে?"

না ভাই। এটার কোন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা নেই। এটা একটা মিরাকল। সুপার ন্যাচারাল জিনিস।

আমি বা আপনি ল্যাবরেটরিতে বসে ক্যালকুলেশান করে রাসূল ঘন্টায় কতো কিলোমিটার পাড়ি দিয়েছিলেন তা বের করতে পারবো না। কোন টেলিস্কোপে চোখ লাগিয়ে দিয়ে "বুরাক্ব" নামের সেই বাহনের অস্তিত্ব নির্ণয় করতে পারবো না। কারণ, এটা হলো একটা সুপার ন্যাচারাল ঘটনা। খাঁটি বাংলায় 'অতি-প্রাকৃত'। এই ঘটনার কোন ন্যাচারাল ব্যাখ্যা হবে না। এটা রাসূলের জীবনে ঘটা অন্য দশ ঘটনার মতোই অহরহ ঘটতো। ঘটেছে কী অহরহ? না, ঘটেনি। ঘটেনি কারণ, এটা মিরাকল।

তাহলে আমাদের করণীয় কী? কোরআনের ভাষায়- "শুনলাম এবং মেনে নিলাম"।

বিজ্ঞানের ব্যাপার যখন এসেছে, তখন আরেকটু আলোচনা করি। বিজ্ঞানের ধর্ম হচ্ছে, ~~বিজ্ঞান সদা পরিবর্তনশীল।~~ বিজ্ঞান প্রতিনিয়ত পরিবর্তন হয় বা হতে পারে। কিন্তু "বিশ্বাস" এর ধর্ম এমন যে, সেটা অপরিবর্তনীয়।

বিজ্ঞান কাজ করে কিছু প্রাপ্ত তথ্য, কিছু ধারণার উপর ভিত্তি করে। বিজ্ঞান দিয়ে এই কারণে ধর্ম বা ধর্ম গ্রন্থকে জাস্টিফাই করতে গেলে বিপদ।

বারো শতাব্দীর শুরুর দিকে, বিজ্ঞানীরা যখন পৃথিবীকে কেন্দ্র বলতো আর সূর্য পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘুরছে বলতো, বা তারও পরে, পনেরো শতাব্দীতে যখন বিজ্ঞানীরা সূর্যকে কেন্দ্র আর স্থির বলতো, বাকিসব সূর্য কেন্দ্রিক ঘোষণা করলো, তখনও কিন্তু কোরআন বলছিলো– 'সূর্য ও চন্দ্র নিজ নিজ কক্ষপথে আবর্তনশীল'। তখনকার সময়ে বসে, আজ থেকে কয়েক শতাব্দী আগে কেউ যদি তখনকার বিজ্ঞান দিয়ে আল কোরআনকে জাস্টিফাই করতো এবং বিজ্ঞানের ফলাফলকে 'ফাইনাল' ধরে নিতো, তাহলে কী হতো?

এটাই হচ্ছে বিজ্ঞান এবং বিশ্বাসের মধ্যকার বেসিক ডিফারেন্স। বিজ্ঞানের এখনো অনেকদূর যাওয়ার বাকী আছে। ২০১১ সালে 'ডার্ক ম্যাটার এবং কসমিক একসিলারেশান' লোকেইট করতে পারার জন্য পদার্থবিজ্ঞানে একদল বিজ্ঞানীদের নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। সেই বিজ্ঞানীদলের একজনের ইন্টার্ভিউতে পড়েছিলাম, তিনি দাবি করেছেন, – এই মহাবিশ্ব নিয়ে বিজ্ঞানীদের জ্ঞান এখনো মাত্র **8%**। অর্থাৎ, আজকের সময়ে বসেও, বিজ্ঞান এখনো পুরো মহাবিশ্বের মাত্র ৪% জানে, বাকি ৯৬% এখনো অজানা। এই হচ্ছে এখন পর্যন্ত বিজ্ঞানের অগ্রগতি।

এই বিজ্ঞান জ্বীনে বিশ্বাস করেনা বা করতে চায় না, কিন্তু 'এলিয়েন' খোঁজার জন্য প্রতিবছর কোটি কোটি ডলার খরচ করে।

যাহোক, বিজ্ঞান যতো আগাবে, আমরাও ততো আগাবো। কিন্তু মনে রাখতে হবে, বিজ্ঞান যেন আমাদের বিশ্বাসের মাপকাঠি না হয়।

শেষ করার আগে বিজ্ঞানের আরেকটি টুইস্ট দিয়ে শেষ করি। রাসূল সাঃ এর একটি হাদীস আছে 'বদনজর' বা 'কু-নজর' নিয়ে। আবুদাঊদ শরীফে এটার উল্লেখ পাওয়া যায়। ইংরেজিতে বলা হয় 'Evil Eye"…

রাসূল সাঃ বলেছিলেন,- 'বদনজর সত্য'।

যেহেতু রাসূল সাঃ বলেছেন তাই এটাতে আমরা বিশ্বাস করি। বিজ্ঞান এটাকে কীভাবে, কোন পারস্পেকটিভ থেকে দেখে সেটা আমাদের বিবেচ্য নয়।

পশ্চিমা দেশেও এই 'বদ নজর' বা 'Evil Eye' কে স্রেফ কুসংস্কার ভাবা হতো। আমাদের কিছু মডারেট মুসলিমরাও এটাকে কুসংস্কার মনে করে।

কিন্তু মজার ব্যাপার, ২০১০ সালে Collins A. Ross নামের এক রিসার্চার এই 'Evil Eye' বা বদ নজরের উপর গবেষণা চালিয়ে দেখেছেন, এই বদ নজর কোন কুসংস্কার নয়। এটার সাইন্টিফিক ব্যাখ্যা আছে। তিনি "Electrophysiological basis for the Evil Eye belief" শিরোনামের একটি গবেষণা পত্রও তৈরি করেন উনার রিসার্চের উপর। উনার সেই পেপার পাবলিশড হয় "Anthropology Of Consciousness" নামক জার্নালে। ভদ্রলোক এটার উপর ব্যাপক কথাবার্তা , তথ্য প্রমাণ দাখিলের চেষ্টা করেছেন।

এটা নিয়ে পশ্চিমা বিজ্ঞান দুনিয়ায় এখন রিসার্চ হচ্ছে। রিসার্চ হোক।

কিন্তু, আমাদের কথা হলো, ভদ্রলোক এই রিসার্চ না করলে কী আমরা রাসূলের হাদীসে বিশ্বাস করতাম না? অবশ্যই করতাম। উনার রিসার্চ ভুল হলে কী আমরা রাসূলের কথাকে অস্বীকার করবো? নাহ, করবো না। কারণ, – "আমরা শুনলাম, এবং মেনে নিলাম"।

'কাশেন বিন আবু বাকার এবং সেক্যুলার ব্যামো'

কাসেম বিন আবু বাকারকে নিয়ে আমাদের সেক্যুলার সমাজ এবং ইসলামপন্থী সমাজের মধ্যে ব্যাপক তর্ক বিতর্ক চলছে।
সেক্যুলার সমাজের দাবি, কাসেম সাহেব কোন লেখকের ক্যাটাগরিতেই পড়েন না। উনার লেখা অত্যন্ত নিম্নমানের, সস্তা। মোদ্দাকথা, আমাদের বাঙাল সেক্যুলার সমাজ সাহিত্য বলতে যা বুঝে থাকেন বা বুঝিয়ে থাকেন, সেটার প্যারামিটারে কাসেম সাহেব কোন ক্লাশেই পড়েন না।

কাসেম সাহেবের প্রথম বই 'ফুটন্ত গোলাপ' আমি পড়েছিলাম। এই বই আমি যখন পড়ি, তখন সাহিত্যের রস কষ এবং ইসলামের হাল-হাকীকত বুঝবার মতোন বয়স আমার হয়নি।
যেহেতু কিশোর বয়সেই এই বই আমি পড়েছিলাম, সেই হিশেবে বলতে পারি- উনার বইটি আমার কাছে যথেষ্টই ভালো লেগেছিলো।
এই যে এই 'কিশোর' শ্রেণী, কিংবা, খুব বেশি 'সাহিত্য না বোঝা' শ্রেণী, তাদের কাছে কিন্তু এই কাশেম সাহেব খুবই উঁচু শ্রেণীর লেখক। এরা কাসেম সাহেবের বই পড়ে মজা পায়। নিজেদেরকে কাসেম সাহেবের উপন্যাসের নায়ক ভাবতে পছন্দ করে।
এই শ্রেণীর ভালোলাগা, পছন্দকে নিমিষেই উড়িয়ে দেওয়ার কোন লিগ্যাল রাইট আমাদের সেক্যুলার সমাজের নেই।
তাছাড়া, আমাদের সেক্যুলার সমাজের কাসেম সাহেবের ব্যাপারে আসল ব্যামোটা হলো এই- কাসেম সাহেবের উপন্যাসে **নায়িকারা বোরকা পরতো, নায়কের মুখে দাঁড়ি, গায়ে পাঞ্জাবি এবং কথায় কথায় 'আসসালামু আলাইকুম' বলে সম্বোধন করতো।** কাসেম সাহেব আল্লাহকে 'আল্লাহ'-ই লিখতেন, স্রষ্টা/ইশ্বর/ভগবান লিখতেন না। **উনার নায়ক নায়িকারা নামাজ পড়তো**। উনার **উপন্যাসে আজানের কথা ছিলো, নামাজের কথা ছিলো।**
কিন্তু, আমাদের সেক্যুলার সমাজের সাহিত্যের মানদন্ডে আল্লাহকে ভগবান অথবা স্রষ্টা বলতে হবে, আর পারতপক্ষে ধর্মকর্ম (বিশেষ করে ইসলামী কালচার) এড়িয়ে চলতে পারাটাই সাহিত্যিক হবার বিশেষ গুণাবলী বলে বিবেচিত।
তাই, আমাদের সেক্যুলার সমাজের সাহিত্যে নামাজ, টুপি, দাঁড়ি, রোজা, ঈদ সহ ইসলামী কালচারগুলো বরাবরই উপেক্ষিত।
এদেশের ৯০ ভাগেরও বেশি মানুষের ধর্ম হলো ইসলাম। ধর্মপ্রাণ এই সমাজ নামাজ পড়ুক আর না পড়ুক, ইসলামকে ডীপলি বুঝুক বা না বুঝুক, তারা যখন কোথাও, কোন রচনায় ধর্মের চিহ্ন দেখে, ধর্মীয় লেবাসের ব্যবহার দেখে, তখন তারা সেটা লুপে নেয়। সেটা কাসেম হোক কিংবা হুমায়ুন আহমেদ।
কিন্তু, আমাদের সেক্যুলার সমাজ যে সময়ে বসে শিল্প সাহিত্যের মাধ্যমে ধর্ম, বিশেষত ইসলামকে একহাত নিচ্ছিলো, ঠিক সে সময়টাতে কাসেম সাহেব এসে স্রোতের বিপরীতে ইসলামী

লেবাসের বর্ণনায় লেখা শুরু করলেন উপন্যাস।
এদেশের বিশাল ধর্মপ্রাণ শ্রেণী, যাদের মনস্তত্ত্ব বুঝতে না চেয়ে সেক্যুলাররা উল্টো সেই শ্রেণীর বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করেছিলেন, কাসেম সাহেব সেই বিশাল শ্রেণীর মনস্তত্ত্ব ঠিকই বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তিনি এই বিশাল শ্রেণীটার মার্কেট পেয়েছিলেন। তাদের কাছে একজন রবীন্দ্রনাথ হয়ে উঠেছিলেন এই কাসেম সাহেব।
হ্যাঁ, তিনি খুবই সস্তা লিখেন। তার লেখার হাত খুবই দূর্বল। বর্ণনায় ভাব গভীরতা নেই। তার সাহিত্যমান প্রশ্নবিদ্ধ। কিন্তু, এদেশের যে বিশাল শ্রেণীটা, যারা বঙ্কিমের দূর্গেশনন্দিনী, কপালকুন্ডলা, শরৎের মেঝদিদি, শ্রীকান্ত, রবীন্দ্রনাথের গোরা, ঘরে বাইরে, গীতাঞ্জলী পড়ে কিচ্ছু বুঝেনা, তারা যদি কাসেম সাহেবের 'ফুটন্ত গোলাপ' পড়ে মজা পায়, আনন্দ পায়, এতে করে যদি কাসেম সাহেবের বই সেক্যুলার লেখকদের চাইতে বেশি বিক্রি হয়, তাতে সেক্যুলারদের জ্বলন পীড়নের কোন কারণ দেখছি না।
শিল্প – সাহিত্য হলো একটি সমাজের প্রতিচ্ছবি। একটি সমাজের আয়না। সেই সমাজের গণ মানুষের আশা, আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখ, ভালো লাগা, মন্দ লাগা, পছন্দ-অপছন্দ নিয়েই গড়ে উঠে সেই সমাজের শিল্পকলা, সাহিত্য। কিন্তু, আমাদের সেক্যুলার সমাজ যখন গণ মানুষের আশা, আকাঙ্ক্ষা, পছন্দ-অপছন্দের থোড়াই কেয়ার করে, নিজেদের কথা বার্তায়, শিল্প রচনায় মানুষের স্পর্শকাতর ব্যাপারগুলো নিয়ে মজা, ঠাট্টা, মশকারি করা শুরু করলো, তখন কাসেম সাহেবরাই গণ মানুষের 'নায়ক' হয়ে উঠবে, সেটাই স্বাভাবিক। তাদের কাছে 'গীতাঞ্জলি'র চেয়ে 'ফুটন্ত গোলাপ' বেশি সমাদৃত হওয়াটা আশ্চর্যের কিছু নয়।
কাসেম সাহেবরা সেক্যুলার সাহিত্যিকদের সাথে উঁচু তলায় বসে কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে নারীদের শরীরের রগরগা বর্ণনা না দিতে পারুক, সমাজের বিশাল একটা শ্রেণীর কাছে উনি উনার বই পৌঁছে দিতে পেরেছেন- এটাই উনার সফলতা।
কিন্তু, সেক্যুলারদের কাছে যখন দেশের এই বিশাল অংশটি উপেক্ষিত, তখন তাদের হয়ে কেউ যদি কলম ধরে সফলতা পায়, তাতে সেক্যুলার শ্রেণীর গা জ্বলার বিশেষ কোন কারণ দেখি না।
আপনারাও যদি কাসেম সাহেবের মতো সফলতা চান, নিজেদের বই বিক্রি বাট্টা না হওয়ায় হাপিত্যেশ করেন, ডিপ্রেশানে ভুগেন- তাহলে আপনারও কাসেম সাহেবদের মতো এই বিশাল অংশটির মনস্তত্ত্ব বুঝার চেষ্টা করুন। আপনাদের অসাধারণ সাহিত্যিক মেধা, শব্দের অলঙ্কারে ফুটিয়ে তুলুন এই শ্রেণীর পছন্দ-অপছন্দ। তা যদি করতে না পারেন, অন্তত বিশাল এই শ্রেণীর স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে ঠাট্টা মশকারি বন্ধ করুন। তাহলে আর নিজেদের বই বিক্রি বাট্টা নিয়ে হাপিত্যেশ করা লাগবে না। ডিপ্রেশানের ঝাল কাসেম সাহেবদের উপরে ঝাড়া লাগবে না। কাসেম সাহেব যা লিখেছেন বা লিখে বুঝাতে চেয়েছেন, তার সাথে আসলে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই। কাসেম সাহেবের নায়িকারা বোরকা পরে, আবার চোখে কাজল লাগিয়ে পার্কে দাঁড়িওয়ালা প্রেমিকের সাথে দেখাও করে। চুমুও খায়।
ইসলামিক পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে কাসেম সাহেব পরিত্যাজ্য। উনাকে কোনভাবেই ইসলামী ঘরানার লেখক বলা যায় না। নায়িকার গায়ে বোরকা লাগালেই, কিংবা নায়কের মুখে দাঁড়ি

তুলে দিলেই তা ইসলামিক হয়ে যায় না।

বিবাহ বহিঃভূত প্রেম ভালোবাসা, মেলামেশা ইত্যাদি ইসলামে নিষেধ। কাসেম সাহেব যেহেতু উনার লেখাতে এই কাজটিই ফুটিয়ে তুলেছেন, তাই এই পয়েন্ট থেকেই আমি কাসেম সাহেবকে অপছন্দ করি। উনার লেখা পড়ি না, বা আর পড়ার দরকারও মনে করি না।

কিন্তু, এই জায়গায় আমাদের দেশের ইসলামপন্থী আলেম সমাজ নিয়ে আমার খানিকটা আপত্তি আছে বৈকি। সেটা হলো, ঠিক যে সময়টায় সেক্যুলার গোষ্ঠী সাহিত্য, সিনেমা দিয়ে ইসলাম, মুসলিম, দাঁড়ি, টুপিকে একহাত নিয়ে ছাড়ছিলো, তখন আমাদের আলেম সমাজের উচিত ছিলো সেক্যুলারদের বিরুদ্ধে সুস্থ ধারার শিল্প সাহিত্য নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার। কিন্তু তখনও আমাদের আলেম সমাজ হানাফি-সালাফি, আমীন জোরে না আস্তে, হাত বুকে না নাভির নিচে- এইসব নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। সেক্যুলাররা যখন ধীরে ধীরে আমাদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকিয়ে দিচ্ছলো ঘৃণা আর ধর্মবিদ্বেষীতার বীজ, তখনও আমাদের আলেম সমাজ সূরা ফাতিহার পরে দোয়াল্লিন না জ্বোয়াল্লিন এই তর্কালাপে ব্যস্ত। কোন কাউন্টার তারা সেক্যুলারদের বিরুদ্ধে দেয় নি। এমন সময়ে কাসেম সাহেব যখন স্রোতের বিপরীতে দাঁড়িয়ে লেখার মধ্যে ইসলামী লেবাস, ইসলামী কালচারকে ফোকাস করতে লাগলেন, তখন আমাদের আলেম সমাজের উচিত ছিলো কাসেম সাহেবের সাথে কথা বলা। তাঁকে নাসীহাহ দেওয়া। আলেম সমাজের উচিত ছিলো উনাকে বলা,- 'কাসেম সাহেব, লেখার মধ্যে আপনি ইসলামী লেবাসকে, কালচারকে যেভাবে তুলে ধরেন, তা অবশ্যই প্রশংসার দাবিদার। কিন্তু, আপনার সাথে সেক্যুলার নাস্তিক্যবাদী সাহিত্যকদের বেসিক কোন ডিফারেন্স নেই। তারা ইসলাম বিদ্বেষীতার আড়ালে যৌনতার, নারী পুরুষের অবৈধ, অবাধ মেলামেশাকে প্রমোট করে, আর আপনিও পর্দার ভেতরে, ইসলামী লেবাস পরিয়ে একই জিনিসকে প্রমোট করেন। দূর্ভাগ্যের ব্যাপার হলো, তাদের লেখা পড়ে যেকেউ তাদের এসব কাজকে, শিল্প-সাহিত্যকে ইসলাম বিরোধী, ইসলাম বিদ্বেষী বলে চিহ্নিত করতে পারলেও, অনেকে আপনার কাজটাকেই 'ইসলাম' ভেবে ভুল পথে পরিচালিত হবে। তাই আপনি যদি পর্দার ভিতরে থেকে অবাধ মেলামেশা, প্রেমিক-প্রেমিকার অবাধ প্রেম জাতীয় ব্যাপার স্যাপারগুলো বাদ দিয়ে সুস্থ ধারার ইসলামিক ব্যাপারগুলোতে ফোকাস করেন, তাহলে আপনার সাহিত্য পড়ে মুসলিমরা উপকৃত হতো।'

আমেল সমাজ উনাকে নাসীহাহ দিয়ে থাকলে এবং উনি উপেক্ষা করলে অবশ্য ভিন্ন কথা।

সেক্যুলারপন্থীদের কেউ যখন মাথাচাড়া দিয়ে উঠে, অন্য সেক্যুলারগণ তাকে উপর থেকে টেনে আসমানে তুলে নেয়। আর, ইসলামপন্থীদের মধ্যে কেউ মাথাচাড়া দিয়ে উঠলে, আমরা তাকে গাইড করা, নাসীহাহ, পরামর্শ দেওয়া তো দূরে থাক, তাকে টেনে হিঁচড়ে নামিয়ে ফেলি। তাই শিল্প সাহিত্যের ফিল্ডে সেক্যুলাররা আমাদের মাথার উপরে লবণ রেখে বড়ই খাওয়ার সুযোগ পেয়ে যায়।

‘নাস্তিকদের ‘তেঁতুল তত্ত্বে’র একটি বৈজ্ঞানিক পোস্টমর্টেম!’

বাংলা নাস্তিক পাঁড়ায় আল্লামা শফীকে ‘তেঁতুল হুজুর’ বলে ডাকা হয়। ‘তেঁতুল হুজুর’ ডাকটা তাদের মাঝে এতোই জনপ্রিয়তা পেয়েছে যে, এটা নিয়ে রীতিমত দাঁড়ি-টুপি ওয়ালা কার্টুন করেও তারা আল্লামা শফী হুজুরকে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করে থাকে।
এর কারণ হচ্ছে, কোন এককালে শফী হুজুর মেয়েদেরকে ‘তেঁতুল’ এর সাথে তুলনা করেছিলেন।
তেঁতুল দেখলেই যেমন মানুষের জিভে জল চলে আসে, তেমনি মেয়ে মানুষ দেখলে পুরুষদের মধ্যেও এরকম একটা ফিলিংস তৈরি হয়।
শফী হুজুরের কথাটা যতোটা না স্ট্রেইট ফরোয়ার্ড, তারচেয়ে বেশি মেটাফোরিক্যাল (রূপক)। মানুষ স্বভাবতই বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষিত। এই চরম সত্য কথাটি অকপটে স্বীকার করায় শফী হুজুরকে বাংলা নাস্তিক সমাজ রীতিমত হাসাহাসির বস্তুতে পরিণত করেছে।

সে যাকগে!! শফী হুজুরের গাঁয়ে তেঁতুল তত্ত্বের তকমা আপাতত থাক।
চলেন আমরা এবার একটু ‘বিজ্ঞান’ করে আসি।
বাংলা নাস্তিক সম্প্রদায়, যাদের বেশিরভাগই ইন্টার লেভেল এবং কলা অনুষদে পড়া, যারা আবার কথায় কথায় আমাদের ‘বিজ্ঞান’ শেখাতে প্রস্তুত হয়ে থাকে, তারা সবসময় একটি টার্ম খুব ইউজ করে। সেটি হলো- পিয়ার রিভিউড জার্নাল।
বিজ্ঞানের কোন বিষয় কোন পিয়ার রিভিউ জার্নালে প্রকাশ হওয়া মানেই বাংলা নাস্তিকদের কাছে তা ইশ্বরের বাণীর মতোই ধ্রুব সত্যের মতো। যখন কেউ তাদের কাছে এসে কিছু জিজ্ঞেস করে, তারা বলে, – ‘পিয়ার রিভিউ জার্নাল থেকে প্রমাণ দেন।’

আমেরিকার University Of Chicago তে একটি রিসার্চ চলে। এই রিসার্চ প্রকাশিত হয় বৈজ্ঞানিক জার্নাল ‘Evolution & Human Behavior’ এ। টপিক ছিলো- ‘Behavioral and hormonal responses of men to brief interactions with women’
এই স্ট্যাডি চালিয়েছিলেন James R. Roney, Stephen V. Mahler, Dario Maestripieri।

এই স্ট্যাডিতে পুরুষ এবং মহিলাদের উপর একটি সমীক্ষা চালানো হয়। সরেজমিনে এই সমীক্ষা চালাতে গিয়ে উঠে এসেছে দারুন কিছু তথ্য।
(এই স্ট্যাডি কীভাবে, কতোজনের উপরে চালানো হয়েছিলো তা বিস্তারিত ব্যাখার দাবি রাখে। আমি নিচে লিঙ্ক দিয়ে দিলাম। আগ্রহীরা পড়ে নিবেন)।

স্ট্যাডি বলছে, পুরুষরা (সমীক্ষাটা চলেছিলো বেসিক্যালি ১৮-৩৬ বৎসর বয়সীদের মধ্যে) যখন মহিলাদের নিকটে থাকে, সংস্পর্শে আসে, তখন পুরুষদের মধ্যে Hormonal Response টা তীব্র হয়ে উঠে।
তারা ব্যাপারটার কনক্লুশান দিতে গিয়ে লিখেছে –
‘ This study represents one of the first attempts to assess hormonal and behavioral reactions of men to brief interactions with women. Results were generally consistent with the possibility of a mating response in human males. Men in the female condition showed a significant increase in testosterone over baseline levels and were rated as having expressed more polite interest and display behaviors than were men in the male condition. In addition, those men who were rated as having directed more courtship-like behaviors toward their female conversation partners also showed more positive changes in T levels and rated the female confederates as more attractive romantic partners. No such relationships were significant in the male condition.’

অর্থাৎ, পুরুষদের মহিলাদের প্রতি যে testosterone (testosterone হচ্ছে পুরুষদের সেক্স হরমোন) আপিল আছে, তা স্ট্যাডি কন্ডিশনে খুবই ফলপ্রসূ এবং পজিটিভ হিসেবে দেখা গেছে।

এই স্ট্যাডি বা রিসার্চ যারা করেছে তারা কিন্তু সবাই বিবর্তনবাদী। তারা দেখিয়েছে, মহিলাদের প্রতি পুরুষদের একটা আপিল থাকে। আপিলটা hormonal. আলাদাভাবে testosterone বা পুরুষদের সেক্স হরমোনাল।

শুধু তাই নয়, ব্রিটিশ পত্রিকা ডেইলি মেইল বিজ্ঞানীদের রেফারেন্স দিয়ে শিরোনাম করেছে
‘Pretty women make a man’s mouth water’
হাহাহা। অর্থাৎ, সুন্দরী মহিলা পুরুষের মুখে লালা ঝরায়।

সুতরাং, তাদের গবেষণা মতে , নারীরা পুরুষদের কাছে খুবই লোভনীয়। এই স্ট্যাডি এত্তো এত্তো গবেষণা করে যা বুঝায়, শফী হুজুরের ‘তেঁতুল তত্ব’ ও কিন্তু ঠিক একই জিনিসই বুঝায়। সুতরাং, যে সকল বাংলা নাস্তিক শফী হুজুরকে ‘তেঁতুল হুজুর’ বলে গালি দেন, ব্যঙ্গ করেন, তারা University Of Chicago’ এর এই স্টাডি, এর প্রাপ্ত ফলাফল, এবং Elsevier এ তা প্রকাশ হওয়াকে ঠিক কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন জানতে পারি?

বিঃ দ্রঃ (এখন থেকে কেউ যদি শফী হুজুরকে ‘তেঁতুল হুজুর’ বলে ব্যঙ্গ করে, তারে জার্নালের এই লিঙ্কটা ধরাই দিবেন যদি সে আংরেজি (ব্যঙ্গার্থে) পড়তে পারে)

তথ্য-https://labs.psych.ucsb.edu/roney/james/other%20pdf%20readings/reserve%20readings/ehb.pdf

‘যে চার কারণে নাস্তিকদের উচিত পহেলা বৈশাখ বর্জন করা...’

বাংলা নাস্তিকদের উচিত সম্মিলিতভাবে ‘পহেলা বৈশাখ’ নামের এই অপ-সংস্কৃতির বিরোধিতা করা।

প্রথমত, পহেলা বৈশাখের এই ধারণার প্রবর্তন হয় মোঘল সম্রাট আকবরের হাত ধরে। তার নির্দেশে ৯৯৮ হিজরী মোতাবেক ১৫৮৪ খ্রিস্টাব্দে বাংলা সনের প্রবর্তন হয়।
যেহেতু এই ধারণার সূত্রপাত একজন মুসলমানের হাতে এবং আরবি সন (হিজরী) অনুসরণে যেহেতু এর উদ্ভব, তাই এটার বিরোধিতা করা নাস্তিকদের জন্য একরকম ফরজ কাজ বলা যায়।
(উল্লেখ্য, আকবরের উদ্ভাবিত ‘দ্বীন-ই-ইলাহী’ এখানে আপাতত আলোচ্য নয়)

দ্বিতীয়ত, বাংলা নাস্তিকরা নিজেদের সবসময় মুক্তচিন্তক, বিজ্ঞানমনস্ক এবং আধুনিক চিন্তা ভাবনা সম্পন্ন বলে দাবি করে। তারা দাবি করে যে, তারা কোন কুসংস্কার, কু-প্রথায় বিশ্বাস করে না।
তাদের কথা হলো, চাষা থেকে জেলে, কামার থেকে নাপিত, চারুকলার ছাত্র থেকে প্রাইমারী স্কুলের পিয়ন সবাইকেই সাইন্স ল্যাবে বসে মাইক্রোস্কোপে চোখ ডুবিয়ে দিয়ে স্রষ্টার আয়তন এবং হাবলের টেলিস্কোপে স্রষ্টার অস্তিত্ব নির্ণয় করতে জানতে হবে। যদি ল্যাবের মাইক্রোস্কোপে স্রষ্টাকে লেজ নাড়তে এবং টেলিস্কোপে চোখ টিপতে না দেখা যায়, তাহলে ধরে নিতে হবে যে স্রষ্টা বলে আদৌ কেউ নেই।
কিন্তু, বাংলা নববর্ষের ইতিহাস ঘেঁটে দেখা যায়, এই ইতিহাসের সাথে জড়িয়ে আছে কিছু ‘বিশ্বাস’ এবং ‘ভক্তি’।
বাংলা নববর্ষ উদযাপনের ইতিহাস থেকে জানতে পারা যায় যে, মানুষ নতুন বছরকে নতুন আশা, নতুন উদ্যম নিয়ে বরণ করে নিতো।
চাষীরা মনে করতো, নতুন বছরকে বরণ করে নিলে তারা নতুন বছরে আগের বছরের তুলনায় দ্বিগুণ ফসল পাবে।
যেহেতু নাস্তিকরা এরকম বিশ্বাসের থোড়াই কেয়ার করে, তাই এরকম বিশ্বাস, ভক্তিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠা ‘বর্ষবরণ’ অনুষ্ঠানের বিরোধিতা করা বাংলা নাস্তিকদের নৈতিক দায়িত্বের মধ্যে পড়ে।

তৃতীয়ত, বর্ষবরণ অনুষ্ঠানের সাথে 'মঙ্গল-অমঙ্গল' জাতীয় কিছু ব্যাপার-স্যাপার জড়িয়ে আছে।

নিকট অতীতে অর্থাৎ আশির দশকে ঢাবির চারুকলা ইন্সটিটিউটের ছাত্ররা বাংলা সনের নতুন দিনটাকে একটু ভিন্নভাবে বরণ করে নেয়। তখন যেহেতু দেশে স্বৈরাচার এরশাদের সময়কাল চলছিলো, তারা স্বৈরাচারের পতন এবং যাবতীয় অমঙ্গলের হাত থেকে মুক্ত হবার প্রত্যয়ে বর্ষবরণের দিন একটি মিছিল বের করে। এই মিছিলের নাম দেওয়া হয় 'মঙ্গল শোভাযাত্রা'। এই মিছিলে অমঙ্গলের বিরুদ্ধ প্রতীক হিসেবে কিছু পশু , পাখি এবং দানব টাইপ জানোয়ারের মুখোশ, ফেস্টুন এবং প্রতিকৃতি ব্যবহার করা হয়। এগুলোকে তারা মঙ্গলের প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করে। তখন থেকে প্রতিবছর নববর্ষের দিন মঙ্গল শোভাযাত্রায় এই পশু,পাখি, দানব,জানোয়ারের প্রতিকৃতি নিয়ে হাজার হাজার মানুষ মিছিল করে।

তারা বিশ্বাস করে, এতে করে সমস্ত অশুভ, অমঙ্গল নিপাত যাবে।

এরকম দানব মানবের প্রতিকৃতি নিয়ে মঙ্গল শোভাযাত্রা করলে, মঙ্গল প্রদীপ জ্বালালে অমঙ্গল দূর হয়ে মঙ্গল আসে কী আসে না সেটা পরের ব্যাপার,

তবে, বাংলা নাস্তিকরা যেহেতু মঙ্গল-অমঙ্গল জাতীয় শব্দাবলী শুনলেই নাক সিটকানো শুরু করে, এবং 'থার্ড পারসন' কেউ যে আদৌ মঙ্গল-অমঙ্গল ঘটাতে পারে- এরকম কিছুতে যখন তারা বিশ্বাসই রাখে না, তাই 'মঙ্গল শোভাযাত্রা' নামের এরকম বিদঘুটে, অবৈজ্ঞানিক, মধ্যযুগীয় ধ্যান ধারনার বিরোধিতা করাও বাংলা নাস্তিকদের নৈতিক দায়িত্বের মধ্যে পড়ে যায়।

চতুর্থত, মুসলমানদের কোরবানি ঈদ আসলেই নাস্তিকদের 'মানবিকতা' নামক সপ্তম ইন্দ্রিয়টার বাম্পার ফলন দেখা যায়। কোরবানির ঈদে গরু জবাইকে তারা বিজ্ঞান, মানবিকতা দিয়ে একেবারে ধুঁয়ে দেবার চেষ্টা করে।

তাদের যখন প্রশ্ন করা হয়, 'সারাবছরই তো ব্যাপকহারে গরু জবাই হয়। তখন তো আপনাদের মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া দেখা যায় না। কোরবানির ঈদ আসলেই কেনো আপনাদের মধ্যে এত্তো পশুপ্রেম জেগে উঠে?'

তারা তখন বসুন্ধরা টিস্যু দিয়ে চোখের কোণা মুছতে মুছতে বলে, 'সারাবছর জবাই করা এক ব্যাপার, কোরবানির ঈদে জবাই করা অন্য ব্যাপার। ধর্মীয় উৎসবের নামে এরকম পশু জবাই করার কোন মানে হয় না। মানবিকতা বলে একটা ব্যাপার আছে। পশুর প্রাণ বলে কি ওটা প্রাণ নয়?'

যাহোক, ধর্মীয় উৎসবের নাম করে গরু জবাই করা যদি নৃশংসতা হয়, অমানবিকতা হয়, তাহলে একইভাবে বর্ষবরণ অনুষ্ঠানের নাম করে **ইলিশ মাছ নিধন করাটাও নৃশংসতা এবং অমানবিকতা।**

গরু এবং ইলিশের মধ্যে বেসিক ডিফারেন্স নেই। একটা সাইজে বড়, অন্যটা ছোট। একটা স্থলচর, অন্যটা জলচর- এইটুকুই।

তবে, নাস্তিকরা যেহেতু কথায় কথায় সাম্যের কথা বলে, তাই গরু আর ইলিশের সাইজ এখানে ফ্যাক্ট না। ফ্যাক্ট হচ্ছে- দুইটারই প্রাণ আছে।

তাই, বাংলা নাস্তিকদের উচিত বর্ষবরণের নাম করে এরকম ব্যাপকহারে ইলিশ নিধন, তা নিয়ে উৎসব,হৈ-হুল্লোড় ইত্যাদির চরম বিরোধিতা করা।

উপরে উল্লিখিত পয়েন্টগুলো বিবেচনায় নিয়ে বাংলা নাস্তিকদের উচিত 'বর্ষবরণ' নামের এই অপ সংস্কৃতির বিরোধিতায় এগিয়ে আসা, জনমত গড়ে তোলা। কিন্তু আজ অবধি কোন নাস্তিককেই এটার বিরুদ্ধে 'টু' শব্দটিও করতে দেখা যায় নি।
কারণ, এই অপ সংস্কৃতি যতোই আনকালচারড, যতোই অবৈজ্ঞানিক এবং তাদের আইডিওলোজির বিরুদ্ধে হোক না কেনো, এটা যেহেতু ইসলামের বেসিক কনসেপ্টের সাথে সাংঘর্ষিক,তাই এটার বিরোধিতা করা দূরে থাক, এটাকে ফলাও করে যতো বেশি প্রচার-প্রসার করা যায়, বাংলা নাস্তিকদের ততোই লাভ।
ইতোপূর্বে যদিও তাদের 'বর্ষবরণ' নামের এই অপ-সংস্কৃতির বিরুদ্ধে কথা বলতে দেখা যায় নি, তবুও, আমি যেহেতু খুব আশাবাদী মানুষ, আমি আশা করছি, এ বছর থেকে বাংলা নাস্তিক সম্প্রদায় বর্ষবরণ অনুষ্ঠানের বিরোধিতা করে আমাকে ভুল প্রমাণ করবে।

‘নাস্তিকদের অসততা- একটি তাত্বিক বিশ্লেষণ’ পর্ব-১

জাকির নায়েক আর কিছু করতে পারুক বা না পারুক, ওয়ার্ল্ডওয়াইড নাস্তিকদের ‘মাথাব্যথা’র কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন নিশ্চিত।

বাংলা নাস্তিকরা কোন মুসলিমকে কটাক্ষ করার আগে তাকে সরাসরি ‘জাকির নায়েকের চ্যালা’ ‘জাকির নায়েকের মুরিদ’ বলে থাকে।
জাকির নায়েকের নামকে বিকৃত করে তাকে ‘জোকার নায়েক’, এবং তার ছবিকে বিকৃত করে অসংখ্য কার্টুনও তারা বানিয়েছে এবং বানাচ্ছেও।

সে যাইহোক, জাকির নায়েক এবং উনার প্রতিষ্ঠিত ‘পিস টিভি’ কে গতবছর ভারত এবং বাংলাদেশে ব্যান করা হয় খুব সিলি একটা ইস্যুকে কেন্দ্র করে।
ইস্যুটা ছিলো- ঢাকার গুলশানের জঙ্গী হামলার সাথে জড়িতদের কোন একজন টুইটার বা ফেইসবুকে জাকির নায়েকের ফলোয়ার ছিলো এবং কোন একসময়, জাকির নায়েকের কোন একটি লেকচার সে শেয়ার করেছিলো।
এ থেকে ধারণা করা হয় যে, সেই জঙ্গীটা ডক্টর জাকির নায়েক দ্বারা ইনফ্লুয়েন্সড হয়ে জঙ্গী কর্মকান্ডে জড়িয়েছে। মোদ্দাকথা, সেই জঙ্গীর সূত্র ধরে, জাকির নায়েক এবং উনার ‘পিস টিভি’ কে জঙ্গী কর্মকান্ডে উস্কানিদাতা হিসেবে দেখিয়ে ব্যান করে দেওয়া হয়।

জাকির নায়েক এবং উনার পিস টিভি ব্যান হওয়ার পর এদেশের মুক্তমনাদের মনে খুশির বন্যা বয়ে গেলো। সবাই খুশিতে বাক বাকুম বাক বাকুম করতে লাগলো। আহা! এতোদিনে সরকার একটা কাজের কাজ করেছে। এদেশের একজন নামকরা প্রফেসর, যিনি আবার নিজেকে বাক স্বাধীনতার পক্ষের লোক, অবাধ মত প্রকাশের (সে যার মত-ই হোক) পক্ষের লোক বলে জাহির করেন, যিনি নাস্তিক ব্লগারদের জন্য সবসময় মায়াকান্নায় ভেঙে পড়েন, তিনিও জাকির নায়েক এবং উনার টিভি ব্যান হওয়ার পর খুশিতে একখানা আর্টিকেল প্রসব করেছিলেন।

যাহোক, পয়েন্ট হলো- জাকির নায়েকের কাছ থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে সেই ছেলেটা জঙ্গী হয় এবং গুলশানে জঙ্গী কর্মকান্ডে জড়িয়ে এতোগুলো মানুষ খুন করে।
পয়েন্ট টু বি নোটেড- ছেলেটা জাকির নায়েককে ফলো করতো, এবং কোন এককালে জাকির

নায়েকের একটা লেকচারের ভিডিও লিঙ্ক শেয়ার করেছিলো সোশ্যাল মিডিয়ায়। ছেলেটা যেহেতু জাকির নায়েককে ফলো করতো, সুতরাং, এখানে জাকির নায়েকও সমানভাবে দোষী। সুতরাং নাস্তিকদের অভিমত- জাকির নায়েক এবং তার টিভি চ্যানেল ব্যান হওয়াটা যৌক্তিক, ঠিক কাজ।
কারণ, জাকির নায়েক জঙ্গী কর্মকান্ডে উস্কানি দেয়।

এবার আরেকটা পয়েন্টে আসুন। বিবর্তনবাদের জনক চার্লস ডারউইনকে তো চিনেন, তাই না?
হ্যাঁ, সেই চার্লস ডারউইন তার বিখ্যাত (যেটাকে বিবর্তনবাদের 'বাইবেল' গন্য করা হয়) বই 'The Origin Of Species: By means Of Natural Selection' এ পৃথিবীতে কীভাবে একটি এককোষী ব্যাকটেরিয়া থেকে প্রাণী এবং উদ্ভিদের বিবর্তন ঘটেছে, তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন।
যাহোক, সেই বইতে কোন কোন প্রাণীরা পরিবেশে টিকে থাকবে, সেটাও তিনি বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি এটার নাম দিয়েছিলেন- 'Natural Selection'। বলা চলে, এই ন্যাচারাল সিলেকশানই তার পুরো থিওরির মূলমন্ত্র। এজন্যই, বইয়ের নামের সাথেই উনি এই নামটাও জড়িয়ে দিয়েছিলেন (By means Of Natural Selection)

Natural Selection এর মূল বক্তব্য হচ্ছে- 'প্রকৃতিতে একটি অবিরাম সংগ্রাম চলছে। এই সংগ্রাম হলো টিকে থাকার সংগ্রাম। দিনশেষে, প্রকৃতিতে তারাই টিকবে, যারা যোগ্য। অযোগ্য, দূর্বলরা বিলুপ্ত হবে- এটাই প্রকৃতির নিয়ম। যারা দূর্বল, যারা সংগ্রামে টিকে থাকার অযোগ্য, তারা প্রকৃতিতে টিকে থাকবে না।
এটাকে **Survival Of the Fittest** বলা হয়।

আমি যখন একদিন এডলফ হিটলারের Mein Kampf (My Struggle) বইটা পড়ছি, তখন ঠিক একদম এরকম, হুবহু ডারউইনের কথার মতোই কিছু বক্তব্য খুঁজে পেলাম।
তিনি তার বই Mein Kampf এর ২৩৯-২৪০ পৃষ্টায় লিখেছেন- ' If nature doesn't wish that weaker individuals should mate with the stronger, she wishes even less that a superior race should intermingle with an inferior one; because in such cases all her efforts, throughout hundreds of thousands of years, to establish an evolutionary higher stage of being, may thus be rendered futile.
But, such a preservation goes hand-in-hand with the inexorable law that it is the strongest and the best who must triumph and that they have right to endure. he who would live, must fight. he who doesn't wish to fight in this world, where permanent struggle is the law of life, hasn't the right to exist'

খেয়াল করুন, Hitler লিখেছে **'If Nature doesn't wish**'
Nature বলতে তিনি ঠিক কী বুঝালেন? ডারউইন যে Natural Selection এর কথা বলে

গেছেন, সেটা নয়তো? Hitler এখানে স্পষ্টতই একটি Superior Race এবং Inferior Race এর কথা উল্লেখ করেছে এবং বলেছে, প্রকৃতিতে এটি বলবৎ আছে। দূর্বল আর সবলের মধ্যে সংঘাত।
ঠিক যে কথাগুলো ডারউইন তার 'Origin Of Species' এ বলেছে।
Hitler এরপরে বলেছে, – ' it is the strongest and the best who must triumph and that they have right to endure.'
অর্থাৎ, যারা সবল এবং সর্বোৎকৃষ্ট, তারাই টিকে থাকবে এবং থাকা উচিত।
(যে কথাগুলো একইভাবে ডারউইনেরও)
Hitler আরো লিখেছে– 'he who doesn't wish to fight in this world, where permanent struggle is the law of life, hasn't the right to exist'

অর্থাৎ, সংগ্রামই যেখানে Law Of Life (Naturally), সেখানে যারা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করবেনা, তাদের বেঁচে থাকার আদতে কোন অধিকার নেই।

Hitler ভাবতো, ইহুদীরা যেহেতু ম্লেচ্ছ, Inferior (তার দৃষ্টিতে), তাই প্রকৃতিতে তাদের বেঁচে থাকার কোন অধিকারই নেই। তাই সে সমানভাবে ৬০ লক্ষ ইহুদীকে গনহত্যার মাধ্যমে প্রকৃতি থেকে বিলুপ্ত করে দেয়।
তাহলে, আমরা যদি দাবি করি, ডারউইনের The Origin Of Species: By means Of Natural Selection' বই পড়ে উদ্বুদ্ধ হয়ে Hitler এরকম গনহত্যা করেছে, তাহলে কি তা খুব যুক্তিবিরুদ্ধ হয়ে যাবে? যেখানে সে নিজেই Evolutionary higher Stage এর কথা উল্লেখ করেছে।
এরকম আমরা যদি Hitler এর এই অপরাধের জন্য ডারউইনকে দোষী সাব্যস্ত করি, তার মরণোত্তর (যদিও ইম্পসিবল) মৃত্যুদন্ড দাবি করি, কলেজ-ইউনিভার্সিটিতে Theory Of Evolution পড়ানো বন্ধের দাবি তুলি, আমাদের নাস্তিক বন্ধুরা কি আমাদের সাথে একমত হবেন যেভাবে জঙ্গী কর্মকান্ডের সাথে জাকির নায়েকের Link করেছিলেন আপনারা? উত্তরের আশায় রইলাম।

(আমি বলছি না যে, হিটলারের কাজের জন্য ডারউইন দোষী। কিন্তু, একজন জঙ্গীর একটি সিলি ম্যাটার যদি জাকির নায়েককে বিচারের আওতায় আনে, হিটলারের ৬০ লক্ষ ইহুদি হত্যার জন্য ডারউইনকেও বিচারের আদালতে তোলা যায়)

‘নাস্তিকদের অসততা-
একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ’ পর্ব-২

মার্ক্সিজমের সাথে ডারউইনিজমের সম্পর্ক কী? সম্পর্ক হচ্ছে- দুইটাই একটা অন্যটার মাসতুতো ভাই। মুদ্রার এপিট-ওপিট।

মার্ক্সিজমকে আমরা মোটাদাগে **Materialism** তথা **বস্তুবাদ** বলতে পারি। যদিও মার্ক্সিজমের দাবি- মার্ক্সবাদ সমাজের ক্লাসিফিকেশন নিয়ে কাজ করে, তথাপি, এটার রুট (Root) লেভেলে যা আছে, তা হচ্ছে একটা Godless পৃথিবীর ধারণা।
যে পৃথিবীতে মানুষই সবকিছু। যেখানে কোন সুপার ন্যাচারাল পাওয়ারের হাত নেই, অস্তিত্ব নেই। মার্ক্সিজম তথা কমিউনিজমের প্রতিষ্ঠাতা, কার্ল মার্ক্সের ধর্ম নিয়ে একটি বিখ্যাত উক্তি আছে। সেটি হচ্ছে- “religion is an opium for the people”
অর্থাৎ,- “ ধর্ম হচ্ছে মানুষের জন্য আফিমের মতোন। ”
অনেকেই এই উক্তির ভুল ব্যাখ্যা করে থাকে। তারা এটা দিয়ে বুঝাতে চায় যে, মার্ক্স নাকি ধর্মকে আফিমের সাথে তুলনা করে ধর্মের মাহাত্ম্য বুঝিয়েছে। এটা পুরোদাগেই একটা ভুল ধারণা। মার্ক্স যা বুঝিয়েছে তা হলো, – আফিম খেলে মানুষ যেমন অপ্রকৃতিস্থ হয়ে পড়ে, ধর্ম মানলেও মানুষ ঠিক সেরকম অপ্রকৃতিস্থ হয়ে পড়ে।

মার্ক্সিজমের একেবারে রুট লেভেলে যা আছে, সেটাই হচ্ছে ডারউইনিজম তথা নাস্তিকতার মূল বিষয়বস্তু। নাস্তিকতার মূল বেইসিসটাই হচ্ছে- A Godless world… যেখানে কোন সুপার ন্যাচারাল পাওয়ার নেই, কোন স্রষ্টা নেই, কোন ইশ্বর, আল্লাহ কিচ্ছু নেই।
এখান থেকে আমরা বুঝতে পারি, মার্ক্সিজম তথা কমিউনিজম বলতে যা বুঝায়, ডারউইনিজম তথা এথেইজম বলতেও ঠিক তা-ই বুঝায়। এখানে কেবল কিছু শব্দের রকমফের।

কমিউনিজমের প্রতিষ্ঠাতা হলেন দু’জন। Karl Marx এবং Friedrich Engels। দুজনই ছিলেন জার্মান ফিলোসপার।
মজার ব্যাপার হচ্ছে, Karl Marx এবং Friedrich Engels দুজনের সাথেই বিবর্তনবাদের জনক

Charles Darwin এর ছিলো খুব ভালো সমঝোতা। Karl Marx উনার বিখ্যাত বই Das Kapital বিবর্তনবাদের জনক ডারউইনকে উৎসর্গ করেছিলেন।
যখন ডারউইনের প্রথম বই, The Origin Of Species প্রকাশিত হয়, Freiedrich Engels একটি চিঠিতে Karl Marx কে লিখেছিলো, – "Darwin , whom I am just now reading , is splendid" (১)
এর প্রতিউত্তরে Marx লিখেছিলেন, – " This is the book which contains the basis in natural history for our view" (২)

খেয়াল করুন, ডারউইনের The Origin Of Species এর জন্য Marx বললেন, – " এটাই সেই বই, যা আমাদের চিন্তাভাবনার বেসিস ধারণ করে। "
সুতরাং, মার্ক্সিজম তথা কমিউনিজমের বেসিস থেকে আমরা কোনভাবেই চাইলে বিবর্তনবাদকে আলাদা করতে পারিনা। মার্ক্স তার ফিলোসপি হিসেবে যা করেছেন বা করতে চেয়েছেন, তার সেই ফিলোসফি এবং ডারউইনের ফিলোসফি যে একই,সেটা মার্ক্স নিজেই স্বীকার করে নিয়েছেন।
শুধু তাই নয়, মার্ক্স Lessable নামে তাঁর এক বন্ধুকে আরেকটি চিঠিতে লিখেছেন, – " Darwin 's book is very important and serves me as a basis in natural science for the class struggle in history " (৩)
ডারউইন তাঁর বই The Origin Of Species এ তাঁর ফিলোসফি হিসেবে যে শ্রেণী সংগ্রামের কথা উল্লেখ করেছিলেন, মার্ক্সের ফিলোসফিও তাঁর সাথে মিলে যায়।
Frederich Engels ডারউইন এবং মার্ক্সকে একই সমান্তরালে এনে লিখেছেন,- " Just as Darwin discovered the law of evolution in organic nature , so Marx discovered the law of evolution in human history" (৪)
কমিউনিজম এবং ডারউইনজমের মধ্যে যে সম্পর্ক, সেটা বুঝাতে গিয়ে কার্ল মার্ক্সের একটি বায়োগ্রাফিতে লেখা হয়েছে এরকম, – "Darwinism presented a whole string of truth supporting Marxism and proving and developing the truth of it . The spread of Darwinist evolutionary ideas created a fertile ground for Marxist ideas as a whole to be taken on board by the working class … Marx , Engels , and Lenin attached great value to the ideas of Darwin and pointed to their scientific importance , and in this way the spread of these ideas was accelerated" (৫)

মার্ক্সের যে ফিলোসফি, সেই ফিলোসফিকে যিনি বাস্তবরূপ দান করেছিলেন, তাঁর নাম Lenin. Lenin যে আন্দোলনের মাধ্যমে রাশিয়ার ক্ষমতায় বসে তাঁর নাম Communist Bolsheviks Movement। এই Bolsheviks আন্দোলন ছিলো রাশিয়ার ইতিহাসের একটি রক্ষক্ষয়ী আন্দোলন। নিহত হয়েছিলো হাজার হাজার মানুষ। ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিলো প্রচুর।
এই Lenin ও ছিলো একজন নাস্তিক। তিনি বিবর্তববাদের জনক চার্লস ডারউইনকে নিয়ে বলেন, – " Darwin put an end to the belief that the animal and vegetable species bear no

relation to one another , except by chance , and that they were created by God , and hence immutable” (৬)

লেনিনের পরে, রাশিয়ায় সমাজতন্ত্র তথা কমিউনিজমের শক্তপোক্ত হয়ে যে ক্ষমতায় আসে,তাঁর নাম হলো Stalin. স্ট্যালিন সম্পর্কে খুব বেশি মনে হয় বলার দরকার নেই। স্ট্যালিন তাঁর অগ্রগামী অন্য কমিউনিস্ট নেতাদের মতোই একজন নাস্তিক ছিলেন। ইশ্বরে বিশ্বাস করতেন না। পুরোদস্তুর একজন বস্তুবাদী।
ডারউইন সম্পর্কে স্ট্যালিন লিখেছে, – “There are three things that we do to disabuse the minds of our seminary students . We had to teach them the age of the earth , the geologic origin , and Darwin ‘s teachings” (৭)

স্ট্যালিনের এক বাল্যবন্ধু স্ট্যালিনের জীবনী লিখেছিলেন। তিনি সেই বইতে লিখেছেন, – “At a very early age, while still a pupil in the ecclesiastical school , Comrade Stalin developed a critical mind and revolutionary sentiments. He began to read Darwin and became an atheist” (৮)
স্ট্যালিনের সেই বাল্যবন্ধু আরো লিখেছেন যে, স্ট্যালিন তাঁকে বলেছে ডারউইনের বই পড়েই সে (স্ট্যালিন) নাস্তিক হয়ে পড়ে এবং তাঁকেও (তাঁর বন্ধুকে) ডারউইনের বই পড়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করেছিলো।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে আমরা দেখলাম যে, কমিউনিজম = এথেইজম।
এখন, পৃথিবীতে কমিউনিজম তথা এথেইজমের নামে যতো গণহত্যা হয়েছে , যতো মানুষ খুন হয়েছে, যতো ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তার চারভাগের একভাগের সিকিভাগও একত্রে পৃথিবীর সব ধর্মগুলোর ধর্মযুদ্ধেও তা হয়নি। একা হিটলারই গণহত্যা করে খুন করেছে ৬০ লক্ষ ইহুদি। লেনিন তো ব্ললশেভিক আন্দোলনে গনহত্যা চালিয়েছেই, বিভিন্ন রেকর্ডমতে, স্ট্যালিন খুন করেছে প্রায় ১ মিলিয়ন মানুষ, এবং ঘরবাড়ি ছাড়া করেছিলো আরো ২০ মিলিয়ন মানুষকে।

(হিটলারের সাথে ডারউইনিজমের কী সম্পর্ক, তা এর আগের লেখায় দেখিয়েছিলাম)

এই কমিউনিজম তথা নাস্তিকতার নামে রাশিয়াতে খুন করা হয়েছে প্রায় ২০ মিলিয়ন মানুষ। চীনে (মাও সে তুং এবং অন্যান্যদের হাতে) খুন হয়েছে প্রায় ৬৫ মিলিয়ন মানুষ, ভিয়েতনামে ১ মিলিয়ন মানুষ। উত্তর কোরিয়াতে ২ মিলিয়ন, কম্বোডিয়ায় ২ মিলিয়ন, পূর্ব ইউরোপে ১,৫০,০০০ , আফ্রিকাতে ১.৭ মিলিয়ন, আফগানিস্থানে ১.৫ মিলিয়ন মানুষ হত্যা করা হয়। (৯)

আমাদের নাস্তিক বন্ধুরা, যারা আবার প্রোফাইলে ধর্মের জায়গায় ‘মানবতাবাদী’ সেট করে রাখে, তারা কী আমাদের কাছে ব্যাখ্যা করবে যে তাদের স্পিচ্যুয়াল এই সমস্ত ‘গুরু’গণ ‘মানবতার’ নামে, সমাজতন্ত্রের নামে, শান্তির নামে, ধর্মহীনতার নামে যে সকল গনহত্যা

চালিয়েছে, যে সকল ইতিহাস বিখ্যাত ভয়ঙ্কর নৈরাজ্য পৃথিবীতে ঘটিয়েছে, তা ঠিক কী বলে বিবেচিত হবে?

কথায় কথায় ধর্মবাদীদের মৌলবাদী ট্যাগ দেওয়া, ধর্মকে সন্ত্রাস, নৈরাজ্যের আঁতুড়ঘর হিসেবে আখ্যায়িত করা, ধর্ম মানেই সন্ত্রাস, ধর্ম মানেই খুন, হত্যা বলে বুলি আওড়ানো সেই সমস্ত মানবতাবাদী ভাই ব্রাদারগণ, যারা নিজেদের একইসাথে মানবতাবাদী, সমাজতান্ত্রিক, কমিউনিস্ট হিসেবে পরিচয় দিতে পুলক অনুভব করেন, তারা কী আমাদের জানাবেন যে- পল পট, স্ট্যালিন, মাও সে তুং, লেনিন সাহেবদের এহেন মহৎকর্মের কী নাস্তিকীয় ব্যাখ্যা থাকতে পারে? কথায় কথায় মুসলিমদের জিহাদকে সন্ত্রাসবাদ বলে চালানো নাস্তিক ভাইদের কাছ থেকে একটি সদুত্তর আশা করছি। আমি আশা করি, তারা খিস্তি খেঁউড় না করে, আমাকে প্রমাণ করে দেখাবেন যে- উপরে উল্লিখিত মহান নেতাগণ (!) আদতে নাস্তিক ছিলেন কী না। যদি নাস্তিক হয়ে থাকে, তাহলে তাদের কর্তৃক সংঘটিত গনহত্যাগুলোর ব্যাখ্য কী? যদি তারা নাস্তিক না হয়, তাহলে তারা আদতে কী ছিলো? বা, নাস্তিক হয়ে থাকলে তাদের কাজকে আপনারা কীভাবে ডিফেন্ড করবেন?

তথ্যসূত্র –

১, ২, ৩, ৪- Evolution, Marxian Biology & the social scene- 85-87

৫- The Biography Of Karl Marx, Oncu Yayinevi, 368

৬- False Religion Of Evolution, Kent Hovind

৭, ৮- Landmarks in the life Of Stalin, E. Yaroslavsky, 8

৯- ‘The black book of Communism’, Stephene Courtois, Nivolas Werth, Jean-Louis Panne, Andrzej Paczkowski, Karel Bartosek, Jean- Louis Margoli,
(Harvard University Press, 04)

আমার দ্বিতীয় বিয়ে

আগেরদিন বিকেলে একসাথে বসে চা খাওয়া খুব কাছের বন্ধুটি যখন পরেরদিন না ফেরার দেশে চলে যায়,
সেই শোক সামলানোর জন্য ঠিক কি রকম মানসিক প্রস্তুতি দরকার?
মাঝে মাঝে খুব ইচ্ছে হয় সৃষ্টিকর্তাকে জিজ্ঞেস করি, 'হৃদয়' নামের এই অদৃশ্য বস্তুটি মানুষকে না দিলে কি খুব বেশিই বেমানান হতো? চলা যেতো না একদম?
আমি জানি সৃষ্টিকর্তা সকল প্রশ্ন, অসুন্দর, সকল অশোভন,অসুবিধে,সমস্যার উর্ধ্বে।
হৃদয় না থাকলে কি হতো? কোন শোক-কষ্ট-ব্যথা মানুষকে স্পর্শ করতো না। এটা একটা সুবিধে বটে।
তবে মানুষের অকৃত্রিম ইচ্ছে- 'মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভূবনে।'
সুন্দর,মনোহরা এই পৃথিবী ছেড়ে আসলে কেউই মরতে চায় না। চরম শোক,কষ্ট,ব্যথা-যন্ত্রনা সইতে না পেরে যে মানুষটি আত্মহত্যা করার সিদ্ধান্ত নেয়,
আত্মহত্যার একটু আগে সেও তার চারপাশের দুনিয়াকে একপলক দেখে নেয়। গোলাপের গায়ে কাঁটা আছে বলেই হয়তো গোলাপ এত সুন্দর!
আর পৃথিবীতে আনন্দ,সুখ, শোক,দু:খ-কষ্ট এবং তা অনুভবের জন্য একটি হৃদয় আছে বলেই হয়তো পৃথিবীটাও এতো আকর্ষণীয়।

বন্ধু জাহিদের মৃত্যু সংবাদ শোনার পর থেকে অনেকক্ষন পাথরের মতো হয়ে ছিলাম।
মনে হচ্ছিল পৃথিবীর গতিপথ পাল্টে গেছে, থেমে গেছে ঘূর্ণন। ভেঙ্গে গেছে মহাকর্ষীয় সব শক্তি। সবকিছু স্থবির। যেকোন সময় প্রলয় আসন্ন।
এমন সময় আমার সাহস যোগাতে এগিয়ে এলো আমার স্ত্রী, ফাতিমা।
সে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে পাঠ করলো- 'কুল্লু নাফসিন যা'ঈকাতিল মঊত।'
আসলেই তো। পৃথিবীর কিছু মানুষের কাছে সৃষ্টিকর্তা বলে কেউ একজন আছেন,
কিছু মানুষের কাছে সৃষ্টিকর্তা বলে আদৌ কেউ নেই। আবার, কিছু মানুষ এ দু'য়ের দোলাচলে বাস করে।
বিশ্বাসী, অবিশ্বাসী আর সংশয়বাদীরা 'সৃষ্টিকর্তা' নিয়ে যতোই বিরোধ করুক, তারা সকলে এই একটি বিষয়ে একমত যে, তাদের সবাইকেই একদিন মরতে হবে। মৃত্যু গ্রাস করবে প্রত্যেকটি জীবনকে। মৃত্যুর হাত থেকে কারোর রেহাই নেই।

জাহিদ আমার বাল্যকালের বন্ধু। একসাথে স্কুল,কলেজ আর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছি। মাঝখানে আমি বাইরে চলে যাই।

দেশে এসে জানতে পারি সে বিয়ে করেছে। তাদের একটি দু' বছরের মেয়েও আছে। মাঈশা নাম।
জাহিদের ইনকাম আহামরি কিছু ছিলো না। গ্রাজ্যুয়েশান কমপ্লিট ছিল,কিন্তু চাকরির বাজারে আজকাল 'স্পীড মানি'র এতই কদর যে, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রাজ্যুয়েটরাও কোথাও ঠাঁই পান না।
জাহিদের ছোট্ট একটা ব্যবসা ছিলো। কিছু ষ্টুডেন্ট পড়াতো আর বই লিখতো। এইটুকুই। এইটুকু দিয়েই দিব্যি চলছিলো তিনজনের সংসার।
একদিন জাহিদকে প্রচুর বিমর্ষ অবস্থায় পেলাম। আমার বন্ধুটির এমন চেহারা আমাকেও বিমর্ষ করে তুললো।
আমি জানতে চাইলাম, - 'কি ব্যাপার? তোকে এতটা বিমর্ষ দেখাচ্ছে কেনো?'
সে বলতে চাইলো না। উঠে যেতে চাইলো। আমার জোরজবরদস্তিতে শেষ পর্যন্ত বললো তার মেয়েটার ব্রেইন টিউমার ধরা পড়েছে। আমাকে বলতে বলতেই সে হাউমাউ করে কেঁদে উঠলো। কান্না বিজড়িত কন্ঠে বললো,- 'মাঈশাকে ঘিরেই আমাদের পৃথিবী। ওর কিছু হলে আমাদের দু'জনের কেউই বাঁচবোনা।'
আমার কাজ তাকে অভয় দেওয়া,শান্তনা দেওয়া। সন্তানের কিছু হলে বাবা-মা'রা যে এতটা ভেঙ্গে পড়ে, জানতাম না।
খুব ছোটবেলায় মা-বাবাকে হারিয়েছি। তাই, আমাকে নিয়ে তাদের উদ্বেগ-উৎকন্ঠা তেমন অনুভব করার সুযোগ হয়নি। আর, আমার আর ফাতিমার বিয়ের দীর্ঘ সাত বছর অতিক্রম হলেও, আমাদের কোলে কোন সন্তান আসেনি। তাই জাহিদের কষ্টটি আমাকে অতোটা ধাক্কা না দিলেও, তার চোখের জল আমাকে অনেকটাই কাতর করে তুললো।
আমি তাকে বললাম,- 'দেখ, এভাবে ভেঙ্গে পড়লে তো হবেনা। রোগ যেমন আছে, তার চিকিৎসাও আছে। ইনশা আল্লাহ, মাঈশার কিছুই হবেনা।'
জাহিদের সাথে এই আলাপগুলো করেছিলাম কয়েক মাস আগে।
এরপর একদিন হঠাৎ দেখা। দু'জনেই অসম্ভব ব্যস্ত ছিলাম। জাহিদের মুখে সর্বদা লেগে থাকা সেই অকৃত্রিম হাসি আর নেই। আমাকে দেখে হাসার ভান করেও পারলোনা। আমি তো তাকে চিনি। কৃত্রিমতায় যে তাকে মানায় না। একদম না।
মাঈশার ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞেস করতেই ভুলে গেছি। দু' জনে দু কাপ চা খেলাম। হালকা আলাপ, এরপর যে যার পথে।
আজকে ঠিক এই সময়টায় এসে তার মৃত্যু সংবাদ শুনতে হবে ভাবিনি। এমনও হয়? এতটাই ঠুনকো মানুষের জীবন? যেন কচু পাতার উপর একটি শিশির বিন্দু। একটা দমকা হাওয়া, এরপর ঠুস করে নিচে পড়ে যাওয়া। আহহ জীবন!!

হার্ট স্ট্রোকে মৃত্যু। ভয়ানক মৃত্যু।
গতকালের শুধুই জাহিদ আজ হয়ে গেল একটি লাশ। নড়ানড়া বিহীন।
গতকালের জাহিদকে আজ সম্বোধন করতে হলে কতোকিছুই সাথে লাগাতে হবে। মৃত জাহিদ, মরহুম জাহিদ, Late Jahid...
হায় বাস্তবতা!! শোকের অনলে ঘি ঢেলে দেবার কতো চোখ ধাঁধানো বন্দোবস্তই না তোমার!
স্কুল জীবনে জাহিদের কাঁধে কতো চড়েছি। শারীরিক দৈর্ঘ্যে সবার চেয়ে এগিয়ে ছিলো জাহিদ। তার কাঁধকে মই বানিয়ে কতোশতো বার স্কুলের গাছের ডাব,আম,পেয়ারা চুরি করেছি, তার ইয়ত্তা নেই। আজ সেই জাহিদ আমার কাঁধে, লাশ হয়ে।
এরচেয়ে নিষ্ঠুর, মর্মান্তিক, হৃদয়বিদারক কোন দৃশ্য পৃথিবীতে আছে? আমি জানিনা।

জাহিদের মৃত্যুর সাথে সাথে মাঈশার চিকিৎসা বন্ধ হয়ে গেলো।
জাহিদ যাদের সাথে শেয়ারে ব্যবসা করতো, তারা পূর্ণাঙ্গ শেয়ারের লভ্যাংশ দিচ্ছেনা। জাহিদের মৃত্যুর পরেরদিন থেকেই নামে-বেনামে বেরিয়ে এসেছে অনেক পাওনাদার, যাদের অনেককে জাহিদের স্ত্রী কখনো দেখেই নি।
কোন এক সাহিত্যিক বলেছিলেন, - 'জীবিতকে নিয়ে ব্যবসা চলে, মৃতকে নিয়ে নয়।'
সেই সাহিত্যিক আজও বেঁচে আছেন কিনা জানিনা। থাকলে তাকে এনে খুব দেখাতে ইচ্ছে হচ্ছে,- 'দেখুন, মৃত লাশকে নিয়েও এখানে কতো রমরমা ব্যবসা হয়।'

তিনমাসের মাথায় বাড়িওয়ালা জাহিদের স্ত্রী-কন্যাকে আর বাসা ভাড়া দিতে রাজি না।
ব্যবসার অংশীদারেরা ব্যবসার বিরাট 'ক্ষতি' দেখিয়ে জাহিদের নাম চুক্তিপত্র থেকে বাদ দিলো। ঢাকা শহর। যেখানে খাবার পানিটাও মাগনা পাওয়া যায় না, সেখানে বুঝি এই অবস্থায় ব্রেইন টিউমারের চিকিৎসা হবে?
অবস্থা এমন, ছোট্ট মেয়েটিকে নিয়ে পথে বসা ছাড়া ভাবির উপায়ন্তর নেই। আমাদের অবস্থাটাও আহামরি কিছু না। মধ্যবিত্ত ফ্যামিলি। কোনরকম নিজেদের ভরণপোষণ সামলে বাড়তি কারো দায়িত্ব কাঁধে নেবো, সে সাধ্যি কই?
তবুও টুকটাক যতটুকু পারছিলাম, বন্ধুর পরিবারের পাশে থাকার চেষ্টা অব্যাহত ছিলো। বন্ধুর স্ত্রী-সন্তানকে এভাবে নিগৃহীত,অবহেলিত হতে দেখে আমার মনের ভেতর রক্তক্ষরণ হতো।
কিন্তু কিছুই করার ছিলোনা তখন।

একটা সমিতিতে আমার কিছু জমানো টাকা ছিলো। ঠিক করলাম, টাকাগুলো তুলে মাঈশার চিকিৎসা করাবো।

একরাতে আমি এই ব্যাপারে ফাতিমার সাথে আলাপ করলাম। তাকে বললাম ভাবিদের দূর্দশার কথা। যেহেতু আমাদের কোন সন্তান ছিলোনা,মাঈশার প্রতি আমাদের দু'জনেরই দূর্বলতা ছিলো। আমি মনে করেছিলাম, ফাতিমা আমার প্রস্তাবে উৎসাহের সাথেই রাজি হবে।
কিন্তু আমাকে অবাক করে দিয়ে ফাতিমা বললো,- 'না, এটার দরকার নেই।'
আমি মূহুর্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেলাম। আমি কল্পনাও করিনি ফাতিমা আমার এই প্রস্তাবে আমার মুখের উপর 'না' বলে দেবে।
এই ফাতিমাকে আমি সাত বছর ধরে চিনি।
এই সেই ফাতিমা, যে জাহিদের মৃত্যু সংবাদে শোকার্ত,শোকে মূহ্যমান আমার পাশে সাহস আর শান্তনার ফুয়ারা হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। আর আজ সে?
ফাতিমার এমন আচরনে হৃদয়ের গভীরেই ধাক্কার মতো খেলাম। আমার এতদিনের বিশ্বাস,আস্থা,ভালোবাসা যেন মূহুর্তেই ভেঙ্গে খান খান হয়ে যেতে চাইলো। এ আমার সঙ্গিনী, ফাতিমা? মিলাতে পারলাম না।
আমি উঠে যেতে চাইলাম। ফাতিমা আমার হাত ধরে বসিয়ে দিলো।
বললো,- 'আপনি আমার কথায় কষ্ট পেয়েছেন?'
আমি উত্তর দিলাম না। স্বার্থপরতার এই যুগে ফাতিমাকেও পাল্টে যেতে হলো? কেন?
সে আবার বললো,- 'আমার কথাটা একবার শুনুন।'
আমি বললাম,- 'বলো'।
-- ভাবিদের আমরা আজ নাহয় টাকা দিয়ে সাহায্য করলাম। কিন্তু আগামিকাল? আগামি পরশু কে করবে?
আমি মনোযোগি শ্রোতার মতো বললাম,-'ঠিক বুঝতে পারছিনা।'
ফাতিমা বললো,- 'ভাবিদের আমরা হয়তো আজ দয়া করবো, কিন্তু এই মূহুর্তে তাদের দরকার আশ্রয়। একটি ঠিকানা। মাথা গোঁজার একটি স্থায়ী আবাস। মাঈশার মাথার উপর একটি ছায়া। তাই নয় কি?
এত গুরুগম্ভীর কথার সারমর্ম উদ্ধারে আমি সেবারও ব্যর্থ হলাম। তাকে বললাম,- 'পরিষ্কার করে বলো,দয়া করে।'
এবার ফাতিমা আমার হাত ধরে ফেললো। কান্নাভেজা কন্ঠে বললো,- 'আমি চাই আপনি ভাবিকে বিয়ে করুন।'
আমি দীর্ঘক্ষন চেয়ে রইলাম ফাতিমার দিকে। সে মাটির দিকে তাকিয়ে আছে। টপটপ করে তার চোখের জল নিচে গড়িয়ে পড়ছে।
আমি জিজ্ঞেস করলাম,- 'তুমি ঠিক আছো?'
ফাতিমা কিছু বলতে পারলো না। আমার হাত তখনও ধরে আছে। আমি বাম হাতে তার চোখের জল মুছে দিয়ে বললাম,- 'এটা হয়না, ফাতিমা।'

সে বললো,- 'কেনো হবেনা? আজ আল্লাহ না করুক, জাহিদ ভাইয়ের জায়গায় আপনি আর ভাবির জায়গায় আমি হলে?'
আমি ভাষা হারিয়ে ফেলেছি। ফাতিমার যুক্তির বীপরিতে ছোঁড়ার মত যুক্তি আমার হাতে নেই।
তবু বললাম, - ' যতটুকু হোক, টাকা দিয়ে আমরা তাদের পাশে দাঁড়াতে পারি।'
সে বললো,- 'এটা দয়া। আমি চাই তারা দয়া নয়, অধিকার নিয়ে বাঁচুক।'
-- 'কিন্তু ভাবি?'
ফাতিমা বললো,- 'সে দায়িত্ব আমার।'
আমি মূহুর্তের জন্য কোথায় যেন হারিয়ে গেলাম। সেই সত্বাকে ধন্যবাদ জানালাম যার হাতে আমার প্রাণ,ফাতিমাকে আমার স্ত্রী হিসেবে পাওয়ার জন্য।

আমাদের বিয়েটা হয়েছিলো।
বিয়ের দিন রাতে ফাতিমা আমাকে জড়িয়ে ধরে অনেক কেঁদেছিলো।
জাগতিক নিয়ম– পুরুষ মানুষ নাকি কঠিন হৃদয়ের। তারা নাকি খুব সহজে কাঁদেনা। সেদিন জগতের এই চিরাচরিত নিয়ম ভেঙ্গে ফাতিমাকে আলিঙ্গন করে আমিও অনেক কেঁদেছি।

'একজন শিক্ষকের কান ধরে উঠবস! রাজনীতির ভেতর পলিটিক্স? না পলিটিক্সের ভেতর রাজনীতি?'

আমাদের রাজনীতিতে বহুল আলোচিত, সমালোচিত একটি নাম- 'নারায়নগঞ্জ'।
বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারায়নগঞ্জকে বিখ্যাত করে তোলার নেপথ্যে যে পরিবারের ভূমিকা রয়েছে সর্বাগ্রে, তা হোলো- 'ওসমান পরিবার'।
এই ওসমান পরিবারের সবচেয়ে আলোচিত-সমালোচিত ব্যক্তি, সাংসদ সদস্য শামীম ওসমানের মতে, বাঙালির 'বঙ্গভঙ্গ' থেকে শুরু করে প্রাণের 'মুক্তিযুদ্ধ' পর্যন্ত যে দলের নামটিই সবার আগে আসে, সেই 'আওয়ামিলীগের' জন্মই হয় নারায়নগঞ্জে শামীম ওসমানদের পৈত্রিক বাড়িতে।
যদিও এটি একটি বিতর্কিত ইতিহাস। শামীম ওসমানের প্রচার করা এই ইতিহাসকে নাকচ করে ভূয়া বলে দাবি করেন স্বয়ং নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশানের মেয়র, নারায়নগঞ্জের আরেক বলিষ্ঠ আওয়ামীলীগ নেত্রী 'ড. সেলিনা হায়াৎ আইভি'।
শামীম ওসমানের দাবি করা এই ইতিহাস সত্য হোক অথবা মিথ্যা, আওয়ামিলীগের সাথে যে ওসমান পরিবারের একটি 'নাড়ির টান' রয়েছে, তা **অস্বীকার করার কোন উপায় নেই।**
এইজন্যেই নারায়নগঞ্জে 'সাত খুন' হত্যাকান্ডে ওসমান পরিবার যখন সমালোচনার তীরে জর্জরিত, তখন আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সংসদে দাঁড়িয়ে ঘোষণা দিলেন, 'যাহাই হউক, আমরা ওসমান পরিবারের পাশে আছি।'

সমসাময়িক বাংলাদেশের রাজনীতিতে 'নারায়নগঞ্জ' এবং 'ওসমান পরিবার' সবচেয়ে বেশি আলোচিত-সমালোচিত হয় **'ত্বকী হত্যাকান্ড'** এবং চাঞ্চল্যকর **'সাতখুন'** ঘটনায়।
সেই নারায়নগঞ্জ এবং ওসমান পরিবারকে আবারো জাতির সামনে নিয়ে এসেছে নতুন আরেকটি ঘটনা।
সেটি হোলো,- নারায়নগঞ্জের পিয়ার সাত্তার লতিফ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্যামল কান্তি ভক্তকে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দেওয়ায় নারায়নগঞ্জ ৫ নং আসনের সাংসদ সদস্য, এমপি সেলিম ওসমানের নির্দেশে কানধরে উঠবস করানোর ঘটনা।
'ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত' এই টার্মটি বাংলাদেশের রাজনীতিতে একটি বড় রকমের ট্রামকার্ড বলা চলে।
বাংলাদেশের শহুরে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সমাজ রাজনীতির ব্যাপারে তেমন কনসার্ন না হলেও, ধর্মের ব্যাপারে তারা খুবই কনসার্ন।
বাংলাদেশ যেহেতু মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ, তাই এদেশের ধার্মিক মুসলমানরা আর যাই হোক, ধর্মকে কটুক্তি, আল্লাহ-রাসূল নিয়ে কটুক্তি এসব সহ্য করতে পারেনা।
দেশের একটি বিরাট জনগোষ্ঠীর 'সহ্য করতে না পারা'র মতো এই সরলতাকে,ধর্মীয়

আবেগকে তাই ট্রামকার্ড বানিয়ে একশ্রেণীর রাজনিতীবিদদের **নোংরা রাজনীতি** করতে প্রায়ই দেখা যায়।
রাজধানীতে 'মিল্কি' হত্যাকান্ডের ঘটনায় খুনী,দলীয় ক্যাডারদের গায়ে পাঞ্জাবি, মাথায় টুপি, এবং ব্লগার হত্যার সময় 'আল্লাহু আকবার' শ্লোগান দেওয়া সহ এরকম বিভিন্ন ঘটনাই যার প্রমান।
আমাদের মধ্যবিত্ত সমাজ রাজনীতি নিয়ে ভাবেনা কিংবা ভাবতে চায়না বলেই অপরাধীরা অপরাধ করে তাদের অপরাধ ঢাকতে 'ধর্মীয় অনুভূতির' ধোঁয়া তুলে তাদের ক্ষেপিয়ে তুলে।

নারায়নগঞ্জে শিক্ষক কমল কান্তি ভক্তের সাথেও ঠিক একই ঘটনা ঘটেছে।
যেহেতু শিক্ষক কমল কান্তি ধর্মীয় দিক থেকে একজন হিন্দু সম্প্রদায়ের, তাই তার বিরুদ্ধ্যে এরকম একটি গুজব ছড়াতে পারলে তা হবে পুরোপুরিই বাজিমাত।
সাধারন মানুষকে তার বিরুদ্ধ্যে এরকম কিছু বলে ফুঁসলিয়ে দেওয়া গেলেই হোলো, বাকি কাজটা তারাই করে নেবে।
আগেই বলেছি,আমাদের সাধারন মধ্যবিত্ত সমাজের রাজনীতি নিয়ে ভাবনা কম, তাই ঘটনার 'বিহাইন্ড দ্যা ষ্টেজে' যে রাজনীতি লুকিয়ে আছে তা
তারা ধরতে পারেনা।

এই ঘটনার সূত্রপাত স্কুলের দশম শ্রেণীর একজন ছাত্রকে মারধরের মাধ্যমে।
বলা হোলো - 'প্রধান শিক্ষক কমল কান্তি ধর্মীয় বিদ্বেষ বশঃত রিফাত নামের ছেলেটিকে মারধর করেছেন।
কিন্তু ঘটনাটা ঘটার নেপথ্যে ধর্মীয় বিদ্বেষ ছিলো, নাকি ব্যক্তিগত রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের উদ্দেশ্য ছিলো সেই ব্যাপারে সন্দেহ বাড়িয়ে দেয়, যখন আমরা জানতে পারি, শিক্ষক কমল কান্তিকে বিশেষ বৈঠক আছে বলে শুক্রবারে স্কুলে তলব করা হয়।
বৈঠকের কথা শুনে কমল কান্তি স্কুলে প্রবেশ করলে সাথে সাথে স্কুলের গেইটে তালা লাগিয়ে, মসজিদের মাইকে ঘোষণা দিয়ে স্থানীয় পাবলিক জড়ো করা হয়। এরপর উনাকে মারধর এবং কানে ধরে উঠবস করানো হয়।

ঘটনার বিশ্লেষণে যাওয়ার আগে আমরা বলে রাখি, ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতের প্ররোচনায় প্ররোচিত হয়েই একজন শিক্ষককে মারধর এবং কানে ধরে উঠবস করানো কখনোই কাম্য নয়।
একজন শিক্ষক হচ্ছেন জাতি গড়ার কারিগর। এরকম মহান পেশার দায়িত্ব পালনকারী একজনের বিরুদ্ধ্যে অভিযোগেই তার বিরুদ্ধ্যে এতটা কঠোর অবস্থান অন্যায় তো বটেই, রীতিমত লজ্জাজনক।
যদি ধরে নিই যে, কমল কান্তি সত্যিই ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দিয়েছেন,

তাহলে তো দেশে আইন-আদালত আছে।আইন-আদালতের তোয়াক্কা না করেই এরকম হার্ড লাইনে এসে একজন শিক্ষককে এই ধাচের অপমান করাটা পুরো জাতির জন্যই অপমানজনক। যদি দেশের আইন-আদালত এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দিতে ব্যর্থ হতো, তাহলে এ ব্যাপারে কি করা যেতো, তা সময়ই বলে দিতো।কিন্তু ঠুনকো এবং শুধু শোনা অভিযোগেই একজন শিক্ষককে এরকম মারধর এবং কানধরে উঠবস করিয়ে হয়রানি করানোটা প্রমান করে দেয়, মন-মানসিকতায় আমরা ঠিক কতোটা নীচ আর অসভ্য।

ঘটনার পেছনের ঘটনা আমাদের চোখে সবসময় আড়ালে রয়ে যায়।
শিক্ষক কমল কান্তির বিরুদ্ধ্যে এই প্রপাগান্ডা কোন ধর্মীয় বিদ্বেষ বা ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতের জন্য নয়,
এটা পুরোপুরিই ব্যক্তিগত। আরেকটু ভিন্নভাবে বললে বলা যায়,- এর পেছনে রয়েছে একটি চক্রান্ত।আর এই চক্রান্তকে ডিফেন্ড করা হচ্ছে 'ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত' বলে।

আমরা শিক্ষক কমল কান্তির মুখ থেকেই জানতে পারি, নারায়নগঞ্জের পিয়ার সাত্তার লতিফ স্কুলের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই উনি স্কুলটার প্রধান শিক্ষকের দায়িত্বে আছেন।তিনি নিজ হাতেই স্কুলটাকে এই পর্যন্ত নিয়ে এসেছেন।
কয়েকমাস আগে তিনি নিজ উদ্যোগেই স্কুলে একটি 'ম্যানেজিং কমিটি' গঠন করেন।
কিন্তু নিজের গড়া এই ম্যানেজিং কমিটিই তাঁর জন্য সাপে বর হয়।
খোদ সেই ম্যানেজিং কমিটি থেকেই তাঁকে প্রধান শিক্ষকের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়ার গুঞ্জন উঠে।
ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি ফারুকুল ইসলামের বোন পারভীন আক্তারকে প্রধান শিক্ষক করার দাবি তুলে কয়েকজন।
খোদ কমিটির তিনজন সদস্য কমল কান্তির বিরুদ্ধ্যে ষড়যন্ত্রে উঠেপড়ে লাগে।
কমল কান্তি খুবই পরিশ্রমী এবং ছাত্রদের প্রিয় শিক্ষক।তাঁকে তাঁর জায়গা থেকে সরাতে হলে চাই এমন সেন্সেটিভ ইস্যু, যা শিক্ষক-শিক্ষার্থী-অভিভাবক সবাই সহজেই লুপে নিবে।
করাও হোলো তাই। তাঁকে এমন মারপ্যাঁচে ফেলানো হয়েছে, মধ্যবিত্ত বাঙালি তা না গিলে যাবে কই?
যারা এই ব্যাপারে আমার সাথে অদ্যাবধি একমত হতে পারছেন না, তাদের জ্ঞাতার্থে একটি সংবাদ- এই ঘটনার জের ধরে পিয়ার সাত্তার লতিফ স্কুলের প্রধান শিক্ষক কমল কান্তি ভক্তকে 'সাময়িক' বরখাস্ত করা হয়েছে।
ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের পদে বসানো হয়েছে **ম্যানেজিংকমিটির** সভাপতি ফারুকুল ইসলামের বোন পারভীন আক্তারকে।
বুঝতে পারছেন ঘটনা? কমল কান্তিকে আপাতত 'সাময়িক' সময়ের জন্য বরখাস্ত করা হয়েছে। আর, বাঙালির 'সাময়িক' সময়ের ডিউরেশান যে ঠিক কতো মিলি সেকেন্ড, তা আমার দেশ,দিগন্ত টিভি আর ইসলামিক টিভি সাময়িক বন্ধের ঘটনা থেকেই আঁচ করার চেষ্টা

করুন।

শিক্ষক অপদস্থ হওয়ার ঘটনা এটাই বাংলাদেশে প্রথম নয়। মোষ্ট প্রবাবলি, শেষও না।
স্যার কমল কান্তির প্রতি যথাযোগ্য সম্মান রেখেই এদেশের সুশীল আর তাদের লেজুড়বৃত্তি করা মিডিয়ার কাছে প্রশ্ন- যখন এদেশের শিক্ষকদের আন্দোলনে পেপার স্প্রে মারা হয়,মরিচের গুড়োর পানি মারা হয় তাদের চোখে-মুখে,
যখন বুয়েটের শিক্ষক জাহাঙ্গীর আলম স্যারকে লীগের ক্যাডারেরা সবার সামনে অপদস্থ করে, তখন আপনাদের বিবেক নাড়া দেয়না?
কমল কান্তিকে কানে ধরে উঠবস করালে যদি পরোক্ষভাবে পুরো বাংলাদেশই কানে ধরে উঠবস করে,
অন্যদের বেলায় কেনো তা হবেনা? **কেন শিক্ষকদের দিকে পেপার স্প্রে ছুঁড়ে মারলে তা পুরো জাতির দিকেই ছুঁড়ে মারা হয়না?**
কেন বুয়েটের জাহাঙ্গীর আলম স্যারেরা অপমানিত হলে পুরো বাংলাদেশ অপমানিত হবেনা?
সত্য প্রচারের ইজারা নিয়ে বসে থাকা এবং ন্যায়-নীতির শ্লোগান কপচানো এসব মেইনষ্ট্রিম মিডিয়া এবং আমাদের বুদ্ধিজীবী সমাজ যখন জাহাঙ্গীর আলমদের সাথে হওয়া অপরাধগুলোতে অপরাধীদের মাথার উপর শেলটার দিয়ে তাদেরকে বারবার বাঁচিয়ে নেয়,তখন সেসব অপরাধীরা বেপরোয়া হতে হতে শেষমেশ কমল কান্তিদের ঘাঁড় মটকায়।
ঠিক ওই মিথ্যেবাদী রাখাল এবং বাঘের গল্পের মতোই।
বাঘ বাঘ বলে ছেলেটা সারাদিন চিল্লাতো আর সবাইকে বোকা বানিয়ে অপদস্থ করতো। কিন্তু যেদিন সত্যি সত্যি বাঘ চলে এলো এবং রাখালের ঘাড় মটকালো, তখন আর কারো কিছুই করার থাকলো না।

স্যার কমল কান্তির সাথে ঘটে যাওয়া ঘটনায় যে ব্যাপারটা আমার কাছে সবচেয়ে বেশি রাজনৈতিক বলে মনে হয়েছে, তা হোলো এম.পি সেলিম ওসমানের ভূমিকা এবং বক্তব্য।
আওয়ামিলীগ যে বরাবরই 'ধার্মিক' এবং একই সাথে 'সেক্যুলার' একটি দল, তার আরো একবার প্রমাণ পেলাম।
কমল কান্তিকে কানে ধরে উঠবস করিয়েছিলো নারায়নগঞ্জের ৫ আসনের এম.পি, সাংসদ সদস্য সেলিম ওসমান।
তাঁকে যখন এই ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হোলো, তিনি বললেন,- 'তাঁকে (স্যার কমল কান্তিকে) জনরোষ এবং প্রাণে বাঁচাতে কানে ধরে উঠবস করিয়েছি।'
এরকম একটি কথা বলে উনি একই সঙ্গে দুইটি পক্ষকেই তুষ্ট করেছেন।
প্রথমত, হিন্দু এবং বাম ঘরানার লোকেরা ভাবছে, আহা! সত্যিই তো! এম.পি সাহেব না থাকলে হয়তো মৌলবাদি মুসলমানেরা কমল কান্তি ভক্তের গলা কেটে নিয়ে উল্লাস মিছিল করতো। তারচেয়ে কানধরে উঠবস করিয়ে তিনি উনাকে হয়তো এ যাত্রায় প্রাণেই বাঁচিয়েছেন।
দ্বিতীয়ত, তাৎক্ষণিকভাবে কমল কান্তিকে কানে ধরে উঠবস করিয়ে তিনি জনসম্মুখে প্রমাণ

করতে চাইলেন,- 'তুমি বাপু যেই হও, ধর্ম নিয়া কটু কথা বললে কিন্তু ছাড় নাই,হুম।'
অথচ, আমাদের কে বোঝাবে যে, এই আওয়ামিলীগের খেয়ে-পরে বাঁচা লতিফ সিদ্দীকিরা হজ্ব নিয়ে কটুক্তি করে, আবদুল গাফফার চৌধুরিরা সাহাবি হজরত আবু হুরাইরা (রাঃ) কে শয়তানের বাপ বলে,
ইত্তেফাক পত্রিকার সম্পাদক আজানকে 'শব্দদূষণ' বললেও, সেলিম ওসমান গংদের ধর্মীয় অনুভূতিতে তখন আঘাত লাগেনা।
এই রাজনীতি যতদিন না বাঙালি বুঝবে, ততদিন বিপদ কাটবেনা।
তাই, 'তাকে (কমল কান্তিকে) জনরোষের কবল থেকে বাঁচাতে জনসম্মুখে কান ধরে উঠবস করিয়েছি'- এরকম বক্তব্য শোনার পর গুরু সেলিম ওসমানের কাছে আমার খুব করে জানতে ইচ্ছে করে, 'স্যার, রাজনীতির ভেতর পলিটিক্স ঢুকাইলেন, নাকি পলিটিক্সের ভেতর রাজনীতি?'

'রমজানের 'কমন' ভুল......'

রোজা রাখা কিন্তু ইবাদাত না করাঃ

আমাদের অনেকে রোজা রাখি, কিন্তু নামাজ পড়িনা।
এটা আমাদের অনেকের প্রধানতম সমস্যা। কিন্তু আমরা বুঝতেই পারিনা যে, ইবাদাতবিহীন রোজা কেবলই উপোস থাকার শামিল।
রমজান মাস হোলো ইবাদাতের মাস। এ মাস পরবর্তী ১১ মাসের জন্য নিজেকে পরিশুদ্ধ করার মাস। এ মাসের সারমর্মই হোলো 'ইবাদাত'।
কিন্তু আমরা অনেকে রোজা রাখি, নামাজ পড়িনা।

'তাদেরকে (হাশরের মাঠে) জিজ্ঞেস করা হবে,- 'কিসে তোমাদের জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করলো?
তারা বলবে,- 'আমরা নামাজীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না।' (Quran 74: 42-43)

রমজানকে 'অনুষ্ঠান সর্বস্ব' মাস হিসেবে নেওয়াঃ

রমজান মাসকে আমরা যতোটা না **স্পিরিচুয়্যালি** নিই, তার থেকে বেশি নিই **রিচ্যুয়্যালি।**
রমজানে আমরা অনেকে রোজা রাখি জাষ্ট আমাদের চারপাশে অন্যান্যরা রোজা রাখে,তাই।
'পাশের বাসার লোকজন যখন দিনের বেলা আহার পরিত্যাগ করে রোজা রাখছে, তখন আমরা কিভাবে দিনের বেলা খাই?' - এই ইন্টেনশান থেকেই অনেকে রোজা রাখি। মুসলমান হিসেবে একটা যে 'ষ্ট্যাটাস' আছে, সেটা খুঁইয়ে ফেলার ভয়েও অনেকে রোজা রাখি।
কিন্তু এতে তো আমাদের রোজা হয়ই না, উল্টো পাপের বোঝা বাড়াই।

সেহেরি মিস করলে রোজা হবেনা ভেবে রোজা না রাখাঃ

রমজান মাসে এটি একটি বড় ধরনের ভুল। ভুলটা আমরা অনেকেই করি।
দেখা যায়, ঠিক সময়ে ঘুম থেকে জাগতে না পেরে আমরা সেহেরি মিস করে ফেলি আর ভাবি, সেহেরি খেতে না পারলে হয়তো রোজা রাখা যায়না। এটা ভুল। সেহেরি খাওয়া সুন্নত, ফরজ নয়।
আপনি যে রাতে ঘুমানোর আগে সেহেরি খেয়ে রোজা রাখার নিয়্যাত করেছেন, এটাই যথেষ্ট।

সেহেরি মিস হলেও আপনি রোজা রাখতে পারবেন।

থাওয়া-দাওয়া নিয়ে অত্যাধিক বাড়াবাড়িঃ

রমজান মাসে দিনের বেলা আমাদের অর্ধেকের বেশি সময় চলে যায় খাবারের পেছনে। ইফতারে কতো নতুনত্ব আইটেম করা যাবে, এগুলো কিনে আনতে আর রান্না করতে করতেই সময় চলে যায়। অথচ, রমজান মাসের প্রতিটা দিন, প্রতিটা মিনিট, সেকেন্ড খুবই গুরুত্ববহ। এই সময়গুলো কোরআন তিলাওয়াত, নফল নামাজ, তসবি,দরূদ পাঠ ইত্যাদিতে ব্যয় করা উচিত।

বেশি খাওয়াঃ

অনেকের ধারনা, সেহেরিতে এত বেশি পরিমান খেতে হবে যে, যাতে দিনের বেলা ক্ষিধা কম লাগে কিংবা ক্ষিধা অনুভব না হয়।
এটা খুবই হাস্যকর। এতে তো রমজানের মেইন ইন্টেনশান নষ্ট হয়ই, সাথে, এতে করে ইবাদাতেও আলসেমি চলে আসে।
সেহেরি কিংবা ইফতারে অত্যধিক পরিমাণ খাওয়ার পর একজন মানুষের ইবাদাতে সহজেই অনীহা চলে আসবে। শরীর বিছানা চাইবে। ক্লান্তি অনুভব হবে। ঘুম আসবে। তারাবি এবং ফজর মিস হবার সমূহ সম্ভাবনা থাকে।

'ইফতার পার্টি' নাম দিয়ে পার্টি করাঃ

রমজান মাসে একজন-অন্যজনকে ইফতার করানো অবশ্যই কল্যাণকর এবং ভালো। কিন্তু এটাকে গতানুগতিক 'পার্টি' বানিয়ে হৈ-হুল্লোড় করা, ছেলে-মেয়ে একসাথে হয়ে যাওয়া **সম্পূর্ন হারাম।** এতে কোন কল্যাণ নেই এবং এটি ইসলামের কোন রীতি-রেওয়াজের মধ্যে পড়েনা। পার্টি দিতে গিয়ে দেখা যায় মাগরিব সালাতটাই মিস হয়ে যায়।

সারাদিন ঘুমানোঃ

রমজান মাসে অনেকেই ক্ষিধার তাড়না থেকে বাঁচতে কিংবা কোনরকমে দিনটা পার করে দিতে পুরোদিন ঘুমায়।
এটা কি রমজান মাসের উদ্দেশ্য? এতে করে রোজা রাখা হয় নাকি উপোস থাকা হয়? আল্লাহ তা'লা কি আমরা কতক্ষন না খেয়ে থাকছি সেটা দেখার জন্যে রমজান মাসে রোজা ফরজ করেছেন? নাকি কিভাবে পার করছি সেটা দেখার জন্যে?

কাজ/পরীক্ষার কারনে রোজা ছেড়ে দেওয়াঃ

অনেক পরীক্ষার্থী এবং তাদের অভিভাবকগণ এই ভুলটা করে থাকে।পরীক্ষার জন্য রোজা ছেড়ে দেয়।এটার অনুমতি ইসলামে নেই।
যত কঠিন পরীক্ষা কিংবা কাজই থাকুক, শারীরিক ভাবে সুস্থ এবং উপযুক্ত (যার উপরে রোজা ফরজ হয়েছে) ব্যক্তি মাত্রই রোজা রাখতে বাধ্য।কোন ছাড় নেই।মনে রাখতে হবে, রমজান মাসে রোজা রাখাটা শ্বাস-নিশ্বাস নেওয়ার মতোই ফরজ।

ধূমপানঃ

ধূমপান সহ সকল প্রকার তামাক জাতীয় দ্রব্যই ইসলামি শরীয়াহ মতো হারাম।
আমাদের অনেকেই ইফতারের পরে একনাগাড়ে ২-৩ টা সিগারেট টেনে কোনরকমে কুলি করে মাগরিব পড়তে দাঁড়াই, অথবা, পুরোদিন খাওয়া যাবেনা বলে সেহেরির পর একনাগাড়ে ৪-৫ টা সিগারেট খাই। এরপর কোনরকমে অজু করে নামাজে দাঁড়াই।এতে করে মুখ থেকে সিগারেটের দূর্গন্ধ যায়না।ফলে ইবাদাত নষ্ট হয়।

দেরি করে ইফতার করাঃ

এটা একটা কমন ভুল রমজানে।অনেকেই যতক্ষন পর্যন্ত আজান না শোনা যাচ্ছে বা শেষ না হচ্ছে, ততক্ষন পর্যন্ত ইফতার করেনা।
এটা ভুল। ইফতারের সময় হয়ে গেলেই ইফতার করে নেওয়া যায়।
রাসূল (সাঃ) বলেছেন, -'তারা উন্নতি করতে থাকবে, যারা ইফতারে বিলম্ব করবেনা।'(বুখারি, ১৯৫৭)

দোয়া কবুলের সুবর্ণ সুযোগ নষ্ট করাঃ

রাসূল (সাঃ) বলেছেন, -'তিন ব্যক্তির দোয়া ফিরিয়ে দেওয়া হয়না।
১/ একজন পিতার দোয়া।
২/ একজন রোজাদারের দোয়া।
৩/ একজন সফরকারীর দোয়া।- (আল বায়হাক্কী)

ইফতারের পূর্ব মূহূর্তটি হচ্ছে দোয়া কবুলের একটি সুবর্ণ মূহূর্ত।এই সময় যে দোয়া করা হয়, তাই-ই কবুল হয়।

কিন্তু আপসোস! আমরা অধিকাংশই এই সময়টা নষ্ট করি চমুচা ভাজতে, ছোলা-মুড়ি ভাজতে। টেবিল সাজাতে কিংবা হৈ-হুল্লোড় করতে করতে।

তারাবীহ এর রাকাত নিয়ে বাড়াবাড়ি করাঃ

বস্তুতপক্ষে তারাবীর সালাতের নির্দিষ্ট কোন সংখ্যা নেই। কেউ ইচ্ছে করলে আট রাকাত পড়তে পারে, কেউ ২০ রাকাত পড়তে পারে,অথবা কেউ ১০০ রাকাতও পড়তে পারে। ধরা-বাধা নেই। এটা নিয়ে ঝগড়া-ঝাটি করা কেবলই মূর্খামির শামিল।

কেবল ২৭ শে রমজানে লাই লা'তুল ক্ব'দর তালাশ করাঃ

ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলিমরা এই কমন ভুলটা সব'চে বেশি করে থাকে।
তারা ধরেই নেয় যে, লাই লা'তুল ক্ব'দর ২৭ শে রমাজান দিবাগত রাতেই হয়ে থাকে।
অথচ, এ ব্যাপারে রাসূল (সাঃ) থেকে প্রমানিত একটি হাদীসই নেই।
রাসুল (সাঃ) শেষ দশ রমজানের বিজোড় রাতগুলোতে ক্ব'দরের রাত তালাশ করতে বলেছেন। তিনিও রমজানের শেষ দশ রাত্রে পরিবার-পরিজন নিয়ে বেশি বেশি রাত জাগতেন আর ইবাদাত করতেন।
স্পেশেফিক ২৭ শে রমজানকে ঘিরে আমাদের দেশে ইবাদাতের যে রেওয়াজ প্রচলিত, তা বি'দাত।

শপিংয়ের ফাঁদে ক্ব'দর মিসঃ

রমজানের শেষ দশ রাতে বাঙালি মুসলিম সমাজ, বিশেষ করে মেয়েরা, শপিং নিয়ে এতটাই ব্যাতি-ব্যস্ত হয় যে, ক্বাদর তো দূর, ফরজ নামাজগুলোও শপিংমল গুলোতে চলে যায়।
ঠিক যে কারনে রমজানের আগমন, তা ব্যাহত হয়।

আমরা চেষ্টা করবো এই ভুলগুলো কাটিয়ে পুরো রমজান মাসটিকে কাজে লাগাতে।

'পিঁপড়া বিদ্যার ইতিকথা'

প্রাণী জগতে মানুষকেই ভাবা হয় সবচে বুদ্ধিমান।
মানুষ সংঘবদ্ধ ভাবে বসবাস করে। মানুষ কথা বলে। হাসে, কাঁদে, খেলে, তামাশা করে। মানুষ কষ্ট পায়। মানুষ 'ভাষা' ব্যবহার করে, বর্ণমালা আবিষ্কার করে। মানুষ সুউচ্চ অট্টালিকা বানায়। মানুষ প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে সবকিছুকে করে তুলেছে আরো সহজ থেকে সহজতর....
মানুষ যুদ্ধ করে, অস্ত্র বানায়। একে-অন্যের উপর হামলে পড়ে...

কাজী নজরুল একটা সময়ে বসে লিখেছিলেন মানুষের কথা, মানুষের আকাঙ্ক্ষার কথা।
বলেছিলেন- "পাতাল ফেড়ে নামব আমি
উঠব আমি আকাশ ফুঁড়ে,
বিশ্বজগৎ দেখব আমি
আপন হাতের মুঠোয় পুরে।"

ঠিক ঠিক মানুষ পাতাল ফেড়ে নেমে গেছে। আকাশ ফুঁড়েও দিব্যি সে চষে বেড়াচ্ছে মহাশূন্যে।
মোবাইল, কম্পিউটার, ইন্টারনেট আর সোশ্যাল নেটওয়ার্কিংয়ের মাধ্যমে বিশ্বজগতকে সে সত্যি সত্যিই হাতের মুঠোয় ভরে নিয়েছে।
বাংলাদেশে বসে সে যেন নিউ ইয়র্কের ভোরের স্বাদ নিতে পারে.....
ঢাকার বেইলী রোডে বসেও সে যেন মিশে আছে বার্সেলোনার ন্যু ক্যাম্পে। মিনিট টু মিনিট নয়, ন্যানো সেকেন্ডের মধ্যেই সে পেয়ে যাচ্ছে সমস্ত আপডেট...

আচ্ছা, মানুষ যদি দেখে, তার চেয়ে ক্ষুদ্র কোন প্রাণী, ঠিক তার মতোই বুদ্ধিমান, তাহলে কেমন হবে?
অর্থাৎ, সেই অতিকায় ক্ষুদ্র প্রাণীটাও কথা বলে। হয়তো 'ভাষা', 'বর্ণমালা' ব্যবহার করে। তারাও সংঘবদ্ধভাবে সমাজে বসবাস করে। চাষাবাদ করে। খাদ্য মজুদ করে। অসাধারণ সব কারুকার্যময় ঘরবাড়ি তৈরি করে। তারা যুদ্ধ করে। কেউ নিহত হলে তাকে দাফন করে ইত্যাদি?
ভাবছেন এরা আবার কারা, তাই না? এলিয়েন নাকী?
একদম না৷ এলিয়েন হলে তো অবাক হওয়ার কিছুই ছিলো না। কিন্তু এতোক্ষণ যে ক্ষুদ্র প্রাণীটার বর্ণনা দিলাম সেটা কোন এলিয়েন নয়, অন্য গ্রহের কোন প্রাণীও নয়৷ সেটা হলো সকলের পরিচিত, অতিকায় ক্ষুদ্র জীব- পিঁপড়া........

অবাক হলেন, তাই না? হবার মতোই...
পিঁপড়ার শরীর, ব্রেইন, ব্রেইনের সাইজ, কাজ এবং বুদ্ধির সাথে কম্পেয়ার করলে মাঝে মাঝে মানুষকে আপনার তুচ্ছই মনে হবে।

একটা সময়ে মনে করা হতো, পিঁপড়া কথা বলতে পারেনা। পিঁপড়াকে তখনো অবশ্য আলাদা করা হয় নি। ভাবা হতো, কীট পতঙ্গ শ্রেণী কথা বলতে পারেনা।
পিঁপড়ার ব্যাপারে কিছু বছর আগেও শুধু এটুকু জানা ছিলো যে- পিঁপড়া কেবল তাদের শরীর থেকে নিঃসারিত 'ফেরোমন' নামের রাসায়নিক পদার্থের মাধ্যমে নিজেদের কর্ম সম্পাদন করে।
আমরা যে পিঁপড়াদের লাইন ধরে সারিবদ্ধভাবে চলতে দেখি, তা এই পদার্থের কারণেই।
পিঁপড়া যে কথা বলতে পারে, বা কথা বলে- এ কথা আমরা তখন স্বপ্নেও ভাবি নি।
রূপকথার গল্পের মতো শোনালেও সত্য এই যে- পিঁপড়া সমাজ কথা বলতে পারে। তারা শব্দ করেই কথা বলে। হয়তো বা তাদের নিজস্ব ভাষা আছে, বর্ণমালা আছে।

ব্রিটিশ এবং স্প্যানিশ বিজ্ঞানীরা একটা এক্সপেরিমেন্ট করলো এটার উপরে। তারা করলো কী, ৪০০ লাল পিঁপড়ার ঘরের মধ্যে 4 mm এর মাইক্রোফোন এবং স্পীকার বসিয়ে দিয়ে আসলো।
দেখা গেলো, পিঁপড়াগুলো বেশ কয়েক ধরণের শব্দ করলো। সেই শব্দ রেকর্ড করা হলো। সেই রেকর্ড অন্য কর্মী পিঁপড়াদের কাছে নিয়ে অন করা হলে দেখা গেলো, কর্মী পিঁপড়াগুলো সেই আওয়াজ শুনে ছুটোছুটি শুরু করে। তারা বিভিন্ন রকম এক্সপ্রেশান দেখাতে আরম্ভ করে।
অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির প্রফেসর Jermey Thomas, যিনি এই এক্সপেরিমেন্ট পরিচালনার একজন, তিনি বলেন,- 'When we played the queen sounds they (other ants) did "en garde" behaviour'

'They would stand motionless with their antennae held out and their jaws apart for hours --the moment anyone goes near they will attack.'

'Our study shows for the first time that different members make different sounds and that the sounds result in different behaviour.' (১)

শুধু তা-ই নয়, পিঁপড়ারা যে কথা বলে বা বলতে পারে, তার উপরে ABC News একটি ডকুমেন্টারি তৈরি করেছে। (২)

মজার ব্যাপার হচ্ছে, পিঁপড়ার কথা বলতে পারাটা একটা সময় অবিশ্বাস্য ঠেকলেও, এখন তা বাস্তব।
কিছু বছর আগেও আমরা এমনটি ভাবতে পারিনি। পিঁপড়ার কথা বলাটা কেমন যেন রূপকথার গল্পের মতো যেখানে সব-ই সম্ভব।
আরো অবাক করা ব্যাপার, পিঁপড়ারা যে কথা বলার ক্ষমতা রাখে বা কথা বলতে পারে, সেটা আমরা পবিত্র আল কোরআনেও দেখতে পাই।

আজ থেকে সাড়ে ১৪০০ বছর আগে নাজিল হওয়া একটি কিতাবে উল্লেখ করা আছে যে 'পিঁপড়া কথা বলছে'। ব্যাপারটা দারুন না? এই তো সেদিন, গুনে গুনে হয়তো কয়েক বছর আগেই বিজ্ঞানীরা এই তথ্য বের করেছে যে পিঁপড়াও কথা বলে।
কিন্তু সাড়ে ১৪০০ বছর পুরোনো কোন কিতাবে যদি সেটার উল্লেখ থাকে, ব্যাপারটা কেমন দাঁড়ায়?
আলহামদুলিল্লাহ্।

বলা হচ্ছে,- 'যখন তাঁরা (সুলাঈমান আঃ এবং তাঁর বাহিনী) পিঁপড়ার উপত্যকায় পৌঁছালো, তখন একটি পিঁপড়া (সুলাঈমান আঃ এবং তাঁর বাহিনীকে আসতে দেখে) বলে উঠলো,- 'হে পিঁপড়ার দল, তোমরা নিজেদের গৃহে ঢুকে পড়ো, যাতে অজ্ঞাতঃবসত (না দেখতে পেয়ে) তাঁরা (সুলাঈমান বাহিনী) তোমাদের পিঁষে না দেয়।'- সূরা আন নামল ১৮

কিছু বছর আগেও কেউ এই আয়াত দেখে ব্যঙ্গভরে বলতো,- 'এটা কী ধর্মীয় কিতাব নাকী রূপকথার বই যেখানে পিঁপড়াও কথা বলে?'
কিন্তু আজকের সময়ে দাঁড়িয়ে, বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব কল্যাণের মাধ্যমে আমরা জানতে পারছি, কোরআন পিঁপড়ার কথা বলার ব্যাপারে যে তথ্য দিয়েছে, তা বিজ্ঞানসম্মত, প্রমাণিত....

শুধু কী তাই? বিজ্ঞান প্রমাণ করে দেখিয়েছে যে, পিঁপড়া তথা পতঙ্গ শ্রেণীর প্রধাণ থাকে স্ত্রী পতঙ্গ।
মৌমাছির উপর গবেষণা করে নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী Karl Von Frinch তা প্রমাণ করেছিলেন।
আল কোরআনের সূরা নমলের ১৮ নম্বর আয়াতে যে পিঁপড়ার কথা বলার ব্যাপারে বলা হয়েছে, **এ্যারাবিক গ্রামারের দিক থেকে তার জন্য স্ত্রী লিঙ্গ ব্যবহার করা হয়েছে।**
অর্থাৎ, যে পিঁপড়াটি অন্য পিঁপড়াদের সুলাঈমান আ: এবং তাঁর বাহিনী আগমনের সংবাদ দিচ্ছিলো, সেটি নিশ্চই দলের প্রধাণ এবং তাঁর নির্দেশ পালনে সবাই বাধ্য। এবং এই পিঁপড়ার জন্য কোরআন স্ত্রী লিঙ্গ ব্যবহার করেছে।
আলহামদুলিল্লাহ্, আজকে আমরা জেনেছি, পিঁপড়াদের দলনেতা হয় স্ত্রী পিঁপড়া....

এখানেই শেষ নয়। কোরআন যেখানেই বুদ্ধিমান প্রাণীর কথা বর্ণনা করেছে, সেখানেই পুংলিঙ্গ ব্যবহার করেছে।
মানুষের মতো বুদ্ধিমান প্রাণীকে নির্দেশ করার সময় 'ইয়া আইয়্যুহা' বলে সম্বোধন করেছে। এটা এমন একটা সম্বোধন, যা বুদ্ধিমান এবং বোধ সম্পন্ন শ্রেণীর জন্য ব্যবহৃত। এমনকি, নবীদের সম্বোধনের জন্যও এটা ব্যবহার হয়েছে। বলা হয়– 'ইয়া আইয়্যুহান নাবিয়্যু'- (হে নবী') ....
ঠিক এই সম্বোধনটি মহিলা পিঁপড়াটি অন্য পিঁপড়াদের নির্দেশ দেওয়ার জন্য ব্যবহার করেছে। বলা হয়েছে– 'ইয়া আইয়্যুহান নামালতু'- হে পিঁপড়ার দল'....
এই সম্বোধন থেকে বোঝা যায়, পিঁপড়াও মানুষের মতো বোধ সম্পন্ন। মানুষের মতো কথা বলতে পারে। সংঘবদ্ধভাবে বসবাস করে ইত্যাদি...
আয়াতের পরের শব্দে পিঁপড়াদের গর্তে ঢুকে পড়ার জন্য যে 'উদখুলু' শব্দ ব্যবহার করা

হয়েছে, এটাও একটা ইউনিক শব্দ। আল কোরআনের অসংখ্য জায়গায় মানুষকে নির্দেশ দানের ক্ষেত্রে এই শব্দের ব্যবহার আছে। আল কোরআনের শব্দ ব্যবহারের এই ধারা থেকে বোঝা যায়, পিঁপড়ারাও বোধ সম্পন্ন মানুষের মতো, যে রহস্য বিজ্ঞান আজ আমাদের সামনে উন্মোচিত করেছে...

ক্যামব্রিজ এবং হার্ভাড প্রেস থেকে ১৯৯০ সালে প্রকাশিত, Bert Hölldobler এবং Edward O. Wilson তাদের বই 'The Ants' এর ২৭ পৃষ্টায় লিখেন,- 'মানুষের জীবনযাত্রার সাথে সবচে যে পতঙ্গের জীবন সাদৃশ্যপূর্ণ, সেটা হলো পিঁপড়া..'

Bert Hölldobler, Edward O. Wilson এর বই 'The Ants' এবং Dr. Eleanor এর 'Book Of Common Ants' পড়লে আপনি জানতে পারবেন আরো বিশদভাবে যে, পিঁপড়াদের কলোনী আছে, তাঁরা চাষাবাদ করে, কথা বলে, ফ্রি টাইম পাস করে, এমনকি, তাদের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহও বিদ্যমান।

পিঁপড়াদের এই বোধ আছে বলেই আল কোরআন মানুষের জন্য ব্যবহৃত শব্দ তাদের জন্যও ব্যবহার করেছে। আল কোরআন সাড়ে ১৪০০ বছর আগে যে ইঙ্গিত দিয়ে রেখেছে, তা বর্তমান বিজ্ঞান প্রমাণ করে চলেছে মাত্র।

আল কোরআন একটি আয়াতে যা যা বুঝালো, ঠিক সেগুলো বর্ণনার জন্যই হার্ভাড-ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে হাজার হাজার পৃষ্টার বই লেখা হচ্ছে এখন।

সুতরাং,, 'তারা কী কোরআন সম্পর্কে গভীর চিন্তা-ভাবনা করেনা? নাকী তাদের অন্তর তালাবদ্ধ?'- সূরা মুহাম্মদ, ২৪....

Open Q&A -1

কিছুদিন আগে একজন পাঠক আমাকে একটি মেইল পাঠিয়েছিলেন। উনার পাঠানো মেইলে আমার জন্য বেশকিছু প্রশ্ন ছিলো। ভদ্রলোক কোন নাস্তিক বা এগনোস্টিক টাইপ কিছু নন। কেবল কিছু ব্যাপার তিনি বুঝে উঠতে পারছিলেন না বলেই আমাকে লিখেছেন বলে জানালেন।

যাহোক, ভদ্রলোককে কথা দিয়েছিলাম সময় করে উনাকে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবো। কিন্তু মাঝখানে রমজান, নিজের অসুস্থতা, রোহিঙ্গাদের নিয়ে কিছু কাজে লেগে পড়ায় আর উত্তর করা সম্ভবপর হয়ে উঠেনি।

উনার করা প্রশ্নগুলোর প্রতিটি বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের দাবি রাখে। সবগুলো প্রশ্নের উত্তর একসাথে দেওয়াও সম্ভব না। ভাবলাম, একটি একটি দেওয়া যাক।

উনার প্রথম প্রশ্ন ছিলো এরকম,- 'সূরা বাকারার শুরুর দিকে ফেরেস্তাদের সাথে আল্লাহর কথোপকথনের কিছু অংশ আমরা দেখতে পাই। সেখানে দেখা যায়, ফেরেস্তা এবং হজরত আদম (আঃ) এর মধ্যে একটি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

দেখা যায়, আল্লাহ প্রথমে আদম (আঃ) কে সব জিনিসের নাম শিখিয়ে দেন। এরপর জিনিসগুলো ফেরেস্তাদের কাছে ধরে সেগুলোর নাম জিজ্ঞেস করেন। ফেরেস্তারা বলতে পারেনা। ফেরেস্তারা ব্যর্থ হলে আল্লাহ তা'লা আদম (আঃ) এর কাছে সেগুলোর নাম জানতে চান। দেখা গেলো, ফেরেস্তারা না পারলেও, আদম (আঃ) সব জিনিসের নাম ঠিকঠাক বলতে পেরেছেন।'

এমতাবস্থায়, উনার প্রশ্ন হচ্ছে- আল্লাহ কী এখানে পক্ষপাতিত্ব করলেন না? উনি জিনিসের নাম শিখালেন আদম (আঃ) কে, অথচ পরীক্ষা নিলেন ফেরেস্তাদের কাছ থেকেও। যেহেতু ফেরেস্তাদের সেসব জিনিসের নাম শেখানো হয়নি, সেহেতু তারা তার উত্তর দিতে পারার কথা নয়। আদম (আঃ) কে আগে শিখিয়ে দিয়ে বিজয়ী করে দেওয়াটা কী ফেরেস্তাদের সাথে অন্যায় করা হলো না?

খুবই সুন্দর প্রশ্ন এটি। আমরা প্রথমে আয়াতগুলো দেখি, এরপর আলোচনায় আসা যাবে...

[আল বাকারা- ৩০]

'স্মরণ কর, তোমার প্রতিপালক যখন ফেরেশতাদেরকে বললেন, 'আমি যমীনে প্রতিনিধি সৃষ্টি করছি'; তারা বলল, 'আপনি কি সেখানে এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন যে অশান্তি করবে ও রক্তপাত ঘটাবে? আমরাই তো আপনার প্রশংসামূলক স্তুতিগান ও পবিত্রতা ঘোষণা করি'। তিনি বললেন, 'আমি যা জানি, তোমরা তা জান না'।

[আল বাকারা- ৩১]

‘এবং তিনি আদম (আঃ) কে সকল বস্তুর নাম শিক্ষা দিলেন, তারপর সেগুলো ফেরেশতাদের সামনে উপস্থাপন করলেন এবং বললেন, ‘এ বস্তুগুলোর নাম আমাকে বলে দাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হও’।

[আল বাকারা-৩২]

‘তারা বলল, ‘আপনি পবিত্র মহান, আপনি আমাদেরকে যা শিক্ষা দিয়েছেন, তাছাড়া আমাদের কোন জ্ঞানই নেই, নিশ্চয়ই আপনি সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়’।

[আল বাকারা-৩৩]

‘তিনি নির্দেশ করলেন, ‘হে আদম! এ জিনিসগুলোর নাম তাদেরকে জানিয়ে দাও’। যখন সে এ সকল নাম তাদেরকে বলে দিল, তখন তিনি বললেন, ‘আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে, নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের অদৃশ্য বস্তু সম্পর্কে আমি নিশ্চিতভাবে অবহিত এবং তোমরা যা প্রকাশ কর ও গোপন কর, আমি তাও অবগত’?

আয়াতগুলো থেকে আপাতঃ বোঝা যায় যে, আসলেই এখানে মনে হয় ফেরেস্তাদের সাথে একটু অন্যায় করা হয়েছে (নাউজুবিল্লাহ)।
কারণ, জিনিসের নাম শেখালো আদম (আঃ) কে, কিন্তু পরীক্ষাটা নেওয়া হলো ফেরেস্তাদের থেকেও সমানভাবে। দ্যাট'স নট ফেয়ার!

কিন্তু, এই আয়াত আমরা পড়তে গিয়ে জেনারেলি ভুল ভেবে বসি বা বুঝে উঠতে পারিনা, কারণ- আমরা ফেরেস্তাদের মেকানিজম সম্পর্কে জানি না।
ফেরেস্তাদের মেকানিজম হচ্ছে- তারা আল্লাহর বিশেষ একটি সৃষ্টি। তাদের মধ্যে কোন স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি নেই। তারা শুধু ততোটুক জানতে পারে, যতোটুকু জানার পারমিশান বা এখতিয়ার তাদের আছে। এর বাইরে বিন্দুমাত্র কিছুও তারা জানতে পারেনা বা বুঝতে পারে না।
ব্যাপারটা আরো খোলাসা করার জন্য আমরা রোবটের কথা চিন্তা করতে পারি। একটা রোবটের মধ্যে ঠিক যেরকম প্রোগ্রাম সেট করা থাকে, রোবটটি ঠিক সেরকম কাজই করতে পারে। এর বাইরে নতুন বা ভিন্ন কিছু করার ক্ষমতা একটি রোবটের থাকে না।
ফেরেস্তাদের ক্ষেত্রেও ঠিক এরকম। তাদের ঠিক ততোটুকুই জানার আর বোঝার অধিকার, যতোটুকু জানার বা বোঝার পারমিশান তাদের আছে।
ইবাদাতের ক্ষেত্রে ফেরেস্তাদের স্থান অবশ্যই মানুষের চেয়ে অনেক উঁচুতে। কিন্তু জ্ঞানের ক্ষেত্রে মানুষের স্থান ফেরেস্তাদের চাইতে উঁচুতে।
এবং, **ইসলামে ইবাদাতের আগে জ্ঞানটাকেই বেশি প্রায়োরিটি দেওয়া হয়।** এজন্য সৃষ্টির সেরা জীব মানুষ, ফেরেস্তা নয়। কারণ, জ্ঞানের ক্ষেত্রে মানুষ ফেরেস্তার চেয়ে এগিয়ে। এজন্যই কোরআনের প্রথম শব্দ 'আক্কীমুছ সালাত' নয়, কোরআনের প্রথম শব্দই হলো 'ইক্বরা'....
প্রথমেই পড়ার কথা, নামাজ বা ইবাদাতের কথা নয়...

যাহোক, মূল আলোচনায় আসি।
এখানে কী আল্লাহ ফেরেস্তাদের সাথে কোন অন্যায় করেছেন? কোন পক্ষপাত?
উত্তর হচ্ছে- একদম না।
এটা মূলত আমাদের বোঝার ভুল।
সূরা বাকারার ৩০-৩৩ নম্বর আয়াতগুলোতে আরেকবার নজর দিন। দেখুন, সেখানে পৃথিবীতে খলিফা হিসেবে আদম (আঃ) কে সৃষ্টির কথোপকথন থেকে শুরু করে ফেরেস্তাদের কর্তৃক আদম (আঃ) কে সিজদা দেওয়ার ঘটনা পর্যন্ত, সবকিছুই কিন্তু ওপেন হচ্ছে। অন্য দৃশ্যপটে আল্লাহ তা'লা, ফেরেস্তা এবং আদম (আঃ) সবাই কিন্তু উপস্থিত।
এমতাবস্থায়, আল্লাহ কিন্তু আদম (আঃ) কে জিনিসের নামগুলো গোপনে শিক্ষা দেন নি। ফেরেস্তাদের সামনেই শিখিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে, ফেরেস্তাদের মেকানিজমে সেই নামগুলো ক্যাচ করার মতো এবং স্মৃতিতে ধারণ করার মতো কোন প্রোগ্রাম সেট করা নেই। কিন্তু আদম (আঃ) কে ঠিক সেই মেকানিজমে তৈরি করা হয়েছে। ফলে, ফেরেস্তারা শুনেও ক্যাচ করতে পারেনি বা স্মৃতিতে ধারণ করে রাখতে পারেনি। কিন্তু আদম (আঃ) পেরেছিলেন। এই কারণে আদম (আঃ) অনন্য....
আল্লাহ তা'লা ফেরেস্তাদের সামনে ঠিক এই পার্থক্য রেখাটি টেনে দেওয়ার জন্যই এমনটি করেছেন।
উনি বোঝালেন- 'দেখো, তোমাদের মেকানিজমের চেয়ে আদমের মেকানিজম আলাদা। তোমরা যা এইমাত্র শুনেও স্মৃতিতে ধারণ করতে পারলে না, আদম তা পারলো। সুতরাং, আমার সৃষ্টির মধ্যে আদম তোমাদের চেয়ে সেরা।'

ফেরেস্তাদের যে নির্দিষ্ট বিষয়ের বাইরে জানার অধিকার বা ক্ষমতা নেই, তা তাদের জবানেই ফুটে উঠেছে ৩২ নাম্বার আয়াতে, যখন তারা বললো- 'তারা বললো, 'আপনি পবিত্র! মহান! আপনি আমাদেরকে যা শিক্ষা দিয়েছেন, তাছাড়া আমাদের আর কোন জ্ঞানই নেই'

অর্থাৎ, তাদের মেকানিজম অনুযায়ী তারা তাদের মধ্যে সেট করা প্রোগ্রামের বাইরের কিছুই জানতে পারবে না। আদম (আঃ) কে যে নামগুলো শেখানো হচ্ছিলো ওপেনলি, সেসব ফেরেস্তারা শুনেও বুঝতে পারেনি, এবং স্মৃতিতে ধারণ করতে পারেনি। এটাই হচ্ছে ফেরেস্তা এবং আদম (আঃ) এর মধ্যে পার্থক্য। আর এটা প্রমাণ করে হাতে কলমে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্যই এই পরীক্ষার ব্যবস্থা...
এতে করে কোনভাবেই এটা বোঝার সুযোগ নেই যে, আল্লাহ ফেরেস্তাদের সাথে অন্যায় করেছেন বা পক্ষপাতিত্ব করেছেন।
বরং আসল ব্যাপার এটাই যে, আল্লাহ ফেরেস্তাদেরকে তাদের লেভেলটা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন এটার মাধ্যমে...

এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে মুফতি তাক্বী উসমানির 'তাফসীরে তাওযীহুল কোরআন' এবং মাওলানা মওদূদীর 'তাফহিমুল কোরআন' দেখতে পারেন।

Allah knows best....

তিনি দেখছেন

ক্যামেরা আবিষ্কারের আগ পর্যন্ত মানুষ ভাবতেই পারতো না যে তার অতিক্রম করে আসা মূহুর্তগুলোকে চাইলেই ফ্রেমে বন্দী করে রাখা যায়।
তার চলা-ফেরা, তার ভালো লাগা-মন্দ লাগার মূহুর্ত, তার ভালো কাজ - মন্দ কাজের মূহুর্তগুলোকে যে 'রেকর্ড' করে রাখা যায়, সেটা মানুষ ভাবতে পেরেছে মাত্র সেদিন।

এর আগে মানুষের কাছে এই ব্যাপারটা ছিলো একদমই স্বপ্নের মতো। যেমন একসময় স্বপ্নের মতো ছিলো আকাশে উড়তে পারা.....

আজ থেকে ৩০০ বছর আগে কী কেউ একটি ভিডিও ক্যামেরার কথা চিন্তা করতে পেরেছে? অথবা, তার অতিবাহিত সময়কে বন্দী' করে রাখতে পারে এমন কিছুর কথাও কী মানুষ ভাবতে পেরেছে?
আমরা সবাই সি.সি ক্যামেরার ব্যাপারে জানি। অপরাধ আর অপরাধী সনাক্তকরণের কাজে বহুল ব্যবহৃত একটি ছোট্ট সাইজের ক্যামেরা...

কেউ দোকানে আসলো, চুরি করে কিছু নিয়ে গেলো। যদি দোকানের কোথাও লুকানো সি.সি ক্যামেরা থাকে, তাহলে চোরটা আলটিমেটলি ধরা পড়তে বাধ্য। কারণ, চোরটা দোকানে ঢুকার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত যা যা করেছে, তার সব রেকর্ড অই সি.সি ক্যামেরায় ততক্ষণে রেকর্ড হয়ে গেছে।

কোন স্পটে কোন একদল সন্ত্রাসী যদি কাউকে খুন করে দ্রুত পালিয়ে যায়, এবং অই স্পটে যদি একটি সি.সি ক্যামেরা মনিটরিংয়ে থাকে, তাহলে যতো দ্রুতই খুনীটা পালিয়ে যাক না কেনো, সে ধরা পড়তে বাধ্য। কারণ, তার কৃতকর্মের সব রেকর্ড অই সি.সি ক্যামেরা ততোক্ষণে ধারণ করে ফেলেছে।

আজ থেকে ৩০০ বছর আগে, কেউ যদি কাউকে বলতো,- 'তুমি জানো, তুমি অমুক জায়গায় কী কী করেছ, তা আমি চাইলে এক্ষুণি তোমাকে তোমার সামনে রিপিট করে দেখাতে পারি?'
সময়টা যদি ৩০০ বছর আগের হয়, তাহলে দ্বিতীয় জন প্রথম জনের কথা শুনে হো হো হো করে হাসা শুরু করতো। তাকে মানসিক সমস্যাগ্রস্ত, পাগল ভাবতো।
কিন্তু আজকের সময়ে বসে কী কেউ সেরকম করবে?
কেউ যদি এসে ৫ বছর আগের আমার বিয়ের একটা ভিডিও ফুটেজ আমার হাতে দিয়ে বলে,- 'এই দ্যাখ, ৫ বছর আগে তোর বিয়ের ভিডিও',
তাহলে আমি কী অবাক হবো?
৫ বছর আগে আমি আরো শুকনা ছিলাম। গায়ের রঙ আরেকটু উজ্জ্বল ছিলো। এখনকার মতো ভূড়ি ছিলো না। সেই ৫ বছর আগের 'আমি' কে ভিডিওতে নড়তে-চড়তে, কথা বলতে

দেখলে কী আমি বিস্ময়ে হতবাক হবো? মোটেও না। এটা আমার জন্য খুবই সাধারণ একটি ব্যাপার।
কিন্তু আমার জন্য যা সাধারণ, তা আজ থেকে ৩০০ বছর আগের মানুষের জন্য রূপকথা তুল্য।

আজ থেকে সাড়ে ১৪০০ বছর আগে বলা হচ্ছে–

'অতএব. কেউ অণু পরিমাণ সৎ কাজ করলে তা সে (হাশরের ময়দানে) দেখবে এবং কেউ অণু পরিমাণ অসৎ কাজ করলে তাও সে (সেদিন) দেখবে'- সূরা যিলযাল (৭–৮)

কোরআন যখন এই কথাগুলো বলছে, তখন পৃথিবীতে ক্যামেরা আবিষ্কার হয়নি।
কেউ অণু পরিমাণ সৎ কাজ করলে তাকে তা রিপিট করে কীভাবে দেখানো সম্ভব?
তার সামনে যদি লিখিত রেকর্ড আনা হয়, এবং বলা হয়,- 'দ্যাখো, তুমি যা যা করেছ, তার সবটাই এখানে টুকে রাখা আছে।'
সে বলতে পারে,- 'না তো। আমি তো এসব করিনি। এসব বানোয়াট, মিথ্যা। বাড়িয়ে লেখা হয়েছে।'
কিন্তু তার সামনে যদি একটি ভিডিও প্লে করে দেওয়া হয়? তার কৃতকর্মের ভিডিও?
সে কতোবার সুদ খেয়েছে, ঘুষ খেয়েছে, কতো রাকাত নামাজ ছেড়ে দিয়েছে, সে কতোবার ব্যাভিচারে লিপ্ত হয়েছে, কতোবার মিথ্যা বলেছে তার সব যদি ভিডিওটাতে সে দেখতে পায়, তার কী অভিযোগের আর বাহানা থাকতে পারে? পারেনা।
আল্লাহও বলছেন,- 'কেউ অণু পরিমাণ সৎ কাজ করলে তা তাকে দেখানো হবে, এবং কেউ অণু পরিমাণ অসৎ কাজ করলে তাও তাকে দেখানো হবে।'

এই আয়াত যখন নাজিল হচ্ছে, তখন যেহেতু প্রযুক্তি ছিলোনা, ক্যামেরা, ভিডিও এসবের কনসেপ্ট ছিলোনা, তখন মানুষ চাইলেই এই আয়াত শুনে মুহাম্মদ (সাঃ) কে নিয়ে হাসাহাসি করতো।
বলতো,- 'দ্যাখো, আমাদের কাজগুলো নাকী আমাদের মৃত্যুর পরে আবার আমাদের দেখানো হবে। এটাও কী সম্ভব? হাহাহা।'
তাদের জন্য এটা করা যুক্তিযুক্ত ছিলো। কারণ তারা তখন জানেইনা যে, এটাও (ভিডিও রেকর্ড) চাইলে সম্ভব, এবং পরবর্তীতে দেখানোও সম্ভব।

তারা কী হাসাহাসি করেছিলো? হ্যাঁ, করেছিলো।
যারা ঈমান আনতে পারেনি, তারা এই কথা শুনে নিশ্চই হেসেছিলো। তারা আল্লাহর রাসূলকে পাগল, উন্মাদ বলতো।
কিন্তু যারা ঈমাণ এনেছিলো আল্লাহর উপর, আল্লাহর কিতাবের উপর, তাদের কাছে এসব ক্যামেরা সম্পর্কে, অত্যাধুনিক প্রযুক্তি সম্পর্কে জ্ঞান না থাকা সত্ত্বেও তারা অবিশ্বাস করেনি। তারা যখন শুনলো, তৎক্ষণাৎ মেনে নিলো। তারা অন্যদের মতো অবিশ্বাস করেনি। হাসাহাসি করেনি। বলেনি,- 'আরে এটা কীভাবে সম্ভব? এভাবেও হয় নাকী? মুহাম্মদ সাঃ কে বিশ্বাস

করি বলে কী তার সব আজগুবি কথাতেও বিশ্বাস করতে হবে?'
নাহ। তারা সেরকম বলেনি। কোরআনের ভাষায়- 'আমরা শুনলাম এবং মেনে নিলাম।'
তারা এর পেছনের ব্যাখ্যা খুঁজতে যায় নি,যুক্তি খুঁজতে যায়নি।
তারা শুধু জানতো, যখন এই কিতাবের উপর বিশ্বাস এনেছি, তখন এই কিতাব সত্য।

আজকের অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সময়ে বসে আমরা সূরা যিলযালের সেই আয়াতকে যতোটা ইজিলি বুঝে নিতে পারছি, সাড়ে ১৪০০ বছর আগের মানুষের জন্য সেটা ততোটা সহজ ছিলো না।
তবুও, তারা মেনে নিয়েছে। বিশ্বাস করেছে।
এভাবে, সময় যতো যাবে, কোরআনের কথাগুলো মানুষের কাছে ততো স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হবে।

আমাদের সমস্যা হলো, আজকের দিনে আমরা যখন কোরআনের কোনকিছু বুঝিনা বা বুঝে উঠতে পারিনা, তখন আমরা সেটাকে কোরআনের সীমাবদ্ধতা ধরে নিই। সন্দেহবাদী হয়ে যাই।
কিন্তু বোঝার চেষ্টা করিনা যে, বুঝতে না পারাটা নিতান্তই আমার ব্যর্থতা, আমার সীমাবদ্ধতা।, কোরআনের নয়।
১৪০০ বছর আগে সূরা যিলযালের এই আয়াত পড়ে মুমিনরা সন্দেহে পড়ে যায় নি। কারণ, অন্তরের গভীরে তারা বিশ্বাস করতো, এ কোরআন ধ্রুব, সত্য....

যে বইটি আপনাকে পড়ে

আল কোরআনের একটি অন্যতম মুজিযা হচ্ছে এই, আপনি যখন এটি তিলাওয়াত করতে যাবেন, তখন আপনার মনে হবে,- 'আরে, এই কথাটি মনে হচ্ছে আমাকে উদ্দেশ্য করেই বলা।'

হ্যাঁ। আল কোরআনের কথাগুলো এতোটাই জীবন্ত যে, আপনার মনে হবে আপনার বর্তমান অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে এক্ষুণি কেউ হয়তো এই কথাগুলো লিখে দিয়েছে। কিন্তু পরক্ষণেই আপনি যখন অনুভব করবেন যে এই কথাগুলো আজ থেকে সাড়ে চৌদ্দ শতো বছর আগের মরুভূমির তপ্ত বালুময় জায়গার একজন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাবিহীন একজন লোকের উপর অবতীর্ণ, তখন আপনার চোখ দুটো ভিজে আসবে। মনটা শীতল হবে। হৃদয় শান্ত হবে।

কিছু কিছু অভিজ্ঞতার কথা বলি।
আমেরিকা, ঈসরাঈল সহ পশ্চিমা জায়োনিস্টদের ব্যাপারে আমরা সকলেই জানি।
তারা ইরাক, আফগানিস্থান, সিরিয়া, ফিলিস্তিনে বছরের পর বছর ধরে হত্যাযজ্ঞ চালাচ্ছে।
আমাদের মমতাময়ী মা'য়েরা ঠিক যে সময়টায় ইফতারিতে তার প্রিয় সন্তানদের জন্য হরেক পদের খাবার তৈরিতে ব্যাস্ত, ঠিক সেই সময়টায় সিরিয়ার অনেক মা'য়েরা তার প্রিয় সন্তানের লাশ দাফন করার জন্য জায়গা খুঁজতে মরিয়া।

, **ঠিক**

সেই সময়টায় সিরিয়ার অনেক বাবা তার প্রিয় সন্তানের জন্য কাফনের কাপড় কিনতে পারবে কীনা- সেই দুঃখে দুঃখ ভারাক্রান্ত।

আমাদের আদরের ছোট্ট বোনটি যে সময়টায় তার ছোট ছোট হাত দু'টো মেহেদির রঙে রাঙিয়ে লাল টুকটুকে করে রেখেছে, ঠিক সেই সময়টায় সিরিয়াতে ঠিক আমার বোনের বয়সী কারো উপরে বোমা এসে পড়ছে। লণ্ডভণ্ড হচ্ছে তার শরীর। হাত থেকে পা আলাদা হয়ে যাচ্ছে। ঘাঁড় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে তার মাথা। এমনই বিভৎস সেখানকার অবস্থা।
এগুলোর পেছনে আছে আমেরিকা-ঈসরাঈল। আছে ন্যাটো জোট। আছে তাদের শুষে শেষ করে দেবার তীব্র প্রতিযোগিতা।
অথচ, তারা দুনিয়াজুড়ে বলে বেড়ায় তারা নাকী শান্তি চায়। ISIS তৈরি করে, তাদেরকে মুসলিম জঙ্গী সংগঠন বলে চালিয়ে দিয়ে অস্থিতিশীল করে রেখেছে পৃথিবীর পরিবেশ। গত সপ্তাহে 'দ্যা ইন্ডিপেন্ডেন্ট' পত্রিকায় পড়লাম, আমেরিকা ২০১৬ সালে ISIS এর কাছে কয়েকশো কোটি ডলার মূল্যের অস্ত্র বিক্রি করেছে।
এই ISIS নামের সন্ত্রাসী গ্রুপকে চালায় আমেরিকা-ঈসরাঈল। ISIS দমনের নাম করে তারা ইরাক, আফগানিস্তান, সিরিয়ায় প্রতিবছর হত্যা করছে লাখ লাখ নিরীহ মুসলিমদের। ঘরছাড়া

হচ্ছে লাখে লাখে।
কিন্তু, জাতিসংঘে, ওয়ার্ল্ড কনফারেন্সে এই আমেরিকা-ঈসরাঈলের প্রতিনিধিরা, বুশ, ওবামা,ট্রাম্প, নেতানিয়াহুরা কী বলে?
ওরা বলে, ওরা নাকী পৃথিবীতে শান্তি চায় এবং সে লক্ষ্যেই ওরা কাজ করে।
এই কথাগুলো কতোটাই না হাস্যকর! শুনলে গা ঘিনঘিন করে, তাই না?
আপনি তো আমেরিকাকে চিনেন। ঈসরাঈলকে চিনেন। বুশ, টনি ব্লেয়ার, গাদ্দাফি, হোসনে মুবারক, নেতানিয়াহু, ট্রাম্পদের চিনেন।
ওরা যখন বলে, ওরা পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার কাজ করে, তখন কেমন লাগে?

আপনি যখন কোরআন পড়তে বসেন, এবং এই আয়াত "যখন ওদের বলা হয় 'তোমরা পৃথিবীতে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করোনা', তখন তারা বলে,- 'আমরা তো শান্তি প্রতিষ্ঠাকারী মাত্র"।- আল বাক্বারা ১১

কী? বুশ, ট্রাম্প, নেতানিয়াহুদের কথার সাথে মিল পাচ্ছেন? এই আয়াত পড়তে গিয়ে যখন দেখবেন যে, এই কথা, এই চিন্তা আপনার। আপনি বলেন,- 'ব্যাটা ট্রাম্পের বাচ্চা! ওবামার বাচ্চা। সিরিয়া, আফগানিস্তান, ইরাকে বোমা ফেলে আবার বলে- আমরা পৃথিবীতে শান্তি চায়। বদ কোথাকার'।
ঠিক কোরআনও বলছে এই কথা। বলছে, ওদের যখনই পৃথিবীতে ফ্যাসাদ না করতে বলা হয়, ওরা বলে,- 'উহু। আমরা কতো সাধু। আমরা তো শান্তির কথাই বলি।'
এই আয়াত পড়তে গিয়ে অনুধাবন করতে পারেন কোরআনের কথাগুলো কতোটা জীবন্ত।

খুবই হতাশ? বাড়ি ঘর ডুবে গেছে? নদীতে বিলীন হয়ে গেছে? ফসল ডুবে গেছে? সন্তান, বাবা-মা বা ভাই-বোন মারা গেছে? চাকরি হারিয়েছেন? চোখে-মুখে অন্ধকার দেখছেন? ভাবছেন, কেনো আপনার সাথে এসব হচ্ছে?
ভাবতে ভাবতে কোরআন নিয়ে বসলেন।
যখন এই আয়াত চোখে পড়লো- "আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করবো (কখনো) ভয়-ভীতি, (কখনো) ক্ষুধা-অনাহার, (কখনো) তোমাদের জান- মাল ও ফল-ফসলাদির (ব্যবসা বাণিজ্য, চাকুরী ইত্যাদি) ক্ষতি সাধনের মাধ্যমে; (যারা ধৈর্যের সাথে এসকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে) তুমি (সেসকল) ধৈর্যশীলদের (জান্নাতের) সুসংবাদ দাও।" আল বাকারা ১৫৫

এটি পড়ে মনে হবে আয়াতটি এক্ষুণি মনে হয় আপনার জন্যই নাজিল হয়েছে। কী অসাধারণভাবে মিলে গেলো, তাইনা?
জ্বি, কোরআনের কথাগুলো এতোটাই জীবন্ত।

আল্লাহর দ্বীন কায়েমের জন্য কাজ করেন। পথে পথে বাঁধা আসছে। ঘর হারা হয়ে গেছেন। রিমান্ডে নিয়ে পা ভেঙে দিচ্ছে, হাঁড় গুড়িয়ে দিচ্ছে। জেলে পঁচিয়ে মারছে, তাই না?
খুবই ডিপ্রেসড! মনে মনে বলছেন, - 'আমরা বোধকরি পারবো না।'

কোরআন নিয়ে বসলেন। এই আয়াত পড়লেন– ''হতাশ হইয়ো না, দুঃখ করো না। তোমরাই বিজয়ী হবে, যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাকো''।
- আল ইমরান, ১৩৯

পড়ার পরে মনে হবে, আরে! এক্ষুণি তো আমি এরকম ভাবছিলাম। খুবই হতাশ হয়ে পড়েছিলাম। ভাবছিলাম, - আমাদের দিয়ে হয়তো আর হবে না। হাল ছেড়ে দিচ্ছিলাম। মনে হচ্ছে এক্ষুণি আমার মনের কথাগুলো কেউ শুনে ফেলেছে এবং তৎক্ষণাৎ আমার জন্য একটি আশার বাণী পাঠিয়ে দিয়েছে।

দারুন না? জ্বি, কোরআন এতোটাই এ্যামেজিং! এর কথাগুলো এতোটাই জীবন্ত!!

আমরা যেভাবে নাস্তিকদের সহায়তা করি

একটা হিসাব করতে বসেছিলাম কিছুদিন আগে।
এই দেশে মোট জেনুইন (আসল প্রোফাইল ওয়ালা) নাস্তিকের সংখ্যা কতো?
এই হিসাবটা করতে গিয়ে দেখলাম, এই সংখ্যাটাকে আমি টেনেটুনেও ৫০ পার করাতে পারিনি।
সত্যি বলতে, অনলাইনে আমরা যেসকল নাস্তিক (মূলত ইসলাম বিদ্বেষী) দেখি, যারা দিব্যি লেখালেখি করে, এদের সংখ্যা একেবারে হাতেগোনা।
আমি অনেক খুঁজেও ৫০ টি আসল প্রোফাইলের নাস্তিক বের করতে পারিনি।
আমি এখানে নাস্তিক বলতে যাদের বুঝাচ্ছি, তারা এমন- যারা নাস্তিকতা চর্চা বলতে কেবল ইসলাম বিদ্বেষীতাকেই বুঝে।
এমন কেউ না, যে ধর্ম মানেনা ঠিকই, কিন্তু অন্যের ধর্ম বিশ্বাসে আঘাত করার মতোন **ছোটলোক** নয়।
এখানে তাদেরকেই বুঝাচ্ছি, যাদের রুটি রুজির ব্যবস্থা হয় এসব ছাঁইপাশ ব্লগে ইসলামের বিরুদ্ধে বিষোদগার করে। যারা এসব করে পেট চালায়, সংসার চালায়। কেউ কেউ ইউরোপ আমেরিকার স্যাটেল হবার **সৌভাগ্য** অর্জন করে।
এরকম কিছু প্রোফাইল খুঁজছিলাম। শাহবাগের কিছু আন্ডার গ্রাজুয়েট গাঁজাখোরকে পেয়েছি এই তালিকায়। এদের কয়েকজন জার্মান, কানাডা, ইউ এস এ তে আছে এখন।
আর, ইন্টার পাশ একজন তো এসব করে অনেক আগেই জার্মানিতে স্যাটেল হয়ে গেছে।

যাহোক, যা বলছিলাম, এরা সংখ্যায় একেবারে নগন্য। কিন্তু, এদের একেকজনের রয়েছে ডজন ডজন ফেইক প্রোফাইল।
তাছাড়া, সংখ্যায় অতি নগন্য এই শ্রেণীটাকে সাপোর্ট করার জন্য তো বিশেষ একটা ধর্মের কিছু দাদা-দিদিরা নিবেদিত আছেনই। তাই আমাদের মনে হয় এরা আসলেই সংখ্যায় অনেক। কিন্তু বাস্তবে তা নয়।

তাহলে এরা এতো প্রচার পায় কীভাবে?
জ্বি, প্রচারটা করি আসলে আমরাই।
ওরা আল্লাহ-রাসূলকে গালি দিয়ে কিছু একটা লিখলেই আমাদের ভাইয়েরা সেখানে গিয়ে হামলে পড়েন। ইচ্ছেমতো গালি দেন, হুমকি ধমকি দেন।
আর ওরা কী করে জানেন? ওরা আড়ালে বসে মিটিমিটি হাসে আর মজা নেয়।
কারণ ওরা এটাই চায়। ওরা চায় আপনারা সেখানে যান। ইচ্ছেমতো ওদের গালিগালাজ করুন। কমেন্ট করুন। এতে কিন্তু আখেরে লাভটা ওদের।
আপনি বুঝতেই পারছেন না তার আইডিতে কমেন্ট করে (হোক গালি গালাজ, হুমকি, ধমকি

কিংবা নসীহত) আপনি আসলে তাকে পপুলার বানিয়ে দিচ্ছেন। আপনি তার আইডিতে একটা কমেন্ট করা মাত্র সেটা আপনার মিউচুয়ালদের ওয়ালে শো করবে। যদি ২০ জন সেটা দেখে, তাদের মধ্যে এটলিস্ট ১০ জন তার আইডি ভিজিট করবে। তার ছাঁইপাশ লেখাগুলো পড়বে। মাথার টেম্পেরেচার লস হবে। ফলে সেও দু চারটা গালি বা হুমকি ধমকি দিয়ে কমেন্ট করবে। ব্যস, ওইদিকে তরতর করে অই নাস্তিকের প্রোফাইলের রেটিং, ভিউয়ার বেড়ে যাবে। লাভটা কার এসব করে? বুঝেন একটু।

ওদের কিন্তু মাথায় আপনারাই তুলেন। এইজন্য ওরা আপনার মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খায়। জার্মান নিবাসী ইন্টার পাশ নাস্তিকটার ওয়ালে গিয়ে দেখলাম, ওর প্রতিটা লেখায় সব মুসলিমদের গালাগালি, হুমকি, ধমকি ইত্যাদি।

এতে করে ও কী থেমে যাচ্ছে? নাহ। ও আরো উৎসাহ পাচ্ছে। ও কিন্তু আপনার এই রিএ্যাকশানটাই চায়। শুধু ও না, লন্ডন প্রবাসী পল্টিবাজ মুফা থেকে শুরু করে এই শ্রেণীর সব- সবাই এটাই চায়।

ওদের লেখা পড়ুন। রিএ্যাকশান দেখান। Angry ইমো দিন। গালাগাল করে কমেন্ট করুন আর ওদের ভিডিও দেখে তাতে 'ভিউ' বাড়ান। আর কিছুনা।

সম্প্রতি আরেক গাঁজাখোর গজে উঠলো দেখলাম। খুব সচেতনভাবেই গাঁজাখোর বলছি। পেইজ খুলে প্রথমে কিছু বিতর্কিত কার্টুন এঁকে সেগুলো টাকা দিয়ে ফেইসবুককে দিয়ে স্পন্সর করিয়েছে।

এরপর তার আর কিছুই করা লাগে নি। আমাদের ভাইয়েরা গিয়ে তার বাকি কার্টুনগুলোতে গালিগালাজ, হুমকি,ধামকি দিয়ে, তার কার্টুন গালি দিয়ে শেয়ার করে তাকে আরো ফেমাস বানিয়ে দিলো। সে এখন এসব আরো বাড়িয়ে দিলো। নবী রাসূল নিয়ে ইচ্ছেমতো সে কার্টুন বানাচ্ছে। তাহলে তাকে পপুলার করে দিলো কে?

কিছু মুসলিমরাই। যারা নেকীর জন্য গালি দিয়ে ধর্মরক্ষা করতে গিয়ে আরো বারোটা বাজাচ্ছেন।

ভাই আমার, একটু বুঝুন। এসব ফেইম সীকার ব্লাডি কীটগুলোকে আজকেই আনফলো, আনলাইক করুন। ইগনোর করুন। দেখবেন, আগামীকালকেই এরা চুপসে গেছে।

এই সেই পেইজ (https://goo.gl/Tcztto) যেখানে জঘন্য সব কার্টুন আঁকা হচ্ছে ইসলাম ধর্ম নিয়ে।

<u>আমার লিস্টে কোন আইনের লোক, কোন সাংবাদিক, মিডিয়া কর্মী থাকলে এর বিরুদ্ধে আইসিটি মামলা করার জন্য অনুরোধ করছি।</u>

আর, যারা যারা ইতোমধ্যে এই পেইজে লাইক দিয়েছেন, দয়া করে আনলাইক করুন। যারা কমেন্ট, শেয়ার করছেন, সেগুলো বন্ধ করুন।

আর, যারা লাইক দেন নি, তারা একটি কাজ করুন। এই পেইজে গিয়ে একটি রিপোর্ট করুন এবং সাথে করে এই পেইজে 'ওয়ান স্টার' রেটিং দিয়ে আসুন। ব্যস!!

বিঃদ্রঃ ব্যক্তিগতভাবে কোন আইডি বা পেইজে রিপোর্ট করার পক্ষে আমি নই। কিন্তু এই শয়তান এমন জঘন্য সব কার্টুন আঁকছে, যা দেখে নিজেকেই স্থির রাখা দায়। তাই দয়া করে কাজগুলো করুন আর এই ব্লাডি গাইটাকে খুঁজে বের করে পুলিশের হাতে তুলে দিন। এরা সমাজ এবং রাষ্ট্রের জন্য ক্ষতিকর।

গ্রিক দেবি ও নাস্তিকদের প্রতিক্রিয়া

দেশের সেক্যুলার এবং সো কল্ড নাস্তিকরা খুবই আজব কিছিমের প্রাণী।
এরা যে আসলে কী বলতে চায় তা নিজেরাই ভালোমতো বুঝে না।
গত কয়েকদিনের 'থেমিস' তর্ক থেকে আরো একবার উপলব্ধি করলাম, এরা শুধুই দ্বিমুখী নয়, পুরোদাগে ভন্ডও।

গ্রীক পুরাণের দেবী থেমিসকে জায়েজ করার জন্য এরা স্বর্গ-মর্ত্য এক করে চেষ্টা করে যাচ্ছে।
মৃণাল হক যখন এই জিনিসটা প্রথমে স্থাপন করলেন, তখন তিনি নিজের মুখেই বলেছিলেন এটা গ্রীক দেবী থেমিসের প্রতিমূর্তি।
যাহোক, গত পরশু মৃণাল হক উনার পজিশান থেকে ১৮০ ডিগ্রি এঙ্গেলে পল্টি নিয়ে বললেন এইটা আসলে গ্রীক ট্রীক কিচ্ছু না। এইটা বাঙালি নারীর আদলে তৈরি।
ব্যস, আমাদের সেক্যুলার মহলও প্রচারে নামলেন- এইটা গ্রীক দেবী থেমিস না, এইটা বাঙালি নারীর প্রতিমূর্তি।
কিন্তু সেক্যুলার ভাই ব্রাদারগণ আমাদের কাছে ক্লিয়ার করেন নাই **এই মহান বাঙালি নারীর নাম কেন ইংরেজিতে রাখা হলো?** কেন এই নারীর নাম ছকিনা, জরিনা না রাইখা 'লেডি জাস্টিসিয়া' রাখা হলো?

তারা বললো,- 'ধরে নিন না, একজন অবহেলিত বাঙালি নারী ন্যায় বিচারের জন্য দাঁড়িয়ে আছে।'

ধরে তো নিতে পারতাম, কিন্তু এই ধরে নেওয়াতে বিপদ আছে। বাঙালি নারীর সুদীর্ঘ ইতিহাসের কোথাও এমন কোন ঘটনা পাওয়া যায়না যেখানে একজন অবহেলিত, নির্যাতিত নারীকে চোখ বাঁধা, এক হাতে তলোয়ার আর অন্যহাতে দাঁড়িপাল্লা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেছে।
বাঙালি নারী আর যাইহোক, হলিউডের কোন ক্যারেক্টার কিন্তু না।
তাই, যা আমাদের ইতিহাস, সংস্কৃতির অংশ নয়, তাকে জোর করে আমাদের ইতিহাস, সংস্কৃতির অংশ বানানোর এই প্রাণান্তকর চেষ্টা কেনো?

আরেকদলকে দেখলাম, যারা বলছে গ্রীক পুরাণের হোক আর যাইহোক, একটা জিনিস যদি সৌন্দর্যের প্রতীক বহন করে, তা রাখতে তো দোষের কিছু দেখি না। এতে বিরোধিতার কী আছে?

এই দলটাকে আমার খুব কিউট মনে হলো। এরা বলছে, বিজাতীয় সংস্কৃতির হলেও, এই জিনিস যদি সৌন্দর্য দান করে, এটা রাখতে দোষের কিছু নেই।

এরাই কিন্তু ওই দল, যারা কথায় কথায় ইসলাম ধর্মকে, হিজাব-নিক্বাব, ঈদ, কোরবানকে বিজাতীয়, আরবীয় সংস্কৃতি বলে উপহাস করে।
বাঙালীরা কেনো আরবদের সংস্কৃতি গ্রহণ করবে- এটাই তাদের আপত্তি।

এদের আরবীয় ইসলাম ধর্মে আপত্তি, কিন্তু গ্রীকদের দেবী থেমিসকে সংস্কৃতির অন্তভুক্ত করতে আপত্তি নেই।
আরবীয় বলে পর্দা-হিজাবে এদের ঘোর আপত্তি, কিন্তু ইউরোপ-আমেরিকার শর্ট ড্রেসকে গ্রহণ করতে এদের আপত্তি নেই।
আরবীয় কালচার বলে এরা ঈদ, কোরবানকে নিতে পারেনা, কিন্তু পশ্চিমা হাগ ডে, লাভ ডে, ভ্যালেন্টাইন ডে গ্রহণে এদের কোন এলার্জি নেই।

এদের আপত্তির এক এবং একমাত্র জায়গা - ইসলাম।

ডায়ালগ এর মদ্ধে-

- 'কী ব্যাপার? এতো হাউকাউ করছেন কেনো?'

- 'আর বইলেন না। গতরাতে নাকী সুপ্রিম কোর্ট প্রাঙ্গণ থেকে ভাস্কর্যটি সরিয়ে নিয়েছে।'

- 'ও তাই নাকি? তা, এইটা কীসের মূর্তি ছিলো?'

- '(রাগি রাগি চেহারায়, চোখ বড় বড় করে) অই মিয়া, ফাইজলামী পাইছেন? ভাস্কর্য আর মূর্তির পার্থক্য বুঝেন?'

- 'স্যরি স্যরি ভাই। এটা কীসের ভাস্কর্য ছিলো?'

- 'ন্যায়ের প্রতীক।'

- 'এইটা যে ন্যায়ের প্রতীক, তা কোথায় পেয়েছেন?'

- 'গ্রীক পুরাণে।'

- 'গ্রীক পুরাণটা কী জিনিস?'

- 'প্রাচীন গ্রীকদের ধর্মগ্রন্থ।'

- 'একটু খুলে বলুন না, প্লিজ?

- 'গ্রীক পুরাণে আছে, দেবী থেমিস হলো 'টাইটান' দেব-দেবীদের মধ্যে একজন। দেবরাজ জিউসের সাথে দেবী থেমিসের মিলনের ফলে মোট ৬ জন সন্তানের জন্ম হয়। তারাও পরে দেব-দেবীতে পরিণত হয়। গ্রীক পুরাণে এই দেবী থেমিস ছিলেন একজন ন্যায়ের প্রতীক........'

- 'ব্যস! ব্যস! ব্যস!'

- 'কী হইলো?'

- 'কিছুনা। আপনি ধর্মে বিশ্বাস করেন?'

- 'মাথা খারাপ? বানোয়াট, আজগুবি জিনিসে আমি বিশ্বাস করিনা।'

- 'আপনার মতে, ধর্মগুলো বানোয়াট?'

- 'হু'

- 'হিন্দু ধর্ম, ইসলাম ধর্ম, খ্রিষ্ঠান ধর্ম এসব বানানো?'

- 'হু'

- প্রাচীন গ্রিকদের ধর্মও?

- 'হ্যাঁ ভাই। বাঙলা বুঝেন না?'

- 'আচ্ছা। তাহলে, ধর্মগুলো যদি বানোয়াট হয় এবং প্রাচীন গ্রীকদের ধর্মও যদি কল্পিত হয়, তাহলে গ্রীক পুরাণও বানোয়াট, রাইট?'

- 'তো? '

- 'গ্রীক পুরাণ বানোয়াট হলে, দেবী থেমিসের কাহিনীও বানোয়াট। আর দেবী থেমিসের কাহিনী বানোয়াট হলে ধরে নিতে পারি, দেবী থেমিস বলে কেউ কখনো ছিলোনা। দেবী থেমিস বলে কেউ যদি না থাকে, তাহলে এটাও ধরে নিতে পারি যে, উনার 'ন্যায়ের প্রতীক' হবার কাহিনীও বানোয়াট। সুতরাং, একজন নাস্তিক হিসেবে, বানোয়াট জিনিসের উপর ভিত্তি করে তৈরি হওয়া একটা মূর্তি অপসারণে হাউকাউ না করে আপনার তো আরো খুশি হওয়া উচিত।'

- 'ধুর! তুমি মিয়া একটা ছাগু! মৌলবাদী.......'

“অন্যরকম গল্প-০১”

ইসলামের বিরুদ্ধে পৃথিবীতে যেসব “মুভি” বানানো হয়েছিলো, সেগুলোর মধ্যে “Fitna” মুভিটি অন্যতম। মুভিটি নেদারল্যান্ডে বানানো হয়।

মুভিটি বানানো হয় নেদারল্যান্ড ভিত্তিক রাজনৈতিক সংগঠন PVV (Partij voor de Vrijheid) এর তত্বাবধানে। Partij voor de Vrijheid একটি ডাচ পরিভাষা যার ইংরেজি অর্থ- Party For Freedom.

এই রাজনৈতিক সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন Greet Wilders , যিনি ওয়ার্ল্ডওয়াইড একজন নামকরা ইসলাম বিদ্বেষী বলে খ্যাত ছিলেন।

“Fitna” মুভিটা নির্মিত হয় এই লোকের প্ররোচনায়। বলা বাহুল্য, Party For Freedom নামের রাজনৈতিক সংগঠনটি যতোটা না রাজনৈতিক, তারচেয়ে বেশি ইসলাম বিদ্বেষী বলে পরিচিত ছিলো।

নেদারল্যান্ডে কোরআন এবং মুসলিম প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধের দাবি সর্বপ্রথম এই সংগঠনটিই তুলেছিলো।

২০০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত এই সংগঠন সে বছরই নেদারল্যান্ডের জাতীয় নির্বাচনে অংশ নেয় এবং পার্লামেন্টে ৯ টি আসন লাভ করে। এরপর, ২০১০ সালের সাধারণ নির্বাচনে অংশ নিয়ে এটি লাভ করে মোট ২৪ টি আসন।

“Fitna” মুভিটা সম্পর্কে কিছুটা ধারণা দিই। ইসলামের বিরুদ্ধে অপপ্রচারমূলক জঘন্য কয়েকটি মুভির মধ্যে এটি একটি।

এই মুভির সবচেয়ে জঘন্যতম দিক হলো এই, এই মুভির শুরুতেই দেখানো হয় ,- ইসলামের সর্বশেষ নবী হজরত মুহাম্মদ (সাঃ) মাথায় একটি বোমা নিয়ে দৌড়াচ্ছেন (নাউজুবিল্লাহ)। এরপরে মুভিটিতে কোরআনের “জিহাদ” সম্পর্কিত বিভিন্ন আয়াত কোট করে সেগুলো দিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয় যে, ইসলাম একটি সন্ত্রাসী এবং জঙ্গীবাদী ধর্ম। সেই মুভিতে বিতর্কিত ৯/১১ এর ঘটনাকেও প্রদর্শন করা হয়। মুভিটা মুক্তি পায় ২০০৮ সালে।

Party For Freedom এর প্রতিষ্ঠাকালীন সময় থেকে যে কয়েকজন নেতা এই সংগঠনকে সামনে থেকে নের্তৃত্ব দিয়েছিলেন, Arnoud Van Doorn তাদের অন্যতম। এই লোকও ছিলেন Party For Freedom এর প্রতিষ্ঠাতা Greet Welders এর মতো প্রচন্ডরকম ইসলাম এবং মুসলিম বিদ্বেষী।

“Fitna” মুভিটা তৈরি এবং এর প্রচার-প্রসারেও Arnoud Van Doorn এর ভূমিকা ছিলো ব্যাপক।

কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে, প্রচন্ড ইসলাম-মুসলিম বিদ্বেষী এই লোক ২০১২ সালে ঘোষণা দিয়ে

ইসলাম গ্রহণ করে ফেলেন।

এই মুভিটা তৈরির পরে একটা হিতে-বিপরীত কান্ড হয়। দেখা গেলো, এই মুভি দেখার পরে প্রচুর সংখ্যক অমুসলিম ইসলামের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠে এবং তারা ইসলাম এবং মুসলিমদের ব্যাপারে রিসার্চ শুরু করে। Arnoud Van Doorn ছিলেন তাদের একজন।

নিজের সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, “I have heard so many negative stories about Islam, but I am not a person who follows opinions of others without doing my own research.Therefore, I have actually started to deepen my knowledge of the Islam out of curiosity.”…

ইসলাম নিয়ে পশ্চিমা মহলের অপপ্রচারে বিভ্রান্ত এই লোক “Fitna”র মতো ইসলাম বিদ্বেষী মুভির প্রডিউচারদের একজন ছিলেন।

কিন্তু, ইসলাম নিয়ে যখন তিনি নিরপেক্ষ গবেষণা শুরু করলেন, তখন তিনি দেখলেন যে, এতোদিন তাদেরকে ইসলাম নিয়ে যা যা জানানো হয়েছে এবং দেখানো হয়েছে, তা আদতে অপপ্রচার। ইসলাম কোন সন্ত্রাসী ধর্ম নয়, জঙ্গীবাদী ধর্ম নয়। ইসলাম একটি শাশ্বত, পরিপূর্ণ জীবন বিধান।

ইসলামের প্রতি আসক্ত হবার পরে যখন তিনি পুরোদাগে ইসলাম নিয়ে পড়াশুনায় নিমজ্জিত হন, তখন ২০১১ সালে Party For Freedom ভেঙে যায়।

২০১৩ সালে Arnoud Van Doorn মক্কা যান হজ্ব করার জন্য। সেখানে Saudi Gezzete কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে উনি বলেন,- “I found myself among these faithful hearts. I hope that my tears of regret will wash out all my sins after my repentance”

তিনি আরো বলেন, “I felt ashamed standing in front of the Prophet’s grave. I thought of the grave mistake which I had made by producing that sacrilegious film. I hope that Allah will forgive me and accept my repentance.”

বর্তমানে তিনি European Daw’ah Foundation চেয়ারম্যান এবং Canadian Daw’ah Association এর এ্যাম্বাসেডর।

উনার আগের ভুল (Fitna Movie) সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেন,- “I feel an urge and a responsibility to correct the mistakes I have done in the past. I want to use my talents and skills in a positive way by spreading the truth about Islam. I am trying to make a new movie about Islam and the life of Prophet Muhammad (peace be upon him). It would show people what examples the Prophet set in his life and the movie would invite younger people to Islam.”

কাহিনীর এখানেই সমাপ্তি নয়। বাবার ইসলাম গ্রহণের পরে, বাবাকে পুরোপুরি পাল্টে যেতে দেখে উনার ২২ বছর বয়সী ছেলেও ইসলাম গ্রহণ করে। বাবার পরিবর্তন সম্পর্কে বলতে

গিয়ে সে (উনার ছেলে) বললো,- “I saw my father become more peaceful after converting to Islam. That’s when I realised there is something good in this

religion and it made me change my perception of Muslims. I started studying the Holy Quran and going through lectures of important scholars”

এই হচ্ছে একজন চরম ইসলাম বিদ্বেষীর ইসলামে দাখিল হবার গল্প।

“বলুন, সত্য এসেছে আপনার র’বের পক্ষ থেকে। এবার যাদের ইচ্ছা হয় বিশ্বাস করুক আর যাদের ইচ্ছা প্রত্যাখ্যান করুক”- আল কাহাফ, ২৯

তারা পাগল নয়, তাদের মাথায় সমস্যা আছে......

ইনবক্সে একজন নিচের জিনিসটা দিলো। এসাইলামে জার্মান প্রবাসী এক নাস্তিক কোরআনের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে, কোরআনের মতোই সূরা লিখে প্রমাণ করলো আল্লাহর উপরে জয়ী হয়ে গেছে (!) (নাউজুবিল্লাহ)

জিনিসিটা নিম্নরূপ - (নাম দিয়েছে 'সূরা মমতাময়ী')

শুরু করছি পরমকরুণাময়ী সেই মায়ের নামে, যিনি গর্ভে ধারণ করেছেন।
[০১: ০১]
আমাদের পরম করুণাময়ী মা।
[০১: ০২]
যিনি শিক্ষা দিয়েছেন প্রিয় বাঙলা বর্ণমালা,
[০১: ০৩]
জন্ম দিয়েছেন মানুষকে,
[০১: ০৪]
তাকে শিখিয়েছেন পথচলা।
[০১: ০৫]
নাড়ির গতি তার হিসাবমত চলে।
[০১: ০৬]
এবং সন্তানের মস্তক যার প্রতি সেজদারত থাকে সর্বদা।
সর্বশেষ লাইন-
[০১: ৩৫]
অতএব, তোমরা তোমাদের মমতাময়ী মায়ের কোন কোন অবদানকে অস্বীকার করবে?'

বিশ্বাস করুন, এইটা দেখার পরে আমি পুরা ১০ মিনিট হাসছি। এতো বিনোদন পাইলাম যে গাড়িতেই হাহাহা করে হাসা শুরু করেছি।

এরা এতোই নিম্নমানের আইকিউ নিয়ে চলে যে, সামান্য একটা জিনিস অনুধাবনের ক্ষমতাটাও নাই।

আল্লাহ তা'লা বলেছেন- '

‘তাহলে তোমরা এর মত দশটি সূরাহ রচনা করে আন, আর (এ কাজে সাহায্য করার জন্য) আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাকে ডাকতে পার ডেকে নাও যদি তোমরা সত্যবাদী হয়েই থাক।'

আল্লাহ তা'লা স্পষ্ট করেই বলেছেন,- 'আল্লাহকে ছাড়া যাকে খুশি ডেকে নাও'।

এই নাস্তিকটা করলো কী? শুরুই করলো আল্লাহর নাজিল করা স্টাইলে। শুধু শুরুই করেনি, পুরা জিনিসটাই সূরা আর রাহমান এর নকল :-)

'শুরু করছি আল্লাহর নামে, যিনি পরম দয়ালু'

সে লিখছে- 'শুরু করছি পরমকরুণাময়ী সেই মায়ের নামে, যিনি গর্ভে ধারণ করেছেন।'

সূরা আর রাহমানের প্রথম আয়াত- 'তিনি রহমান'

সে লিখসে- 'আমাদের পরম করুণাময়ী মা'

যাহোক, আর রাহমানের আয়াত 'অতএব,তোমরা তোমাদের রবের কোন কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?'

সে লিখসে- 'অতএব, তোমরা তোমাদের মমতাময়ী মায়ের কোন কোন অবদানকে অস্বীকার করবে?'

তাছাড়া, সে লিখসে - 'আমাদের পরম করুণাময়ী মা। যিনি জন্ম দিয়েছেন মানুষকে। শিখিয়েছেন বর্ণমালা। শিখিয়েছেন পথচলা।'

ওরে বেকুব! ? ওদের বর্ণমালা, পথচলা, ভাষা কে শেখায় আর দুধকলা কে খাওয়ায়? গিলু শর্ট জানতাম, এতো পরিমাণে শর্ট জানতাম না :/
আমি হাসতেছি, কারণ আল্লাহ বলেছেন- উনাকে ছাড়া আর যাকে পারো, ওদের সাহায্য নিতে। কিন্তু এই নাস্তিক শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আল্লাহর সাহায্যই নিলো এই হ্ম্যাত জিনিস লিখতে :-)
সূরা আর রাহমানের স্টাইল, প্রতিটা লাইন টু লাইন, ওয়ার্ড টু ওয়ার্ড :-)
তো, কাহিনী কী হইলো? ঘোড়ার ডিম :-)
হাতি ঘোঁড়া গেলো তল, চামচিকা বলে কতো জল :-)

'নাস্তিকদের অসততা- তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ' ০৩

আস্তিকতা-নাস্তিকতা নিয়ে সামান্য পড়াশুনা আছে এমন ব্যক্তির কাছে 'রিচার্ড ডকিন্স' একটি বহুল পরিচিত নাম। অক্সফোর্ডের Zoology'র এই প্রফেসর হলেন বর্তমান বিবর্তনবাদ দুনিয়ার পুরোধা। বিবর্তনবাদকে জনপ্রিয় করে তুলতে এই প্রফেসর দিনরাত প্রচুর পরিশ্রম করেন। নাস্তিকদের কাছে এই লোক একপ্রকার দেবতাতুল্য।

উনি যা বলেন, মুখ থেকে যা-ই বের করেন, সাথে সাথে সেটা নাস্তিককূল **আসমানী বার্তার মতো লুপে নেয়।** তবে চরম সত্য কথা এই যে, ব্রিটিশ এবং এথেইষ্ট এই বিজ্ঞানীকে ইংল্যান্ডেরই (উনার নিজের দেশ) অনেক এথেইষ্ট বিজ্ঞানীই পছন্দ করেন না। সাধারণ নাস্তিকদের কাছে যিনি একরকম দেবতার মতো, তিনি কেনো তার বিজ্ঞানীমহলে সমালোচিত, অপছন্দনীয় তা এক বিশাল কাহিনী। আমরা সবসময় শুনে থাকি, নাস্তিকরা নির্ভেজাল। তাদের মধ্যে কোন দুই নাম্বারি নেই। যা সত্য তা মেনে নিতে তাদের মধ্যে কোন কার্পণ্য নেই ইত্যাদি ইত্যাদি।

কিন্তু আসলেই কি তাই?

রিচার্ড ডকিন্সকে নিয়ে দু চারকথা বলা যাক প্রথমে।

ইংল্যান্ডের এবং বিজ্ঞান জগতে একজন পপুলার ফিগার হলেন রিচার্ড মিল্টন। ভদ্রলোক পেশায় একজন ইঞ্জিনিয়ার। সাইন্স রিলেটেড বিভিন্ন লেখাজোকার জন্য উনি খুব পরিচিত। উনি একজন এগনোষ্টিক অর্থাৎ সংশয়বাদী। প্রচলিত ধর্মকর্মে যারা বিশ্বাস করেনা, সেরকম। ১৯৯৩ সালে এই অজ্ঞেয়বাদী বিজ্ঞানী বিবর্তনবাদের বিরুদ্ধে একটি বই লিখেন।যেহেতু বিভিন্ন নামী দামী পত্রিকায় বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে উনার আর্টিকেল ছাপা হতো, তাই বইটি লেখার আগেই ডারউইনের 'Theory Of Evolution' এর সমালোচনা করে উনি বিভিন্ন পত্রিকাতে কলাম লিখতেন।

পয়েন্ট টু বি নোটেড, উনি কিন্তু কোন ক্রিয়েশনিষ্ট ছিলেন না। একজন নিরেট অজ্ঞেয়বাদী। কিন্তু ডারউইনের তত্বটির বিভন্ন অসারতা, এবং সেগুলোকে বিজ্ঞানের মোড়কে রঙচঙ মেখে সাধারণ মানুষকে 'পিওর সাইন্স' বলে গিলাতে দেখে উনি সেটার সমালোচনা করার প্রয়োজন অনুভব করেন। ডারউইনের দেওয়া 'ন্যাচারাল সিলেকশান' এবং এরপরের নিও-ডারউইনিষ্টদের উত্থাপিত 'জেনেটিক মিউটেশন' যে প্রাণীর নতুন প্রজাতি সৃষ্টিতে অক্ষম, তা নিয়ে তিনি লেখালেখি করেন। এই লেখালেখি করতে গিয়ে নিজের দলের, নিজের মহলের আরেক সুপরিচিত মুখ,বিজ্ঞানী রিচার্ড ডকিন্সের আসল রূপ, তার বিজ্ঞান চর্চার পেছনের হীন উদ্দেশ্য আর নোংরা মানসিকতা রিচার্ড মিল্টনের সামনে চলে আসে। রিচার্ড মিল্টন তার 'The

facts Of Life: Shattering the myths of Darwinism' এ রিচার্ড ডকিন্সকে নিয়ে কিছু মন্তব্য করেন। তিনি তার বইয়ের ২৬৮ পৃষ্ঠায় লিখেন–

“I experienced this kind of witch-hunting activity by the Darwinist police when I first published Shattering the Myths of Darwinism and found myself subjected to a campaign of vilification…it was disappointing to find myself being described by a prominent academic, Oxford zoologist Richard Dawkins, as ‘loony,’ ‘stupid,’ and ‘in need of psychiatric help,’ in response to purely scientific reporting.”

রিচার্ড মিল্টন বলেন, 'রিচার্ড ডকিন্সের মতো অক্সফোর্ডের একজন প্রখ্যাত বিজ্ঞানী যখন আমাকে আমার সাইন্টিফিক লেখার জবাবে 'উন্মাদ' 'মূর্খ' এবং 'মানসিক চিকিৎসা দরকার' বলে ভৎসর্না করেন, তখন ব্যাপারটা খুবই হতাশার।'

তিনি আরো লিখেন–

“(B)ehind my back, Dawkins was writing letters to newspaper editors alleging that I am a secret creationist and hence not to be believed…Dawkins contacted the editor [of Times Higher Educational Supplement], Auriol Stevens , falsely alleged that I am a secret creationist, and covertly lobbied against publication of my article, although he had not seen it… the editor of the paper gave in to this bullying and suppressed my article .”

মিল্টন লিখেন, 'আমার অজান্তে, রিচার্ড ডকিন্স পত্রিকার এডিটরদের কাছে চিঠি লিখে বলেছিলো, আমি নাকি একজন সিক্রেট ক্রিয়েশনিষ্ট (যারা স্রষ্টায় বিশ্বাস করে) এবং আমাকে যেন বিশ্বাস না করা হয়। ডকিন্স 'Times Higher Educational Supplement' এর এডিটর Auriol Stevens এর সাথে কনট্যাক্ট করে এবং আমার পেপারটি যেন প্রকাশ না করে তার জন্য তাকে বাধ্য করে, যদিও আমার পেপারটি ডকিন্স তখনও দেখেওনি (অর্থাৎ, মিল্টন কি লিখেছেন, তা বিজ্ঞানের মাপকাঠিতে কতোটুকু গ্রহণযোগ্য, তা যাচাই না করেই ডকিন্স উনার বিরুদ্ধে অপপ্রচারে নামেন।)

তিনি লিখেন–

“I found this kind of bullying, bad faith, and intellectual dishonesty in prominent academics both depressing and a little disturbing. It is like lifting a corner of the veil of civilized behavior and finding something like intellectual fascism hiding underneath…(T)here is little sign of it on the surface unless, like me, you begin to ask controversial questions…”

“For anyone, anywhere, to say that I am a creationist, a secret creationist, a ‘creationist ally,’ or any other such weasel-word formulation, **is an act of intellectual dishonesty by those who have no other answer to the scientific objections I have raised publicly ”**

মিল্টন বলেছেন, 'আমাকে (খুব কাছ থেকে দেখা আর জানার পরেও, আমার কাজ, বিশ্বাস সম্পর্কে জেনেও) একজন 'সিক্রেট ক্রিয়েশনিষ্ট' বলাটা চরম বুদ্ধিবৃত্তিক অসততার পরিচয়।

আমাকে এসব তারাই বলছে যাদের কাছে আমার উত্থাপিত অভিযোগের (বিবর্তনবাদের বিরুদ্ধে) বিরুদ্ধে কোন জবাব নেই।'

চিন্তা করে দেখুন, ডকিন্সের মতো একজন পাবলিক ফিগার, যিনি কিনা আবার বিবর্তনবাদীদের আইডল, সেই তিনিই কিনা নিজ গোত্রীয় আরেকজন বিজ্ঞানীর কাজকে অসম্মান করে, তার উত্থাপিত প্রশ্নের জবাব না দিয়ে তাকে 'উন্মাদ' 'পাগল' 'সিক্রেট ক্রিয়েশনিষ্ট' 'মূর্খ' বলে ভৎসর্না করে। পত্রিকার এডিটরদের জোর জবরদস্তি করে তার লেখা ছাপানো বন্ধ করে দেয়। এগুলো কি 'মুক্ত চিন্তার' ধারক-বাহকদের বেলায় সাজে?
যিনি আরেকজন বিজ্ঞানীর কাজকে এভাবে অসম্মান করে, যথাযথ না জেনে-বুঝে 'বাতিল', এবং লেখককে 'মূর্খ' 'মানসিক চিকিৎসা' দরকার বলে ভৎসর্না করতে পারে, তাকে আমরা কতোটা সৎ ভাবতে পারি? তার নিজের কাজকে আমরা কতোটা শুদ্ধ বলতে পারি?
এই হলো বিবর্তনবাদীদের গুরু রিচার্ড ডকিন্সের চেহারা। ঠিক এই কাজগুলোই হয় বর্তমান বিজ্ঞান জগতে। বস্তুবাদীরা বিজ্ঞান জগতকে এমনভাবে ঝাপ্টে ধরে আছে যে, কোন বিজ্ঞানী যখন ডকিন্সদের বিরুদ্ধে বিজ্ঞানের যুক্তি-প্রমান নিয়ে আসে, তখন ডকিন্সরা তাদেরকে এভাবেই ভৎসর্না করে। মূর্খ, উন্মাদ, ক্রিয়েশনিষ্ট বলে বাতিলের খাতায় ফেলে দেয়। 'নাস্তিকীয়' ধর্মগুরু ডকিন্সদের 'বিবর্তনবাদের উপর এতোই পিওর ঈমান যে, উনি একবার বলেছিলেন-
'It is absolutely safe to say that if you meet someone who claims not to believe in Evolution, that person is ignorant, stupid or insane'

দেখুন কেমন কথা! আর এদের ভাষায় খালি ধার্মিকরাই নাকি মৌলবাদী, কট্টর! এদেরকেও কী আমরা নাস্তিক মৌলবাদী দাবি করতে পারিনা?

এবার আসি বাংলার কথিত 'সক্রেটিস' অভিজিৎ রায়ের ব্যাপারে। অভিজিৎ রায়কেও সবাই চিনেন। মুক্তমনা ব্লগের ফাউন্ডার এই অভিজিৎ। বুয়েট থেকে মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ ডিগ্রি অর্জন এবং সিঙ্গাপুর থেকে বায়ো-ইঞ্জিনিয়ারিং এ পিএইচডি করে ইঞ্জিনিয়ার হলেও, জীবনের বেশিরভাগ সময় এই লোক ইসলামের বিরোধিতা করেই কাটিয়ে দেন।ব্লগ দুনিয়ায় সারাদিন উনার সরব উপস্থিতি থাকতো। নামে-বেনামে নানান নিক থেকে উনি উনার ইসলাম এবং ধর্মবিরোধী মিশন চালিয়েছেন। রিচার্ড ডকিন্সের মতো উনিও যে কতোটা অসৎ আর নির্লজ্জ, তার একটি নমুনা দেখুন।

'Elsevier' নামক একটি প্রতিষ্ঠান থেকে 'The International Journal Of Cardiology' নামে একটি বিশ্ববিখ্যাত মেডিকেল জার্নাল প্রকাশিত হয়।মেডিকেল সাইন্সের বিভিন্ন বিষয়ে এই জার্নাল বিভিন্ন বিজ্ঞান ভিত্তিক পেপার প্রকাশ করে থাকে।

২০০৯ সালে এই জার্নালে একটি আর্টিকেল প্রকাশিত হবার জন্য একসেপ্টেড হয়। মজার ব্যাপার, এই খবর মুক্তমনা ব্লগের অভিজিৎ রায়ের কানে যাওয়ার পরে তার রাতের ঘুম হারাম হয়ে যায়। কী ছিলো সেই আর্টিকেল? আর্টিকেলটির শিরোনাম ছিলো – "The heart and cardiovascular system in the Qur'an and Hadeeth"...

অর্থাৎ, কোরআন আর অথেনটিক হাদীসে মানুষের শরীরের হার্ট এবং কার্ডিওভাসকুলার সিষ্টেম নিয়ে যা বলা আছে, তার সাথে যে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানও একমত, তা নিয়েই ছিলো এই আর্টিকেল।

অভিজিৎ রায় এবং মুক্তমনা পরিবারের ঘুম হারাম হবার কারণ হলো এই- এরকম আন্তর্জাতিক মানের একটি জার্নালে মুসলিমদের ধর্মগ্রন্থের ব্যাপার স্যাপার নিয়ে ফোকাস করার কোন মানে হয়না।

এমনিতেই ইসলাম,মুসলিম,কোরআন-হাদীস নিয়ে তারা উঠতে বসতে বিদ্বেষ চড়াতে থাকে। কিন্তু এরকম কোন বিশ্বমানের জার্নালে যদি মুসলিমদের কিতাবকে এভাবে হাইলাইট করা হয়- তাহলে তাতে ইসলাম বিদ্বেষী তথা মুক্তমনাদেরই নাক কাটা পড়ে। কী করা যায় তাহলে?

অভিজিৎ রায় 'The International Journal Of Cardiology' তে এই আর্টিকেল প্রকাশ না করার জন্য রাতারাতি আরো কিছু ইসলাম বিদ্বেষীদের জোগাড় করে ক্যাম্পেইন শুরু করে। এই জার্নালের এডিটরের বরাবরে সে একটি এপ্লিকেশনও লিখে আর্টিকেলটি যেন প্রকাশ না করা হয়।

সে এই বলে প্রচার চালায় যে, এই জার্নালের এডিটর আরবদের কাছ থেকে 'পেট্রোডলার' খেয়ে এরকম একটি আর্টিকেল প্রকাশ করছে।

মজার ব্যাপার হলো, অভিজিৎ রায় এন্ড গংদের এতো ক্যাম্পেইন, এতো অপপ্রচার আর বিদ্বেষীতার পরেও, তাদের নাকের পানি আর চোখের পানিতে ভাসিয়ে 'The International Journal Of Cardiology' ২০১০ সালে ঠিকই আর্টিকেলটি পাবলিশ করে।

রিচার্ড ডকিন্স আর অভিজিৎ রায়- গুরু আর শিষ্য। কমন ব্যাপার হলো- এরা মুখে যতোটা সৎ, যতোটা নির্ভেজাল, নিষ্পাপ, মুক্তমনা, বিজ্ঞান আর মুক্ত বুদ্ধির বুলিই আওড়াক, এট দ্যা এন্ড অফ দ্যা ডে, এরা সবাই একেকজন চরম ভন্ড, দ্বিমুখী আর অসৎ। এরা বিরুদ্ধমত থামিয়ে দিতে ক্যাম্পেইন করে, প্রপাগান্ডা চালায়, পত্রিকার সম্পাদককে জোর জবরদস্তী করে, প্রভাব খাটিয়ে অন্যের মত প্রকাশে বাঁধা দেয়। আবার, এরাই নাকি 'ফ্রি থিংকার'.......।

সূর্য হতে আক্রমণ!

সহী বুখারীর একটি হাদীস নিয়ে আমাদের মুক্তমনা সমাজ প্রায়ই ধোঁয়াশা তৈরির চেষ্টা করে থাকে। তাদের দাবি হচ্ছে, এই হাদীসটি সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক। যেহেতু বুখারীর মতো প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থে এটির উল্লেখ পাওয়া যায়, আর হাদীস শাস্ত্রে বুখারীর মান যেহেতু সবার উর্ধ্বে, এবং মুসলিমরা যেহেতু এটাতে বিশ্বাস করে, তাই ইসলাম এবং মুসলিমদের একহাত নেওয়ার সুযোগ তারা ছাড়ে না।

পুরো ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনায় যাওয়ার আগে একটি বিষয় ক্লিয়ার করে নিই। সেটা হচ্ছে, বাংলাদেশের মুক্তোমনা নামধারী ইসলাম বিদ্বেষীদের কথাবার্তা আর লেখাযোখা পড়লে মনে হয় এরা একেকজন ইসলাম, কোরআন, হাদীসের উপরে পিএইচডি করে ফেলেছে। মনে হয়, কোরআন হাদীসের উপরে থিসিস করতে গিয়ে এরা বিরাট বিরাট ভুল ধরতে পেরেছে, যার ফলে তারা ইসলামের বিরুদ্ধে উঠেপড়ে লেগেছে।

আদতে আসল ব্যাপার হলো, কোরআন-হাদীস নিয়ে এদের জ্ঞান একেবারে শূন্যের কোঠায়। বলা চলে, এদের শতকরা ৯৯ ভাগ আরবি পড়তেই জানেনা।

তাহলে এরা সমালোচনা কীভাবে করে, তাইনা? আসল ব্যাপার হচ্ছে, এরা যে প্রশ্নগুলো ইসলাম নিয়ে করে থাকে, সেগুলো সব খ্রিষ্টান মিশনারীদের কাছ থেকে ধার করা।

খ্রিষ্টান মিশনারীদের এরকম প্রচুর সাইট আছে যেখানে বাংলা মুক্তোমনা ব্লগের মতো সারাদিন ইসলাম বিদ্বেষীতা চলে। বাংলাদেশের আর্টসে পড়ুয়া নাস্তিকবাহিনী (মূলত নাস্তিক নয়। এদের বেশিরভাগ একটি বিশেষ ধর্মের) সেখান থেকে ধার করে এনে নিজেরা বড় বড় 'হনু' সাজে। **সম্ভবত ঠিক এই কারণেই তারা নিজেদের ধর্মবিরোধি বলে পরিচয় দিলেও, কখনোই তারা খ্রিষ্টান ধর্মের বিরুদ্ধে 'টুঁ' শব্দও উচ্চারণ করেনা।** কৃতজ্ঞতার ব্যাপার-স্যাপার আছে কীনা, তাই হয়তো 🙂:-)

যাহোক, মূল আলোচনায় ফিরে আসি। আমরা প্রথমে হাদীসটা দেখে নিই। হাদীসটি আছে বুখারী শরীফের চতুর্থ খন্ডের ৫৪ নাম্বার অধ্যায়ে। হাদীস নাম্বার হচ্ছে ৪২১।

হজরত আবু যা'র (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,- **"রাসূল (সাঃ) আমার কাছে জিজ্ঞেস করলেন,- তুমি কী জানো (সূর্যাস্তের সময়) সূর্য কোথায় যায়?"**

আমি বললাম,- "আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ভালো জানেন"। তখন তিনি বললেন,- 'এটা (নির্দিষ্ট পথে চলতে চলতে) আল্লাহর আরশের নিচে এসে সিজদা করে এবং উদয় হবার জন্য অনুমতি চায় এবং এটাকে অনুমতি দেওয়া হয়। এমন একটা সময় আসবে যেদিন এটাকে আর অনুমতি দেওয়া হবেনা (পূর্বদিক থেকে উদিত হবার জন্য) এবং এটাকে যেদিক থেকে এসেছে সেদিকে ফিরে যেতে বলা হবে। সেদিন এটা (সূর্য) পশ্চিম দিক থেকে উদয় হবে"।

এখান থেকে যে প্রশ্নগুলো তারা করার চেষ্টা করে তা হলো নিম্নরূপঃ

১/ বলা হচ্ছে, সূর্য আল্লাহর আরশের নিচে যায়। আমরা জানি, সূর্য তার নিজ কক্ষপথেই থাকে, কোথাও যায় না। তাহলে এইটা কীভাবে সম্ভব যে, সূর্য আরশের নিচে যায়?

২/ সূর্য কীভাবে সিজদা করতে পারে? এই প্রশ্নের সাথে সম্পূরক প্রশ্ন হচ্ছে,- সিজদা করতে হলে সূর্যকে তার কাজ (ঘূর্ণন) থামাতে হবে। জোতির্বিজ্ঞান বলছে, সূর্য নিজ কক্ষপথে অবিরত ঘূর্ণন অবস্থায় থাকে। তাহলে সূর্য সিজদাটাই বা করে কখন আর অনুমতিটাই বা পায় কখন?

৩/ সূর্য পশ্চিম দিক থেকেই বা কীভাবে উদিত হবে? এটা কী বিজ্ঞানসম্মত কীনা?

প্রথমে এক নাম্বার প্রশ্নটা নিয়ে ভাবা যাক। এটার উত্তর জানার জন্য আমাদেরকে আগে জানতে হবে আল্লাহর আরশ কোথায়। আল কোরআন, সহী হাদীস এবং সালাফদের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, আল্লাহর আরশ হচ্ছে সবকিছুর উর্ধ্বে। অর্থাৎ, দৃশ্যমান-অদৃশ্যমান (পৃথিবী, আকাশ, গ্যালাক্সি, পদার্থ) এই মহাবিশ্বের সবকিছুর উপরে আল্লাহর আরশ অবস্থিত। এই "সবকিছুর" মধ্যে কিন্তু সূর্যও পড়ে। সুতরাং, "সূর্য আল্লাহর আরশের নিচে কিভাবে যায়" প্রশ্নটা অবান্তর। কারণ, সূর্য নিজেই আলটিমেটলি আল্লাহর আরশের নিচেই আছে। আল্লাহর আরশের নিচে যাওয়ার জন্য সূর্যকে আলাদাভাবে তার কক্ষপথ ছাড়তে হয়না। নিজ কক্ষপথে থেকেই সূর্য আল্লাহর আরশের নিচে অবস্থান করছে।

দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, সূর্য কীভাবে সিজদা করতে পারে?

এটা বোঝার আগে আমাদের বুঝতে হবে, সিজদা বলতে আমরা যা বুঝি, এখানেও এই অর্থ বোঝায় কীনা? সিজদা আমরা কীভাবে দিই? হাত-পা মাটিতে রেখে, মাথা-নাক-কপাল মাটিতে স্পর্শ করাই হলো আমাদের সিজদার পদ্ধতি।

সূর্যের কী হাত-পা আছে? নাক-কপাল আছে? যদি না থাকে, তাহলে সূর্য সিজদা কীভাবে দেয়?

নাস্তিক তথা ইসলাম বিদ্বেষীদের বড় সমস্যা হচ্ছে, তারা সবকিছুর আক্ষরিক অর্থ করে থাকে। কোরআন এবং হাদীসের কিছু কথা আছে সাহিত্যের মতো করে। রূপক, উপমা যেভাবে আমএয়া ব্যবহার করি।। এই কথাগুলোর অর্থ যদি আপনি আক্ষরিক ধরেন, তাহলে কিন্তু বিপদ। সাহিত্যে এই "মেটাফোর" নিয়ে গাদা গাদা বইপত্র আছে। বাংলা নাস্তিকরা আর যাইহোক, সাহিত্যটা কিন্তু ভালো পড়ে থাকে।

একটা এক্সাম্পল দিই। জীবনানন্দ দাশ উনার এক কবিতায় লিখেছেন,- "বিষণ্ণ বিকেলে আমি পকেটে আকাশ নিয়ে ঘুরি"

এখন বলুন, পকেটে কী আকাশ নিয়ে ঘুরা যায়? এইটাকেই বলে মেটাফোর। এটা না বুঝলে আপনার কাছে জীবনানন্দ দাশকে স্রেফ একজন পাগল মনে হবে। কিন্তু এর গভীরতা বুঝলে, জীবনানন্দকে আপনার কাছে শেক্সপিয়ার কিংবা দস্তয়ভস্কির চাইতেও বেশি ভালো লাগবে।

এবার আসুন সূর্যের সিজদা নিয়ে। সিজদা মানে আমরা কী বুঝি? কারো কাছে বিনত হওয়া, অবনত হওয়া, অনুগত হওয়া। আরো অর্থ করা যায়, যেমন- রুলস মেনে চলা , নিয়মাধীন হওয়া ইত্যাদি।

সূর্যের সিজদাও কী আমাদের মতো হতে হবে? আচ্ছা বলুন তো, আপনার 'বসা' আর দইয়ের 'বসা' কী এক?

আমরা যে বলি, দধি বসেছে বা দুধের উপর ছনা (আমাদের আঞ্চলিক ভাষায় ছানা বলি) বসেছে।

দুধের উপর ছানা কী আমাদের মতোই বসে? হাত পা গেঁড়ে? দুইটাই তো বসা। কিন্তু দুইটা বসাই কী এক? এক না।

তাহলে সূর্যের সিজদাকে কেনো আমাদের সিজদার মতোই হতে হবে?
তাহলে, বুঝা গেলো , সূর্যের সিজদা আর আমাদের সিজদা এক নয়।

এবার আসুন, সিজদা দেওয়ার জন্য কী সূর্যের থেমে যাওয়াটা জরুরি?
এই জিনিসটা বোঝার জন্য একটা জিনিসের অবতারণা করি। আগেই বলেছি, মেটাফোরিক্যাল জিনিসগুলোকে আমাদেরকে ঠিক সেভাবেই ভাবতে হবে। আক্ষরিক অর্থ করা যাবেনা।
স্কুল লাইফে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় মেয়েদের কমন একটা খেলা দেখতাম। খেলাটার নাম হলো– 'চেয়ার খেলা'।
এই খেলার নিয়ম হচ্ছে– গোলাকারভাবে কিছু চেয়ারকে সারিবদ্ধভাবে সাজিয়ে রাখা হয়। একটা মিউজিক প্লেয়ারের ব্যবস্থা থাকে। প্রতিযোগীরা সারিবদ্ধভাবে সাজিয়ে রাখা এই চেয়ারগুলোকে কেন্দ্র করে চক্রাকারে ঘুরতে থাকে। যতোক্ষণ পর্যন্ত না মিউজিক অফ হচ্ছে, প্রতিযোগীরা এই চেয়ারগুলোকে কেন্দ্র করে ঘুরতে থাকে। মিউজিক অফ হওয়া মাত্র টুপ করে বসে পড়ে।

চিন্তা করে দেখুন, প্রতিযোগীদের কাজ হচ্ছে চেয়ারগুলোকে কেন্দ্র করে চক্রাকারে ঘুরবে। তারা কতক্ষণ ঘুরবে? যতক্ষণ পর্যন্ত না মিউজিক অফ হচ্ছে।
তারা কিন্তু নির্দিষ্ট একটা পয়েন্ট (নিজ নিজ চেয়ার) থেকে খেলাটা শুরু করে। এখন, একবার চক্রাকারে ঘুরে নিজ নিজ চেয়ারের কাছে এসে কোন প্রতিযোগী কি 'গেম ডিরেক্টর' কে বলে, "স্যার, আমি কী পরের চক্র ঘুরে আসবো?" বলে না।
বলেনা , কারণ– পরের চক্র দেওয়ার পারমিশানটা তার জন্য একটা চলমান (On Going) প্রক্রিয়া। তাকে চেয়ারের কাছে এসে থেমে স্যারের অনুমতি নিয়ে পরের চক্র দিতে হচ্ছেনা। নিজের চেয়ারের কাছে এসে না থেমেই সে দ্বিতীয় চক্কর দিতে পারবে, কারণ অনুমতিটা বলবৎ একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত। কতক্ষণ সেই সময়? যতোক্ষণ না মিউজিক অফ হচ্ছে।

ঠিক এভাবেই সূর্যের জন্য একটা নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দেওয়া আছে। সেই সময় পর্যন্ত সে এভাবেই চক্রাকারে ঘুরতে থাকবে। এই ঘুরার মধ্যেই সে দুটি কাজ করবে। একটি হলো– নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সে ঘুরবে, অন্যটা হলো,- সে নির্দিষ্ট পয়েন্টে এসে (ধরা যাক সেটা আল্লাহর আরশের কেন্দ্র বরাবর) আল্লাহর কাছে পরেরবার ঘুরার (উদিত হওয়ার) জন্য অনুমতি চাইবে। কিন্তু এই অনুমতি নেওয়ার জন্য তাকে তার গতি স্তিমিত করতে হবেনা। থামতে হবে না। কারণ, খেলার প্রতিযোগীর মতোই তার জন্যও অনুমতিটা একটা চলমান (On Going) প্রক্রিয়া।
সুতরাং, অনুমতি নেওয়ার জন্য সূর্যের লুটে পড়ার বা থেমে যাবার কোন দরকার নেই। সূর্য

তার On Going Process এর মধ্যেই সেটা সেরে নেয়।
(And after all, Allah knows best)

তৃতীয় প্রশ্ন– সূর্যের পশ্চিম দিক থেকে উদিত হওয়াটা কী বৈজ্ঞানিক?
এটা নিয়ে বেশি কথা বলতে চাই না, কারণ, অনেক বিজ্ঞানীই এটা প্রেডিক্ট করেছেন যে, সূর্য তার সমস্ত তাপ হারানোর প্রাক্কালে তার উদয়–অস্তের দিক চেইঞ্জ করে ফেলতে পারে। চেইঞ্জ হয়ে যেতে পারে পৃথিবীর দিকসমূহ। তারা নির্দিষ্ট করেই বলেছে, - সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদয় হতে পারে। ব্রিটেইনের লিডিং নিউজ পেপার "ডেইলি এক্সপ্রেস" শিরোনাম করেছে–
"Sunrise in the west: North could be south as earth's magnetic poles switch"
আই হোপ, বিজ্ঞানের ধোঁয়া তোলা আমাদের মুক্তোমনাগণ এটলিস্ট বিজ্ঞানীদের বাণীকে বিনাবাক্যে মেনে নিবে 🙂:-)

সংযুক্তি– একটি প্রশ্ন ক্লিয়ার করা হয়নি। সূর্য যদি আরশের নিচেই থাকে, তাহলে আলাদাভাবে আবার আরশের নিচে যেতে বলার কারণ কী?

সিম্পল। ধরুন, একটি পুরো জায়গাজুড়ে মসজিদ আছে। এখন,মসজিদের ঈমাম সাহেব যদি আপনাকে বলে, - 'মসজিদ থেকে আমার চশমাটা নিয়ে আসুন।'
আপনি কী মসজিদ বলতে কেবল মসজিদের প্রথম কক্ষটিকেই ধরে নিবেন? নাহ। মসজিদে অনেকগুলো স্থান আছে। মিম্বর আছে। সবগুলোই মসজিদের আওতাভুক্ত। এমতাবস্থায়, মিম্বরকে আলাদাভাবে উল্লেখ না করা মানে এই না, মিম্বর মসজিদের বাইরের কিছু। সেরকম, সূর্য আরশের নিচেই আছে কিন্তু একটা পয়েন্ট নির্ধারিত আছে যেখানে এসে এটি অনুমতি নিবে, (চেয়ার খেলায় যেমন প্রত্যেকের নির্দিষ্ট একটা চেয়ার থাকে যেখান থেকে সে শুরু করে) যেরকম মসজিদের একটা নির্দিষ্ট জায়গায় (মিম্বরে) এসে আপনি ঈমামের চশমাটা খুঁজে পাবেন।
এখন আপনি পাল্টা প্রশ্ন করতে পারেন না, - 'হুজুর আপনি মসজিদ বলেছেন, মিম্বর বলেন নি.... 🙂:-)

প্রথম কমেন্টে লিংক দ্রষ্টব্য।

আমরা কেবল সমাধানের পথ বাতলে দিতে চাই।

বাংলাদেশের ইতিহাসে ধর্ষণের ঘটনাগুলো যদি পরম্পরায় সাজাই, তাহলে কতোটা ঘটনায় মাদ্রাসা বা মাদ্রাসা সংশ্লিষ্ট লোকগুলোর সংস্পর্শ পাওয়া যাবে?
এমন কোন নজির আছে কী যে, মাদ্রাসা থেকে মদ, ইয়াবা, ফেন্সিডিল সহ গ্রেফতার হয়েছে কোন মাদ্রাসা ছাত্র?
অথবা, মদ্যপ অবস্থায় নারী নিয়ে অসামাজিক কর্মকান্ডে লিপ্ত অবস্থায় হাতেনাতে ধরা পড়াদের মধ্যে কতোজন মাদ্রাসা ছাত্র থাকে?
শিক্ষক পেটানোর ঘটনাগুলোর মধ্যে কতোজন থাকে মাদ্রাসার?
খুবই সাম্প্রতিক ধর্ষণের ঘটনাগুলোতে কী কোন মাদ্রাসা ছাত্র জড়িত ছিলো? বা, ধর্মীয় লেবাস পরা, একনিষ্ঠতার সহিত ধর্ম পালন করা কোন ধার্মিক ছেলে?
বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে নারী নিয়ে ফুর্তি করতে গিয়ে ধরা পড়াদের ক'জন দাঁড়ি-টুপিওয়ালা?
ধর্মীয় পরিবেশে বড় হয়েছে, ধর্মীয় শিক্ষা লাভ করেছে এরকম কোন মেয়ে ঐশী হয়ে উঠেছে বা হোটেলে বন্ধুর দাওয়াতে গিয়ে পালাক্রমে ধর্ষণের শিকার হয়েছে- এমন ঘটনা কী বাংলাদেশের ইতিহাসে আছে? নাই।

তবে, মাদ্রাসায় বা হুজুর কর্তৃক ঘটা কিছু অপ্রীতিকর ঘটনা আমরা মিডিয়া মারফত জানতে পারি। সেগুলোর পরিমাণ আমাদের কথিত সেক্যুলার আধুনিক সমাজে ঘটা ঘটনাগুলোর তুলনায় অত্যন্ত অপ্রতুল।
এখানে আমাদের দেখতে হবে ধর্মের শিক্ষা আর সেক্যুলারিজমের শিক্ষাটা কী?
হুজুর বা মডার্ণ তরুণ কী করেছে সেটা আলোচ্য না। আলোচ্য হচ্ছে- **কোথায় কী শিক্ষা দেওয়া হয়।**

আমরা বারবার বলি, আমাদের তরুণ সমাজের নৈতিক অবক্ষয়ের মূলে রয়েছে ধর্ম এবং ধর্মীয় শিক্ষা থেকে বিচ্যুতি।
আর, এর পেছনে প্রধান নিয়ামক হিসেবে কাজ করছে আমাদের সেক্যুলার শিক্ষাব্যবস্থা, যেখানে ধর্ম এবং ধর্মীয় শিক্ষা- দুটো বরাবরই অবহেলিত।

আজকের এই যে বদরুল, সাদমান, শাফাত নাঈম, এই যে ঐশী- এই চরিত্রগুলো আমাদের পরিবার এবং শিক্ষাব্যবস্থায় সেক্যুলারিজম ঢুকানোর ফল নয় কী?
আমরা বলেছি, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় ধর্মীয় শিক্ষাকে প্রমোট করুন। ধর্মের বিধান, ধর্মে নারীদের পর্দার বিধান, পুরুষদের পর্দার বিধান, মেলামেশার বিধান- এসব আমাদের তরুণ প্রজন্ম শিখতে থাকুক এবং প্রাত্যহিক জীবনে এসব যাতে তারা মেনে চলতে পারে, সে ব্যবস্থা করা হোক।

আমাদের সেক্যুলার সমাজ আমাদের কথার পাত্তা দিলো না। আমাদের পশ্চাৎপদ, গোঁড়া, মৌলবাদী বলে হেঁয় করলো, তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করলো।

ফলাফল- আজকে আমাদেরকে দেখতে হচ্ছে বদরুলদের, সাদমান, সাফাত, নাঈমদের। আজ আমাদের দেখতে হচ্ছে ঐশীর মতো ছোট্ট কিশোরির করুণ জীবন। আজ আমাদের প্রত্যক্ষ করতে হচ্ছে 'হোটেলে এসে পালা ধর্ষিত হওয়া' আমাদেরই বোনদের ক্রন্দন। তাদের থানা থেকে আদালত, আদালত থেকে থানায় ঘুরতে হচ্ছে বিচার চেয়ে।

আমাদের সেক্যুলার সমাজ এবং তার ধর্মবিরোধী শিক্ষাব্যবস্থা কী এর দায় এড়াতে পারে? নাহ, পারেনা।

প্রশ্ন উঠতে পারে, সেক্যুলার শিক্ষাব্যবস্থা তো কাউকে ধর্ষক হতে বলেনা। তাহলে সেক্যুলার শিক্ষাব্যবস্থার বিরুদ্ধেই বা আমাদের কেনো এই বিষোদাগার?

জ্বী, সেক্যুলার শিক্ষাব্যবস্থা কাউকে ধর্ষক হতে বলেনা ঠিক, কিন্তু ধর্ষক বানাবার সমস্ত উপকরণ নিয়ে এটি প্রস্তুত থাকে।

রাত-বিরাতে, হোটেলে, পার্কে, নারী-পুরুষের 'অবাধ মেলামেশা' কে যেখানে যুগের চাহিদা বলে দেখানো হয়, সেখানে 'ধর্ষণ' কেনো সেই যুগের চাহিদার তালিকাভুক্ত হবে না?

জ্বী না। আমরা ধর্ষণকে 'ধার্মিক-অধার্মিক' 'টুপি-দাঁড়িওয়ালা' 'টুপি-দাঁড়িওয়ালা বিহীন' ক্যাটাগরিতে ফেলে জাস্টিফাই করছি না। ধর্ষক ধর্ষকই। সে দাঁড়িওয়ালা হোক বা দাঁড়িবিহীন।

টুপিওয়ালা হোক বা টুপিবিহীন।

আমরা কেবল সমাধানের পথ বাতলে দিতে চাই।

ধর্মীয় শিক্ষা এবং সেক্যুলার শিক্ষার মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধ এবং নৈতিক অবক্ষয়ের পার্থক্যটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে চাই, আর কিছুনা।

আমার সেক্যুলার ভাই ব্রাদারেরা এবার প্রস্তাব দিচ্ছেন, - ধর্ষকদের যেনো লিঙ্গ কেটে ফেলা হয়।

অতি উত্তম প্রস্তাব। ধর্ম যিনার (ধর্ষণ) অপরাধে একশ করে বেত্রাঘাত করতে বলে, আর আপনারা লিঙ্গ কেটে নিতে চাচ্ছেন। ইনডিরেক্টলি, আপনারাও কী ধর্মীয় আইনের মতো করেই ভাবছেন না? আপনারা কী অনুধাবন করছেন না ধর্ম কেনো এই আইনগুলোর ব্যবস্থা রেখেছে?

বলতে পারেন, তাহলে কী আমরা চাচ্ছি বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে 'ইসলাম শিক্ষা' বই বাধ্যতামূলক করতে?

একদমই না। আমরা তা বলছিনা। আমরা বলছি, ধর্মীয় শিক্ষার পরিবেশটা গড়ে তুলুন। পাঠ্যবইয়ে 'ও তে ওড়না' দেখলেই 'চ্যাঁত' করে উঠার যে সংস্কৃতি আপনারা গড়ে তুলছেন বা তুলতে চাইছেন, তা বন্ধ করুন।

তাই আসুন। ধর্মবিদ্বেষ ছাড়ুন। আমরা আগামীতে আর কোন সাফাত, নাঈম, সাদমানদের দেখতে চাই না। আমরা চাইনা, আগামীতে আবার আমাদের সেক্যুলার সমাজ 'লিঙ্গ কর্তন'

আন্দোলনে নামুক। তাই, ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি বিদ্বেষ ছাড়ুন। এটাকে সকল স্তরে বাস্তবায়নে চলুন পরস্পর পরস্পরের সহযোগী হই। 🙂:-)

সেক্যুলার ডিজিস

আমাদের সেক্যুলার সমাজের লোকজন, যারা নিজেদেরকেই একমাত্র 'যুগোপযোগী' 'আধুনিক' 'মডারেট' 'প্রগতিশীল' ভাবতে ও প্রচার করতে পছন্দ করেন, তারা ইদানীং হরহামেশাই একটা অস্বস্তিতে ভুগছেন।

তাদের অস্বস্তির কারণ হচ্ছে, এরা এতোদিন বলে এসেছে, মাদ্রাসায় পড়া মানেই 'জগত থেকে ছিটকে যাওয়া', 'যোজন যোজন পিছিয়ে পড়া' 'যুগের সাথে তাল মেলাতে না পারা' ইত্যাদি। দাঁড়ি-টুপি ওয়ালা কোন তরুণ দেখলেই তারা ভাবতো গ্রাম থেকে উঠে আসা কোন চাষা ভুষার ছেলে হবে হয়তো টাকা পয়সার অভাবে ছেলেকে 'ইংলিশ' বা অত্যাধুনিক 'বাংলা মিডিয়ামে' পড়াতে না পেরে 'কোরানে হাফেজ' বানিয়ে ছেড়েছে। পর্দা হিজাব করা কোন তরুণী দেখলেই নাক সিঁটকিয়ে বলেছে,- 'অহ, এইগুলা তো দুনিয়ার আলো-বাতাসের বাহিরের জীব। পড়ালেখা না করে অন্দর মহল পাহারা দেয়।'

কোথাও 'টুস' করে শব্দ হলেই টিভি স্ক্রীনে চোখ বড় বড় করে তাকায় এরা। তাদের চক্ষু খুঁজেফিরে হাতে হ্যান্ডক্যাপ পরা টুপি-দাঁড়িওয়ালা কোন আসামী।
দেখামাত্রই তারা লাফিয়ে উঠে সোনার হরিণ পাওয়ার মতোই। তাদের ঘুমালু চোখের ঘুম তখন গুম হয়ে যায়। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে উঠে ফতোয়ার ঝড়। মাদ্রাসা এবং তার শিক্ষাব্যবস্থাকে এক হাত নিয়ে তারপর তাদের শান্তি!

কিন্তু, সমাজের চিত্রপট পাল্টে গেলো হঠাৎ করেই।

শাহবাগ আন্দোলনের ঠিক পর থেকেই, অকস্মাৎ যেন একটা 'নীরব আন্দোলন' শুরু হলো দেশে।

এ আন্দোলন যতোটা না রাজনৈতিক, তারচেয়ে বেশি 'আদর্শিক'....

হঠাৎ করেই দেশে সূচিত হলো নতুন এক ধারা। বইতে লাগলো সম্পূর্ণ ভিন্ন এক বাতাস। দেখা গেলো, যাদের এতোদিন 'হুজুর' 'গেঁয়ো' 'ব্যাকডেটেড' বলে সেক্যুলার সমাজ উপহাস করে এসেছে, অবজ্ঞা-অবহেলা করে এসেছে, তিরস্কার করেছে, সেই মাদ্রাসা এবং দাঁড়ি-টুপিওয়ালারা অনেক বেশি ভাবতে শুরু করে দিলো। এতোবেশি ইতোপূর্বে তারা হয়তো আর ভাবেনি। তাদের চিন্তার রাজ্যে ঘটে গেলো এক অভূতপূর্ব আন্দোলন।

খুবই আশ্চর্যজনক ব্যাপার! এরা সাহিত্য পড়ছে। সাহিত্য লিখছে। এরা ইংরেজি পড়ছে। ইংরেজি লিখছে। ইংরেজিতে কথা বলছে।

বিজ্ঞান পড়ছে, বিজ্ঞান পড়াচ্ছে। এরাও আড্ডা দেয়। সংস্কৃতি নিয়ে ভাবে, ইতিহাস নিয়ে কথা বলে।

'শাহবাগ আন্দোলন' এক্ষেত্রে বিশাল একটি ভূমিকা রেখেছে। শাহবাগ আন্দোলন না হলে তাদের চিন্তার জগতে, ভাবনার জগতে এই দোলা লাগতে হয়তো আরো সময় লাগতো, কিংবা

লাগতোই না।

এর জন্য 'শাহবাগ আন্দোলন' একটি ধন্যবাদ পেতে পারে।

শাহবাগ আন্দোলন না হলে আমরা জানতেই পারতাম না রাজীব হায়দারকে, আমরা চিনতেই পারতাম না নীলয়, ওয়াশিকুরদের।

বস্তুত, বিশ্বাসী আর অবিশ্বাসীদের যে দ্বন্ধ, সেই দ্বন্ধে অবিশ্বাসীদের যে একচেটিয়া রাজত্ব ছিলো, **শাহবাগ না হলে সেখানে বিশ্বাসীদের পদচারণা হয়তো কখনোই পড়তোই না।** তাই, তোমায় ধন্যবাদ হে শাহবাগ, শত্রু-মিত্রের এই খেলায় পক্ষগুলোকে স্পষ্ট করে দেবার জন্যে....

বলছিলাম, দাঁড়ি-টুপিওয়ালাদের নিয়ে সেক্যুলার সমাজের এই যে অরুচি, সেটা উদগীকরণে বেশ ভাঁটা যাচ্ছে আজকাল।

আমাদের সেক্যুলার সমাজ মাদ্রাসা তথা ইসলাম-মুসলিমদের ধুঁয়ে দেবার কোন যুতসই ইস্যুই পাচ্ছেনা ইদানীং। চাতক পাখির মতোন তাকিয়ে থাকেন উনারা, কোথাও কোন ঘটনায় কোন দাঁড়িওয়ালা, টুপিওয়ালা ধরা পড়লো কী না, কোথাও কোন খুনের ঘটনায় বা বোমা নিক্ষেপের আগে কেউ 'আল্লাহু আকবর' বলেছে কীনা,

কিন্তু বিধিবাম! গুলশান জঙ্গী হামলা থেকে শুরু করে তনু, মিতু, ঐশী এবং সর্বশেষ খাদিজা- সবখানেই উনাদের 'মডারেট' 'প্রগতিশীল' এবং 'আধুনিক' সমাজের প্রতিনিধিত্বকারীগণ রাজত্ব করছেন।

এহেন অবস্থায় উনারা না পারছিলেন মাদ্রাসাকে গালি দিতে, না পারছিলেন উনাদের সো কল্ড প্রগতিশীলতাকে ধুঁয়ে দিতে।

অনেকদিন পর, আজ জানা গেলো, কোথায় নাকী এক ইমাম (আদতে জানতে পারলাম উনি নাকি ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অধীনে পরিচালিত একটি এলাকার মসজিদ ভিত্তিক শিশু শিক্ষার শিক্ষক) এক কিশোরীকে ধর্ষণ করেছে বা করার চেষ্টা করেছে।

ব্যস! আমাদের প্রগতীপাড়ায় ঈদের আমেজ। শুরু হয়ে গেলো ইসলাম আর মুসলিমদের 'ধুঁয়ে দাও' প্রকল্প।

খেয়াল করলাম, একইদিনে আরো দুটি ধর্ষণের খবর পাওয়া গেছে।

একটা পার্টিতে, দুই বান্ধবীকে দাওয়াত দিয়ে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করেছে দুই মডার্ণ যুবক। তাদের মুখে দাঁড়ি নেই, মাথায় টুপি নেই। তাদের একজন আবার প্রভাবশালী 'আপন জুয়েলার্স' এর মালিকের কী যেন লাগে বলেও শুনলাম।

আরেকটি জায়গায় পড়লাম, পুলিশের একজন কর্মকর্তা দ্বারা এক মহিলা রেপড!!

যাহোক, পরের দুটি ঘটনাকে পেছনে ফেলে পুরোদিন আমাদের সেক্যুলার সমাজের কাছে অগ্রগণ্য ছিলো ঈমামের ঘটনাটা (এটা আদৌ ঘটেছে কীনা আমি জানি না)।

এই ঘটনাকে নিয়ে, সকাল থেকেই উনারা মাদ্রাসা শিক্ষা, ধর্মীয় শিক্ষা এবং ইসলাম ধর্মকে তুলোধুনো করে চলেছেন।

মজার ব্যাপার, গুলশানের ঘটনার জন্য যখন আমরা ইংলিশ মিডিয়ামের শিক্ষার দিকে আঙুল তুললাম, যখন খাদিজা-বদরুল ইস্যুতে, ঐশী ইস্যুতে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার দিকে, আধুনিক

ফ্যামিলি তন্ত্রের দিকে আঙুল তুললাম, তখন সেক্যুলার সমাজের মুখপাত্রগণ জানালেন, - এসব নিতান্তই ব্যক্তিগত দোষ। এর দায় প্রতিষ্ঠান বা পরিবারের নয়।
কিন্তু, সেই একই সেক্যুলারেরা, আজকের তিন তিনটি ঘটনার মধ্যে 'চুস এন্ড পিক' অপশানে ঈমামের ঘটনাকে বেছে নিয়ে, ব্যক্তি ঈমামের অনৈতিক কাজের জন্য ইসলাম এবং মুসলিমকে দায়ী করছেন, হোয়াই?
কোন ঈমাম যদি অনৈতিক কাজ করে, উনি তার শাস্তি পাবেন। তার শাস্তির বিধান ইসলামও বাতলে দিয়েছে। কিন্তু, উনাকে কেন্দ্র করে ধর্মকে এ্যাটাক করাটা মানসিক রোগ। ম্যান্ট্যাল সিকনেস! এইটাকে আমরা 'সেক্যুলার ডিজিস' বলি।
সমস্যার নাম ইসলাম? নাকী, সমস্যার জায়গা ইসলাম?

'তোমায় ভালোবাসি, হে আমার সহধর্মিণী'

বিবাহের আগে শেষ যেবার বাড়িতে গিয়েছিলাম, সেবার হাতে বেশকিছু দিন ছুটি ছিলো। বাড়ি আসার আগে আম্মা বারবার ফোনে জিজ্ঞেস করতেন কতোদিনের জন্য আসছি। আমি বলতাম, - 'এই হবে সপ্তাহখানেক।'
আমার উত্তর শুনে ফোনের ও'পাশে আম্মা চেঁচিয়ে উঠতেন। বলতেন,- 'তোমাকে না বলেছি হাতে বেশি সময় নিয়ে আসতে? একসপ্তাহ দিয়ে কী হবে?'

এক সপ্তাহ। মানে, পুরোপুরি সাত সাতটা দিন।
সাত দিনে কী না করা যায়? আমেরিকা হিরোশিমার বুকে ইতিহাসের ভয়াবহ পারমাণবিক বোমাটা ছুঁড়ে মারতে সময় নিয়েছে কয়েক সেকেন্ড মাত্র। এতেই পৃথিবীর রূপ উলট-পালট হয়ে গেছে অনেকটাই। আর, আমার আম্মার কাছে সাতদিন একেবারেই নাকি কম।
যাহোক, আমি আম্মাকে বলতাম, - 'অফিসের নিয়মই এটাই। ৭ দিনের বেশি ছুটি কাটানো যায় না।'
আম্মা নাছোড়বান্দা! বলে,- 'অতশতো বুঝি না! একমাস নাহোক, পনের-বিশদিনের ছুটি নিয়ে হলেও আসো।'

গোটা পনের-দশেক ছুটি নিয়ে বাড়ি ফিরলাম। চাকরিজীবনে এরপূর্বে এতো দীর্ঘ ছুটি নিয়েছি বলেও মনে পড়ে না।
টানা চার বছর পরে বাড়ি ফিরছিলাম। মনে অদ্ভুত একটা প্রশান্তি কাজ করছিলো তখন। সারাদিন খোলা আকাশের নিচে খাবারের খোঁজে হন্যে হওয়া পাখিটা সন্ধ্যেবেলায় নীড়ে ফেরার সময় যেরকম সমস্ত ক্লান্তি, অবসাদ বাতাসেই বিলীন করে আসে, সেরকম আমিও সারাবছরের কাজের চাপ, মানসিক অশান্তি, চিন্তা- সবকিছুই যেন ইট আর পাথরের শহরে বন্ধক রেখে ফিরছি। নির্মল খুশিতে মাতোয়ারা আমার মন।
আমার শৈশবের মাঠ, নদী, দীঘি, বিল- সবকিছুই তখন আমাকে চুম্বকের মতোই টানছে। মায়ের ভালোবাসা আর বাবার আদরের পরমাত্মার এক অকৃত্রিম টান আমি খুব দূর থেকেও অনুভব করতে পারছি যেমনটা অনুভব করেছিলেন ইয়াকুব আলাইহিস সালাম ইউসুফ আলাইহিসসালামকে ফিরে পাওয়ার আগ মূহুর্তে।

বাড়িতে আসার পরেরদিন ছিলো আমার জন্য একটা চমক।
অপরিচিত কিছু লোক বাবার সাথে সোজা আমাদের অতিথি কক্ষে এসে বসলেন। এদের আগে কখনো দেখেছি বলে মনে পড়েনা আমার।
খুচরা আলাপ এবং আপ্যায়ন পর্ব শেষ হবার পরে বাবা আমাকে ডাক দিলেন বসার ঘর থেকে। আমি তখন জানালার পাশে, শুয়ে শুয়ে Jeffrey Archer এর 'Father's Last Sin' পড়ছিলাম। জানালার ও'পাশে, বাইরে হাসনাহেনা ফুল ফুটে সাদা হয়ে আছে। হাসনাহেনার

গন্ধে পুরো রুম মৌঁ মৌঁ করছিলো।
বাবা আমায় ডাক দিয়ে ভিতরে যেতে বললেন।
আমি আড়মোড়া ভেঙে উঠে, কোনমতে শার্টটা গায়ে দিয়ে, চশমাটা চোখে লাগিয়েই হাঁটা দিলাম বসার ঘরের দিকে।

রুমে ঢুকেই সালাম দিলাম। বাবা বললেন, - 'বসো।'
আমি সোফার এক পাশটায় জড়োসড়ো হয়ে বসলাম। মাথার চুল উস্কোখুস্কো।
বাবা ব্যবসায়িক মানুষ। পড়াশুনা কম বলে হিসাবপত্রে প্রায়ই গণ্ডগোল পাকিয়ে বসেন। যখন বাড়িতে ছিলাম, তখন বাবার হিসাবপত্র আমিই দেখতাম। তখন এরকম ডিলাররা এসে বাসায় বসতেন। বাবা আমাকে ঠিক এভাবেই ডাক দিতেন। আমি ভোঁ দৌঁড়ে চলে আসতাম। বাবাকে খুব ভয় পেতাম কিনা, তাই।

বাবা বললেন, - 'এ হলো আমার ছেলে।'
উপস্থিত ভদ্রলোকগুলো আমার চেহারার দিকে ভারি অদ্ভুতভাবে তাকালেন। ডিটেক্টটিভরা যেরকম সন্দেহভাজন কারো দিকে তাকান, সেরকম। আমি কেমন ভ্যাঁবাচ্যাকা খেলাম। অস্বস্তি লাগছিলো। চৈত্রের তাবদাহে চারদিক তখন শুকিয়ে কাঠ হবার জোগাড়। আমার গলাও পানিবিহীন দিঘীর মতো শুকিয়ে গেলো সেই মূহুর্তে।
উপস্থিত লোকদের একজন বললো,- 'বাবা, তোমার নাম?'
আমি খুবই নিঁচু স্বরে উত্তর দিলাম,- 'সাদিকুল ইসলাম সাবিত।'

তারা আর কিছুই জিজ্ঞেস করেনি। বাবা আমায় বললেন,- 'যাও।'
আমি বাধ্য ছেলের মতো উঠে এসে আবার Jeffrey Archer এর 'Father's Last Sin' এ ডুব দিলাম। জানালা দিয়ে তখনও ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ছে হাসনাহেনার মাতাল করা গন্ধ.......

সেদিন রাতে বুঝতে পারলাম যে আমার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। পাত্রীপক্ষের আমাকে দেখে পছন্দ হয়েছে। আমার পরিবারও পাত্রীকে পছন্দ করেছে।
সবাই রাজি। আম্মা আমার মতামত জানতে চাইলেন। আমি বরাবরের মতোই নিশ্চুপ ছিলাম। নীরবতা সম্মতির লক্ষণ জেনে সবকিছু ঠিকঠাক হয়ে গেছে।
ছোটবেলায় রবী ঠাকুরের 'হৈমন্তী' গল্পে অপুর কথা মনে আছে? তার বিয়ে ঠিক হবার পরে দূর সম্পর্কের কোন এক পিসির কাছেই সে হৈমন্তির একটি ফটোগ্রাফ দেখেছিলো কেবল। আমিও যে এমন একটা সময়ে এসে অপুর ভূমিকা নিয়ে নেবো, সে কথা কে–ই বা জানতো! !
আমার ছোট বোনের কাছে পাত্রীর একটি ফটোগ্রাফ জমা ছিলো। যদিও সেটি হৈমন্তি গল্পের মতোন আনাড়ি কারো হাতে তোলা না। বেশ দক্ষ হাতের ছোঁয়া আছে বুঝা যায়।
ফটোগ্রাফটি আমি দেখেছিলাম। ঠিক সেই মূহুর্তে আমার মনের মধ্যে একটা শিহরণ জাগার কথা ছিলো। কিন্তু, আমি তখনও নির্বাক ছিলাম। এমন নয় যে, বাবা মার পছন্দ করা পাত্রী আমার পছন্দ হয়নি। ব্যাপার হলো– আমার যে বিয়ে হবে, এটাই তখনো আমার বিশ্বাস

হচ্ছিলো না।
ঠিক এক সপ্তাহের মাথায় আমার বিয়ে হলো। মেয়েটার নাম ফাতিমা।

স্বভাবতই আমি খুবই লাজুক প্রকৃতির ছিলাম। ফাতিমা সামনে আসতেই আমি লজ্জায় জড়ো হয়ে পড়তাম। ব্যাপারটা যে কেবল আমার সাথেই ঘটতো, এমন না। খেয়াল করেছি, ঠিক একই ব্যাপার ফাতিমার সাথেও ঘটতো। সেও আমার সামনে এলে ভীষণরকম অস্বস্তিতে ভুগতো। যেন দৌঁড়ে পালাতে পারলেই বাঁচে।
দু'জন দু'জনকে বিয়ের আগে চিনতাম না। হঠাৎ একটা বন্ধন আমাদের দু'জনকে এক করে দিলো। এই হঠাৎ মেলবন্ধনের দূরত্বটা দু'জনের কেউ তখনো আমরা কাটিয়ে উঠতে পারিনি।

বিয়ের সাতদিন পরেই আমি চাকরিস্থলে ফিরে আসি। এই সাতদিনে ফাতিমার সাথে আমার খুব কমই কথা হয়েছে। আমি কথা বলার চেষ্টা করলেই সে কাঁচুমাচু শুরু করতো। মাঝে মাঝে হ্যাঁ, হু করতো, নয়তো মাথা নাড়তো।
আমি বুঝতে পারি, বিয়ের মাধ্যমে সম্পূর্ণ নতুন এক মানুষ, নতুন এক পরিবেশের সাথে মানিয়ে নিতে আমাদের দু'জনেরই খুব সময় দরকার।
চাকরিস্থল থেকে আমি দিনে দু'বার করে আম্মাকে ফোন দিতাম। কথা বলার পরে আম্মা ফোনটা ফাতিমার হাতে দিয়ে সরে আসতেন। ফাতিমাকে আমি সালাম দিতাম। সে সালাম নিতো বুঝতে পারতাম। আমি জিজ্ঞেস করতাম,- 'কেমন আছেন?'
(সম্পূর্ণ নতুন একজনকে 'তুমি' করে বলার জন্য তখনও আমি প্রস্তুত ছিলাম না)।
ফাতিমা খুবই ছোট্ট স্বরে বলতো,- 'ভালো।'
আমি জানি সেও জানতে চায় আমি কেমন আছি। কিন্তু জিজ্ঞেস করতে পারে না। জড়তা কাজ করে।

একবার ফোন এলো বাড়ি থেকে। আম্মা জানালেন ফাতিমার খুব জ্বর।
ফাতিমার অসুস্থতার কথা শুনে আমার বুকের ভেতরটা ধপ করে উঠলো। একটা অদৃশ্য কষ্ট অনুভব হলো। এটা কীসের? এমন হলো কেনো?
তার সাথে তো অল্প কিছুদিন আগেই আমার বিয়ে হয়েছে। দু'জন দু'জনকে পুরোপুরি বুঝেও উঠতে পারিনি তখনো। তাহলে? এই কষ্ট লাগা কিসের?
আমি বাড়িতে ফোন করা বাড়িয়ে দিই। একটু পর পর ফাতিমার খোঁজখবর নেওয়া শুরু করি। সে কেমন আছে, খাচ্ছে কি না, ঘুমাচ্ছে কি না, ঔষুধ নিচ্ছে কি না ইত্যাদি....
আমি বুঝতে পারি একটা অদৃশ্য, অস্পর্শ টান তৈরি হয়েছে আমার তার প্রতি। আমার একটা অংশ হয়ে উঠছে সে দিনে দিনে....

একবার ঈদে বাড়ি ফিরছিলাম। হঠাৎ, দূর্ভাগ্যবশঃত আমাদের গাড়িটার অন্য একটা গাড়ির সাথে ধাক্কা লাগে। কারো কোন প্রাণের ক্ষতি না হলেও আমরা বেশ কয়েকজন মারাত্মক রকম ইঞ্জুরড হই। আমাকে হসপিটালে ভর্তি করানো হয়। আমি তখন দেখেছি, আমার মা, বাবা, বোনের পরে আরো একজন মেয়ে ফুঁফিয়ে ফুঁফিয়ে আমার জন্য কাঁদছে। তারও চোখজোড়া জবা ফুলের মতো লাল। কতো রাত যে ঘুমায় নি কে জানে!

এই মেয়েটার নাম ফাতিমা। সম্প্রতিই আমাদের বিয়ে হয়েছে। সে লজ্জায় আমার সাথে কথাই বলতে পারে না। তাহলে? আমার জন্য সে কেনো কাঁদছে? সে কী বুঝতে শুরু করেছে আমাকে? সে কি বুঝতে শুরু করেছে আমাদের মধ্যকার আত্মিক টান? হয়তো.....

ফাতিমা যখন কনসিভ করে, তখন আমি আবারও লম্বা ছুটি নিয়ে চলে আসি বাড়িতে। আমার মনে আছে, তার যখন ডেলিভারি হবে, তখন সে জোরে জোরে চিৎকার করে কাঁদছিলো প্রসব বেদনায়।

আমি দিগ্বিদিক ছুটছিলাম। তার কান্নার শব্দে আমার চোখ দিয়েও অঝোর ধারায় পানি ঝরছিলো। বারবার আল্লাহকে বলছিলাম তাকে শেফা দিতে। তার কান্নার শব্দ, স্বর আমার বুকে যেন তীরের মতোন বিঁধে যাচ্ছিলো। সেই সময়টুকু যেন আমার জীবনের এক মহাকালরাত্রি! খুব করে চাইছি কেটে যাক।

আমি আল্লাহকে বলছিলাম, - 'হে আল্লাহ! ফাতিমাকে ধৈর্য্য দাও! ধৈর্য্য দাও।'

আমি অনুভব করলাম, আমি ফাতিমাকে ভালোবাসি। সে আমার জীবনের অংশ হয়ে উঠেছে। তাকে ছাড়া আমার চলবে না। আমি আরো অনুভব করলাম, ফাতিমাও আমাকে ভালোবাসে। আমাকে ছাড়াও তার চলবে না। আমরা দু'জনে একে অন্যের পরিপূরক।

এই যে এই নারী, তাকে তো আমি চিনতাম না। তবে কেনো তার জন্য আমার এতো ভালোলাগা? এতো ভালোবাসা? এতো প্রেম? এতো দরদ? এতো মায়া?

আমি স্মরণ করি আল্লাহর সেই আয়াত–

'তাঁর নিদর্শনের মধ্যে হল এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হতেই তোমাদের সঙ্গিণী সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা তার কাছে শান্তি লাভ করতে পার আর তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা ও দয়া **সৃষ্টি করেছেন। এর মাঝে অবশ্যই বহু নিদর্শন আছে সেই সম্প্রদায়ের জন্য যারা চিন্তা করে।**'- আর রুম, ২১

'বাবার কাছে পত্র'

প্রিয় বাবা,

আমি আপনার আদরের সন্তান। আপনি সবসময় চেয়েছেন আমি যেন মানুষের মতোন মানুষ হই। মানুষের মতোন মানুষ হওয়া মানে নিশ্চই দুই চোখ, দুই কান, দুই পা, এক মুখ, এক নাক বিশিষ্ট মানুষ বলতে ঠিক যা বুঝায়, তা হয়তো নয়।
মানুষের মতোন মানুষ হওয়া মানে আপনি যা চেয়েছেন তা হয়তো এরকম,- আমি যেন আদর্শিক, নৈতিক, মানবিক বোধ সম্পন্ন হিসেবে গড়ে উঠি।
বাবা, আমি মানুষের মতোন মানুষ হবার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করে যাচ্ছি।

সেই শিশুকাল থেকে আজ অবধি আপনি আমাকে আপনার বাহুডোরে, আদরের খাঁচায়, পরম মমতা আর ভালোবাসা দিয়ে আগলে রেখেছেন।
পূরণ করেছেন আমার সকল শখ, আহ্লাদ। মিটিয়েছেন আমার সমস্ত চাহিদা। আপনার আঙুল ধরে মক্তবে যাওয়া থেকে শুরু করে প্রাইমারীর সেই প্রথম পাঠ- সবই আজো আমার স্মৃতির পাতায় পরম যত্নে তোলা আছে।
যখন আমি প্রচন্ড কান্না করতাম, আপনি আমায় বুকে জড়িয়ে আদর করতেন। আমার গালে চুমু খেতেন।
প্রচন্ড বদমেজাজি ছিলেন শুনেছি। অথচ, আমার শৈশবে কখনো আমাকে জোরে একটি থাপ্পড় দিয়েছেন- এমনটি মনে পড়ে না।

কৈশোরে, যখন আমি জগৎটাকে একটু ভালোভাবে বুঝতে শুরু করেছি মাত্র, তখন আপনি আবির্ভূত হলেন সম্পূর্ণ এক নতুন ভূমিকায়।
আমায় হাতে-কলমে শেখাতে লাগলেন ভালো আর মন্দের মধ্যকার পার্থক্য। আমায় বুঝিয়েছিলেন কীসে আমার ভালো হবে, কীসে খারাপ।
যেবার স্কুল থেকে ফুটবল টুর্নামেন্ট খেলতে গিয়ে পা মচকে এসেছিলাম, সেদিন আপনি ব্যবসায়িক কাজে বাইরে ছিলেন। টেলিফোনে সে রাতে আম্মুকে খুব বকাঝকা করেছিলেন আমার জন্যে। তবুও, আমায় একটুও বকলেন না সেদিন। আম্মু আমার মচকে যাওয়া পায়ে মলম লাগাতে লাগাতে বিড়বিড় করে আমায় বকছিলো আর আপনার উপরে জমা ক্ষোভটা আমার উপরেই ঝাঁড়ছিলো।

যখন আমি স্কুলজীবন শেষ করে কলেজ জীবনে পা রেখেছি, তখনও প্রতিটা পদে পদে আপনি ছিলেন আমার ছায়া সঙ্গী। আমার সমস্ত প্রয়োজনে, সমস্ত আকাঙ্ক্ষায় আপনি ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিলেন সর্বদা।
কলেজ জীবন শেষ করে যখন বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে প্রবেশ করেছি, তখন হয়তো আপনি বুঝে গিয়েছিলেন যে, আপনার ছোট্ট বাবুটা আর ছোট্ট নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচে উঁচু সিঁড়িতে সে

তার পদচারণা দিয়ে ফেলেছে।
সেবার আমায় বলেছিলেন,- 'তোমার ভালো-মন্দ এখন থেকে তোমাকেই ঠিক করতে হবে। তোমার সিদ্ধান্ত তোমাকেই নিতে হবে। এখন তুমি যথেষ্টই বড় হয়েছো।'
আমি জানি আপনার সেদিনের সেই কথাগুলো ছিলো কেবলই আনুষ্ঠানিকতা মাত্র। জীবনের সিদ্ধান্তগুলো কীভাবে নিতে হবে, তার বীজ তো খুব ছোটবেলাতেই আপনি আমার মধ্যে রোপন করে দিয়েছেন। আপনি কেবল দেখতে চেয়েছেন, আপনার রোপন করা সেই বৃক্ষের শিকড় কতোটা গভীরে প্রোথিত হয়েছে।

বাবা, আজ পর্যন্ত জীবনের প্রতিটা সময়ে আমি আপনার সান্নিধ্য পেয়ে এসেছি। আপনার গাইডলাইন, আপনার নির্দেশনা, সবকিছুই ছিলো আমার জন্য জীবনের পাথেয়।
আমাকে মানুষের মতোন মানুষ করতে যতোটা কাঠখড় পুঁড়ানো দরকার, তার কোন কমতি হতে আপনি দেন নি।
আপনার সেই ছোট্ট বাবু, যাকে সুযোগ পেলেই কাঁধে নিয়ে ঘুরতেন, সে আজ যুবক হয়ে উঠেছে।

প্রিয় বাবা, আপনাকে আজ একান্ত কিছু বলতে ইচ্ছে করছে। আমার জীবনের প্রথম বন্ধু তো আপনিই। আমার প্রথম বন্ধু, প্রথম সহপাঠী, প্রথম সহচর, প্রথম খেলার সাথী- সবকিছুই আপনি। আমার জীবনে যা কিছু প্রথম, সবকিছুতেই আপনি আছেন।
বাবা, আমি এখন যথেষ্টই বড় হয়েছি। চলে এসেছি একটা কঠিন সময়ে, একটা কঠিন বয়সে। এই সময়, এই বয়স এতোটাই কঠিন যে, লজ্জা শরমের মাথা খেয়ে এই কঠিন বয়স আর কঠিন সময়ের কথা আপনাকে লিখতে বসে গেলাম। প্রথমেই, এরজন্য আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত। কিন্তু আমি মনে করি, জীবনের প্রতিটা কঠিন সময়ে আপনি যেভাবে আমার পাশে ছিলেন, ঠিক এই সময়টাতেও আপনার সান্নিধ্য, আপনার পরামর্শ, আপনার সাহায্য, সহযোগিতা আমার দরকার। শুধু দরকার নয়, খুবই দরকার।

বাবা, আমার যৌবন যুগের সাথে আপনার যৌবন যুগের একটা পার্থক্য আছে। ঠিক এই বয়সটাতে আমি প্রযুক্তির যে অভাবনীয় সুবিধা ভোগ করছি, আপনি তা আপনার সময়ে কল্পনাও করতে পারেন নি।
প্রযুক্তি সবকিছু আমাদের একদম হাতের মুঠোয় এনে দিয়েছে। এই সুবিধার যেমন বিশাল একটি ভালো দিক রয়েছে, ঠিক তেমনি রয়েছে বিশাল একটি খারাপ দিকও।
এখানে, এই ভার্চুয়াল বিশ্বে ভালো জিনিসগুলো যেমন আমাদের একদম হাতের নাগালে, ঠিক সেরকম খারাপ জিনিসগুলোও আমাদের একেবারে নাকের ডগায়।

প্রিয় বাবা! বর্তমান যুগ হলো একটি ফেৎনার যুগ।
এখানে, বাসা থেকে শুরু করে শহরের অলি-গলি, ক্যাম্পাস থেকে ক্যান্টিন, রাস্তাঘাট, পার্ক, উদ্যান, ইন্টারনেট থেকে শুরু করে মোবাইল ফোন, - সবখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে ফেৎনা। ফেৎনা বলতে আমি কী বুঝাতে চাইছি আপনি নিশ্চই এতক্ষণে ধরে ফেলেছেন। জ্বী হ্যাঁ।

যৌবনের এই চরম সময়ে এসে, চারদিকের এতো এতো চোখ ধাঁধানো দুনিয়াবি ফেৎনা থেকে আমি বাঁচতে চাই।

বাবা, আমার হাতে একটি স্মার্টফোন আছে। টেবিলের উপরে আছে একটি ল্যাপটপ। মন চাইলে নিষিদ্ধ বায়বীয় পাতায় ঢুঁ মারার মতো যথেষ্ট ডাটা সর্বদা আমার ফোনে মজুদ থাকে। কসম আল্লাহর! আমি চেষ্টা করি নিজেকে সংযত রাখার। আমি চেষ্টা করি নিজেকে সামলে রাখার। কিন্তু, আমার এই যে টগবগে তারুণ্য! শরীরে যৌবনের এই যে বারিধারা, এটাকে আমার বড্ড ভয় হয় বাবা।
আমি কতক্ষণ নিজেকে ধরে রাখতে পারবো?
ভয় হয়, যদি বিগড়ে যাই? যদি শয়তানের ওয়াসওয়াসায় পড়ে ভুলে যাই নিজের গন্তব্য? নিজের আদর্শ? যদি কোন সুদর্শিনী রমণীর ফাঁদে (খুব সচেতনভাবেই ফাঁদ বলছি, কারণ, বিবাহপূর্ব সকল বেগানা নারী-পুরুষের মধ্যকার অবাধ মেলামেশা, সম্পর্ক আমার ধর্ম হারাম করেছে) পড়ে বিসর্জন দিয়ে বসি আমার নৈতিকতা?
বড্ড ভয় করে বাবা, বিশ্বাস করুন।

ভাবছেন, এর থেকে পরিত্রাণের কী উপায় আছে? কী সলুশ্যনই বা আমি চাইছি আপনার কাছে,তাই না?
অকপটে বলি- বিয়ে........।
আমি আবারো দুঃখিত বাবা এভাবে বলার জন্যে।
আমাদের বয়েসী ছেলেদের বাবা-মায়েদের ধারণা,
ছেলে পড়াশুনা শেষ করে, ভালো চাকরি-বাকরি ধরে নিজের অবস্থানটা পাকাপোক্ত করতে পারলেই যেন সে বিয়ের উপযুক্ত হয়।
খুবই ভুল ধারণা বাবা, খুবই ভুল। এই পড়ালেখা শেষ করে, চাকরি-বাকরি জোগাড় করতে গিয়ে সন্তান যে কতোটা অধঃপতনে চলে যায়, তা যদি বাবা-মা'রা বুঝতেন। ক্যাম্পাসে এসে যদি তারা দেখতেন এইখানে উনাদের সন্তানেরা কোন পরিবেশে, কোন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে প্রতিনিয়ত দিন পার করে!!

বাবা! ভাবছেন, চাকরি-বাকরি না করতে পারলে আমাকে বিয়েটাই বা কে করবে, তাই না? আরেকটি ভুল ধারণা! বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া একটা ছেলে এতোটাই বেকার, এতোটাই অসহায় নিশ্চয় নয় যে, সে একজন স্ত্রীর ভরণ পোষণের ভার নিতে পারবে না।
ভাবছেন, কোন বাবা-মা সাহস করবে বেকার ছেলের হাতে মেয়ে বিয়ে দেওয়ার, তাই না? কোন দ্বীনদার যুবক, যার হয়তো কোন বড় প্রতিষ্ঠানে চাকরি নেই, কোন বড় ব্যাংকে হয়তো সে গলায় টাই ঝুলিয়ে অফিস করে না, কিন্তু একনিষ্ঠতার সহিত দ্বীন পালন করছে। খুব ঝমকালো না হোক, মোটামুটি স্বচ্ছলতার সহিত সে চলতে পারছে- এরকম কারো কাছে আপনার মেয়েকে বিয়ে দেওয়ার সাহস করে ফেলুন, দেখবেন আপনার ছেলে, যারও বড় কোন চাকরি নেই, বড় ব্যাংকে জব নেই, কিন্তু দ্বীন পালনের চেষ্টা করে, তার হাতে অন্য কোন দ্বীনদার মেয়ের বাবা তার মেয়ে তুলে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবে।

রাসূল (সাঃ) বলেছেন,- 'সকল কাজ নিয়্যাতের উপর নির্ভরশীল।'
আপনার মেয়ের বিয়েতে আপনি এমনভাবে মোহরানা ধার্য করুন, যাতে আপনার মেয়ের ভাবি জামাই, যার সাথে আপনার মেয়ের আত্মিক বন্ধন হতে চলেছে, যার সাথে আপনার মেয়ে সারাজীবন কাটাবে, তার উপরর যেন কোন চাপ না সৃষ্টি হয়।
তাহলে আপনার ছেলের ক্ষেত্রেও তাই হবে।
মেয়ের বাবা হিসেবে আপনি যা ত্যাগ করবেন, সন্তানের বাবা হিসেবে আপনি তা-ই ফেরত পাবেন।

বাবা, বিয়েটা সুন্নত! সন্তানকে সঠিক সময়ে সুন্নত পালনে সাহায্য করাটা পিতা মাতার অন্যতম দায়িত্ব। বলছিনা যে আপনারা এই দায়িত্ব থেকে গাফেল। শুধু বলছি, সময়টা বড্ড কঠিন।
রিয্বীকের বিলি বন্টন তো আসমান থেকেই নির্ধারিত হয়।
বিয়ে করে কেউ না খেয়ে মরেছে, কিংবা ফকির হয়ে গেছে, এরকম নজির সম্ভবত পৃথিবীতে নেই।
রাসূল (সাঃ) যুবকদের বিয়ে করার নির্দেশ দিয়েছেন, সম্ভব না হলে রোজা রাখতে বলেছেন। তিনি জানতেন, যৌবনের সময়টা বড্ড কঠিন! বড্ড নিষ্ঠুর!

বাবা, অকপটে লিখে ফেলেছি। কারণ, আমি ফেৎনা থেকে নিজেকে বাঁচাতে চাই। যদি ভাবেন আমি ভুল কিছু বলেছি বা ভুল কিছু চেয়েছি, আমায় ক্ষমা করবেন।

ইতি,
আপনার আদরের পুত্র।

(এই চিঠিটা যদি কোন 'বাবা' পড়েন, তিনি বাবার ভূমিকায় পড়বেন, যদি কোন মা পড়েন, মায়ের ভূমিকায় পড়বেন। যদি কোন বিবাহিত বড় ভাই পড়েন, বড় ভাইয়ের ভূমিকায় পড়বেন, বিবাহিত বড় বোন পড়লে, বড় বোনের ভূমিকায় পড়বেন। আর বাকিরা (যাদের সমস্যা নিয়ে লেখা) 'আদরের পুত্রসন্তান/ কন্যা সন্তান' এর ভূমিকায় 🙂:-))

পরাধীন বিজ্ঞানীগণ

স্রষ্টা তত্ব' যদি সত্য হয়, তাহলে বিজ্ঞানীদের বেশিরভাগই কেনো নাস্তিক হয়?

খুব কমন এবং ইমপর্ট্যান্ট একটি প্রশ্ন। ইন্টারেস্টিংও বটে।
এই প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে আমাদের একটু ইন ডিটেইলস আলোচনা করতে হবে বেশকিছু ব্যাপারে।
প্রথমত, আমি সেই সময়ের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চায় যে সময়ে চার্চের পাদ্রীদের সাথে বিজ্ঞানের একটি বৈরি সম্পর্ক ছিলো। এক্ষেত্রে বিজ্ঞানী গ্যালিলিও'র সাথে ঘটা ঘটনাটা বেশ উল্লেখযোগ্য।
ইউরোপ-আমেরিকায় তখন ছিলো পাদ্রীদের যুগ। পাদ্রীদের যুগ বলছি এই কারণে যে, পাদ্রীরাই ছিলো তখন সমাজের সর্বেসর্বা। তারা যাই বলবে তাই 'ঠিক', তাদের বিপরীতে কেউ কিচ্ছু বললেই পেতে হতো ধিক্কার, লাঞ্চনা, গঞ্জনা এবং মৃত্যুদন্ডও। তারা যে কেবল সমাজে আধিপত্য বিস্তার করে বসে ছিলো, তা নয়। তারা সমানভাবে সে সময়ের বিজ্ঞানী মহলকেও নিয়ন্ত্রণ করতো। তো, বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টে যখন পৃথিবীকেই সবকিছুর কেন্দ্র বলা হয়েছে, পাদ্রীদের কাছে সেটাই ছিলো ধ্রুব সত্যের মতোন। এমতাবস্থায়, গ্যালিলিও এসে যখন প্রচার করা শুরু করলো যে পৃথিবীই সবকিছুর কেন্দ্র নয়, আমাদের দৃশ্যমান সবকিছুর কেন্দ্র আসলে সূর্য, তখন খ্রিষ্টান পাদ্রী সমাজ গ্যালিলিওকে নিতে পারে নি। তারা গ্যালিলিওর উপরে নির্যাতন শুরু করে এবং তাকে তার মতবাদ প্রচার থেকে বিরত হতে বলে। কারণ, গ্যালিলিও যা প্রচার করছে সেটা সরাসরি বাইবেলের সাথে সাংঘর্ষিক।

মোটামুটি এরকমই ছিলো সেই পাদ্রী যুগের পরিবেশ। সেখানে যা কিছু অন্যরা বলতো, তা পাদ্রীদের মন রেখে বলতে হতো। পাদ্রীদের বিরোধিতা করে কেউ কিছু বলতে পারতো না। কেউ বললেই তাকে সমাজ থেকে বহিঃষ্কার করা হতো। নির্যাতন করা হতো।
মোটামুটি, পাদ্রীরা একপ্রকার স্বৈরাচারের ভূমিকায় ছিলো বলা যায়।
পাদ্রীরা এরকম করতো ২ টা কারণে।
এক- তারা যেহেতু সমাজে নিজেদের সর্বেসর্বা ভাবতো , তাই অন্যের মত যখন তাদের মতের উপরে প্রাধান্য পাবে, তখন সমাজ থেকে তাদের গ্রহণযোগ্যতা কমে যাবে।
দুই- তাদের একমাত্র জীবিকা নির্বাহ পদ্ধতিই ছিলো এটা। মানুষকে অন্ধ করর রেখে নিজেদের মতো করে আইন করে তারা ফায়দা লুটতো। এমতাবস্থায়, সত্য জানাজানি হয়ে গেলে মানুষ তাদের আর মান্য করবে না। ফলে, সমাজে তাদের ডোমিনেশান কমে যাবে। জীবিকা নির্বাহের মাধ্যম বন্ধ হয়ে পড়বে ইত্যাদি।

আপনি হয়তো ভাবছেন, আমি এতোসব গল্প বলছি কেনো, তাই না?
জ্বী। এই গল্প বলার কারণ হলো, পাদ্রীদের সেই যুগ সময়ের বিবর্তনে শেষ হলেও, আমরা

ঢুকে পড়েছি আরেকটি পাদ্রীদের যুগে। আগের যুগে পাদ্রীগণ ধর্মের দোহাই দিয়ে মানুষকে কব্জা করলেও, বর্তমানের পাদ্রীগণ মানুষকে বিজ্ঞানের দোহাই দিয়ে কব্জা করে রেখেছে।

আরেকটু ক্লিয়ার করি। আমাদের বর্তমান বিজ্ঞান জগতকে (আরো ক্লিয়ারলি, বিজ্ঞান এ্যাকাডেমিয়াকে) আষ্টেপৃষ্ঠে আছে বস্তুবাদীরা (Materialistics)।

বস্তুবাদ হচ্ছে নাস্তিক্যবাদের একটি প্রধানতম শাখা।

আগেকার সময়ে, সমাজ থেকে বিজ্ঞান মহল- সবকিছুতেই যেমন পাদ্রীরা ডোমিনেইট করতো, বর্তমানে সমাজ থেকে বিজ্ঞানমহল- সবকিছুতে ডোমিনেইট করে এইসব ভোগবাদী, বস্তুবাদীরা।

আমেরিকার 'ন্যাশনাল এ্যাকাডেমী অব সায়েন্স' এর মেম্বারদের মধ্যে ৯০% হচ্ছে এই বস্তুবাদীরা।

আপনি বলতে পারেন, এটার সাথে বিজ্ঞানীদের নাস্তিক হবার কি সম্পর্ক?

সম্পর্ক আছে। বস্তুবাদ তথা ভোগবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার স্পন্সর করা হয় প্রতিনিয়ত।

বস্তুবাদের সাথে ধর্মের বেসিক ডিফারেন্স হচ্ছে- ধর্ম আপনাকে এই জীবনটাই শেষ জীবন নয়। মৃত্যুর পরে আরেকটি জীবনের কথা বলে। সুতরাং, ধর্ম মেনে চলতে গেলে আপনাকে ধর্মের নির্দিষ্ট কিছু রুলস, কিছু নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হয়। ধর্ম মানলে আপনার জীবনে আপনার ইচ্ছাই শেষ ইচ্ছা হয় না। আপনাকে সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিতে হয়।

এই প্রাধান্য দিতে গিয়ে, আপনি চাইলেই 'যেমন খুশি তেমন' ভাবে চলতে পারেন না। অবাধ, অবৈধ সেক্স করতে পারেন না, মদ খেতে পারেন না, অবাধ মেলামেশা করতে পারেন না ইত্যাদি।

কিন্তু বস্তুবাদ আপনাকে বলে- এই জীবনটাই শেষ জীবন। মৃত্যুর পরে আসলে কিচ্ছু নেই। সুতরাং, জীবনটাকে যেমন খুশি এনজয় করো।

এইজন্যে, নাস্তিকদের অন্যতম প্রধান গুরু Richard Dawkins বলেছেন,- 'There is no God. So enjoy your life'..

মূলত, বস্তুবাদ প্রচারের অন্যতম কারণ হচ্ছে ব্যবসায়িক। বিশাল একটি অংশ যখন স্রষ্টা আছে জেনে ধর্ম পালন শুরু করবে, তখন তাদের ব্যবসায়িক বিরাট লস হবে।

আপনি যখন স্রষ্টার ভয়ে মদ খাবেন না, ফ্রি সেক্স করবেন না, সুদ খাবেন না, ঘুষ নিবেন না, দূর্নীতি ইত্যাদি করবেন না- তখন বস্তুবাদীদের ব্যবসায়ে লাল বাতি জ্বলবে। সুতরাং, বস্তুবাদ প্রতিষ্টার অন্যতম কারণ হচ্ছে- ব্যবসায়িক।

এখন, বর্তমান বিজ্ঞান জগত হচ্ছে এই বস্তুবাদীদের দখলে।

সুতরাং, চালকের আসনে যখন বস্তুবাদীরা, তখন বর্তমান বিজ্ঞান জগত আর বিজ্ঞানীদের কাজই হলো যেভাবে হোক, নাস্তিক্যবাদ তথা বস্তুবাদ প্রতিষ্ঠা করে ধর্মের কবর রচনা করা। এরজন্য যা যা করা দরকার, তার সবটাই এই বস্তুবাদীরা করবে। ঠিক পাদ্রী সম্প্রদায়ের মতোন।

বর্তমান বিজ্ঞান এ্যাকাডেমির আন্ডারে যারা কাজ করে, যারা রিসার্চ করে- তারা যদি স্রষ্টায় বিশ্বাসী হয়েও থাকে, তবুও তারা তা **মুখ ফুটে কখনোই বলতে পারে না।**
কারণ, যদি তারা স্বীকার করে আর প্রচার করে, তাহলে বস্তুবাদীদের নিয়ন্ত্রিত এ্যাকাডেমিয়া থেকে সেই বিজ্ঞানীকে ঘাঁড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দেবে।
অন্তত, রুটি-রুজি, সম্মান, প্রফেশন রক্ষার তাগিদে হলেও তাদেরকে বস্তুবাদীদের মন জুগিয়ে চলতে হয়। তাদের কথামতো কাজ করতে হয়।

দু একটি উদাহরণ দিই। বস্তুবাদ, নাস্তিক্যবাদ তথা বিবর্তনবাদ যদি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, তাহলে সমাজে ন্যায় - অন্যায়ের মধ্যে কোন ফারাক থাকবে না। ধর্ষণ, খুন, হত্যা ইত্যাদি আর অপরাধ বলে বিবেচিত হবে না। এগুলোকে সময়ের বিবর্তনে, বিবর্তনের ধারায় জাস্ট 'Adaptive' হিসেবে ধরা হবে। বেশকিছুদিন আগে এইসব বিবর্তনবাদীরা মানব শরীরে 'Crime Gene' টাইপ কিছু একটার অস্তিত্ব নির্ণয়েরও চেষ্টা চালিয়েছে।
Crime Gene হচ্ছে এমন একপ্রকার জীন, যা আমাদের ক্রাইম (অন্যায়) করতে উদ্বুদ্ধ করে থাকে। অর্থাৎ, মানুষ যে খুন, রাহাজানি, ধর্ষণ করে, সেসব সে নিজের ইচ্ছাতে করে না। তার মধ্যে এই জীন থাকলেই সে এসব করে। যেহেতু এটা জেনেটিক্যালি হয়, সেহেতু এটা কোন অপরাধ নয়।
ভাবতে পারছেন এদের দূরভিসন্ধী? যদি এই Crime Gene তত্ত্ব সমাজে প্রতিষ্ঠিত করে দেওয়া যায়, তাহলে পৃথিবীতে আর কোনকালেই ধর্ষণকে অন্যায় বলা যাবে না, খুন কে অন্যায় বলা যাবে না। মোদ্দাকথা, যা ইচ্ছা করো- সমস্যা নাই।
এমন একটা পৃথিবী যদি হয় তা কেমন হবে ভাবুন।
মজার ব্যাপার হচ্ছে, পাদ্রীরা শক্তির বলে একসময় এসব করে বেড়াতো, আর বস্তুবাদীরা এখন বিজ্ঞানমহল দখল করে, বিজ্ঞানের নাম দিয়ে এসব করে বেড়ায়।
এই ব্যাপারে বিস্তারিত জানার জন্য বিবর্তনবাদী রন্ডি থর্নহিল এবং ক্রেইগ পালমানের বই 'Natural History Of Rape' বইটা পড়া যায় যেখানে ধর্ষণকে অপরাধ না বলে, বিবর্তনের ধারায় Adaptive বলে চালানো হয়েছে।

শুধু এটা নয়। সমকামিতাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যও এরা মানবশরীরে Homo Gene নামের একধরনের জীনের অস্তিত্ব নির্ণয়েরও খুব প্রচেষ্টা চালিয়েছে এবং এখনো চালাচ্ছে। অর্থাৎ, সমকামিতাও যে অপরাধ নয় এবং এটাও যে একটা জেনেটিক্যাল ব্যাপার- সেটা প্রতিষ্ঠা করা।
সমস্যা হচ্ছে, কিছু সৎ বিজ্ঞানী এবং সৎ দার্শনিকদের জন্য তারা এগুলো গেলাতে পারে না মানুষকে।
বিজ্ঞান মহলকে বস্তুবাদীরা এতোটাই চেপে ধরে আছে যে, যখনই তারা কোন Creationist Scientist এর নাম শুনে, তখন নাক সিটকিয়ে বলে- উহু, Creationist কিভাবে আবার সাইন্টিস্ট হয়?'
(আমাদের বাঙলা নাস্তিকরা যেমন বলে- 'আরে! মোল্লা আবার বিজ্ঞানের কি বুঝে,হুহ?')

বিবর্তিনবাদীদের একসময়ের নেতা, Jullian Huxley কে এক টক শো তে Merv Griffin জিজ্ঞেস করলেন, 'Why do people believe in evolution?'
তিনি উত্তরে বলেছিলেন,- “The reason we accepted Darwinism even without proof, is because we didn’t want God to interfere with our sexual mores”

উনি বললেন, - 'প্রমাণাদি ছাড়াই বিবর্তনবাদকে আমরা মেনে নিয়েছি কারণ- আমরা আমরা চাই না যে স্রষ্টা আমাদের সেক্সুয়াল ম্যাটারগুলোতে নাক গলাক'
আগেই বলেছিলাম, বিবর্তনবাদ তথা নাস্তিকতা প্রতিষ্ঠা মানেই- অবাধ যৌনাচারের সার্টিফিকেট।
একসময়ের তুখোঁড় নাস্তিক Lee Strobel তার 'Case For Faith' বইতে লিখেছেন, - “I was more than happy to latch onto Darwinism as an excuse to jettison the idea of God so I could unabashedly pursue my own agenda in life without moral constraints.”

অর্থাৎ, বিবর্তনবাদ মেনে নিয়ে স্রষ্টাকে জীবন থেকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করে দেওয়ার নেপথ্য কারণ ছিলো- মোরাল ভ্যালু যেন তার জীবনে বাঁধা হয়ে না দাঁড়াতে পারে (অর্থাৎ, বস্তুবাদ মেনে নিলে আপনি যেমন খুশি তেমন জীবন উপভোগ করতে পারবেন)।

শেষ কথা হলো, বিজ্ঞানীদের অধিকাংশেরই এ্যাকাডেমিয়াতে তাদের নিজের মত প্রকাশের স্বাধীণতা নেই। তাদেরকে উপরের মহল থেকে সবসময় একটা চাপে রাখা হয়। তাই, চাইলেও তারা চাকরি, সম্মান, পদ মর্যাদা ধরে রাখতে বলতে পারেনা- I do believe in God...

এটি কি শুধু বিজ্ঞান এ্যাকাডেমিয়ার দৃশ্য? নাহ। এটি পুরো পৃথিবীর দৃশ্য। জোর যার, মুল্লুক তার।
একটি মজার ঘটনা উল্লেখ করি। ঘটানাটাকে কেউ পলিটিক্যালি নিবেন না, অনুরোধ রইলো।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকাবস্থায় দেখেছি- সেখানে ছাত্রশিবিরের একটা দাপট ছিলো একসময়। হল থেকে শুরু করে ক্যাম্পাস- সবখানে।
একটা সময় পরে, ছাত্রলীগ এসে ছাত্রশিবিরের কাছ থেকে কর্তৃত্ব নিয়ে নেয়।
এরপরে, যে ছেলেগুলো শিবির করতো, তাদের অধিকাংশকেই আবার ছাত্রলীগের মিটিং-মিছিলে যেতে দেখা গেলো।
কেনো এমন হলো? Yes, Just to survive...
থাকতে হলে আপনাকে করতেই হচ্ছে। নো ওয়ে।
ঠিক এভাবেই, বর্তমান বিজ্ঞানী মহলে 'বিজ্ঞানী' হিসেবে টিকতে হলে আপনাকে নাস্তিক হতেই হচ্ছে। মন থেকে না হোক, অন্তত, মুখ থেকে নাস্তিক না হলে বিজ্ঞান এ্যাকাডেমিয়াতে আপনার দুই পয়সারও মূল্য নেই।

(পিয়ার রিভিউ জার্নাল বলে বাঙলা নাস্তিকরা সবসময় মুখে ফেনা তুলে। এরপর লিখবো পিয়ার রিভিউ জার্নাল নিয়ে আদতে সাইন্স এ্যাকাডেমিয়াতে কী হয়)

ডাবল স্ট্যান্ডার্ড

দৃশ্যপট - ০১

নাস্তিক- 'বুঝলেন ভাই? বন্ধু ছাড়া লাইফ ইমপসিবল।'

মুসলিম- 'জ্বি ভাই। আমাদের নবী আদম আঃ ও জান্নাতে একা একা থাকতে পারেন নি। বন্ধু ছাড়া উনার লাইফও ইমপসিবল ছিলো। তাই আল্লাহ তা'লা অনুগ্রহ করে উনার জন্য হাওয়া আঃ কে বন্ধু হিসেবে সৃষ্টি করে বন্ধুর ব্যবস্থা করেছিলেন। আমাদের মৃত্যুর পরের জীবনেও যাতে আমরা একাকী অনুভব না করি, এরজন্যে জান্নাতে আল্লাহ তা'লা হুরের ব্যবস্থা করে রেখেছেন বন্ধু হিসেবে।'

নাস্তিক- 'ধুর মিয়া! সবখানে ধর্মের প্যাঁচাল পাড়েন ক্যা?'

মুসলিম- 'ভাই, আমিও তো বন্ধুর কথাই বললাম। বন্ধু ছাড়া লাইফ ইমপসিবল। সেটা দুনিয়া হোক আর আখেরাত, দুই খানেই।'

-

দৃশ্যপট - ০২

মুসলিম- 'ভাঈয়া, পর্দাহীন, বেগানা মহিলার সাথে একাকী সময় কাটাতে, ঘুরতে আল্লাহ নিষেধ করেছেন।'

নাস্তিক- 'ক্যানো?'

মুসলিম- 'কারন, এতে করে শয়তান মনের মধ্যে কু-প্রস্তাব ঢুকিয়ে মানুষকে বিপথে ফেলার ধান্ধায় থাকে। নারী-পুরুষ এমনিতেই পরস্পর-পরস্পরের প্রতি আকর্ষিত হয়। শয়তান এটাকেই কাজে লাগায়।'

নাস্তিক- 'আচ্ছা মিয়া, আপনারা দু'জন ছেলে-মেয়েকে একসাথে দেখলে সেক্স ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারেন না? ভাবতে পারেন না, তারা দু'জন সেক্স বেইসড রিলেশান ছাড়াই খুব ভালো বন্ধু? একাকীত্বের সাথী? এমন ভালো বন্ধু, যার সাথে সেক্স ছাড়াই হাতে হাত রেখে, যার চোখে চোখ রেখে হাজার বছরের পথ পাড়ি দেওয়া যায়? খালি কি মাথায় সেক্স ঘুরে নাকি?'

মুসলিম- 'না ভাই। সেক্স ঘুরবে কেনো? কিন্তু শয়তানের তো আর বিশ্বাস নাই। দেখা যাবে হাতে হাত রাখতে গিয়ে কতোদূরে চলে গেলেন। যাহোক, দুনিয়াতে আমরা এসব অশালীন সম্পর্কগুলো থেকে মুক্ত থাকলে, পরকালে আল্লাহ আমাদেরকে হুর দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যাদের সৌন্দর্যের সাথে দুনিয়ার কোনকিছুর তুলনা চলে না।'

নাস্তিক- 'হাহাহাহা। মুহাম্মদের জান্নাতের হুরের কথা বলছেন? তা ভাই, জান্নাত কি মুমিনদের জন্য সেক্স প্লেইস নাকি? এত্তগুলা হুর একেকজনের জন্য।'

মুসলিম- 'ভাই, আপনারা জান্নাতি ব্যক্তি আর হুরের মাঝে সেক্স ছাড়া আর কিছু কি ভাবতে পারেন না?
ভাবতে পারেন না, জান্নাতি ব্যক্তি আর হুরেরা সেক্স বেইসড রিলেশান ছাড়াই খুব ভালো বন্ধু? একাকীত্বের সাথী? এমন ভালো বন্ধু, যাদের সাথে সেক্স ছাড়াই হাতে হাত রেখে, চোখে চোখ রেখে অনন্তকাল পাড়ি দেওয়া যায়? খালি কি মাথায় সেক্স ঘুরে নাকি?'

নাস্তিক- ' না, ইয়ে, মানে.............'

#DoubleStand

অবিশ্বাস্য.........

১)

১৯ শে মার্চ, ২০১৭।
বাংলাদেশের ঐতিহাসিক শততম টেষ্ট ম্যাচে জয়।
ক্রিকেটের বিভিন্ন ক্যাটাগরি আছে। T20 হলো যুবক ক্যাটাগরির। ODI হলো মধ্যবয়স্ক ক্যাটাগরির আর Test হলো মুরুব্বি ক্যাটাগরির।
খুব সহজে একটা দেশ টেষ্ট মর্যাদা পায়না। বাংলাদেশও পায়নি। অনেক কাঠখড় পুঁড়িয়ে বাংলাদেশকে অর্জন করতে হয়েছে এই মর্যাদা। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে একসময়ের বুলবুল,বাশারদের ব্যাটিং-বোলিং নৈপুণ্য আমাদের এই মর্যাদা এনে দিয়েছিলো। সেই টেষ্ট মর্যাদা নিয়ে প্রতিবেশী কতোজনের কতো কানকথা, কটু কথাই যে আমাদের সহ্য করতে হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। কখনো আমাদের ক্রিকেটীয় জ্ঞান নিয়ে ব্যঙ্গ, কখনো আমাদের ক্রিকেটীয় শক্তি নিয়ে রসিকতা সহ অনেককিছুই হয়েছে। অনেকবার তারা দাবি তুলেছিলো আমাদের টেষ্ট মর্যাদা কেড়ে নেওয়ার। লাঞ্চনা, গঞ্জনা, অপমান পেরিয়ে, হাঁটি হাঁটি করে আমরা এসে পৌঁছেছি ১০০ এর ঘরে। আস্তে আস্তে আমরা শিখে গেছি প্রতিপক্ষকে কিভাবে ব্যাটে-বলে হাত উচানির বদলে চোখ রাঙানি দিতে হয়। আমরা তৈরি করেছি বিশ্বসেরা অলরাউন্ডার। আমরা ধীরে ধীরে পরিণত হয়েছি। এখন আমরা স্রেফ খেলতে নামি না। আমরা এখন সমানে সমানে লড়াই করে জিততে নামি।

(২)

এইমাত্র OT থেকে বের হলেন হাসনাত সাহেব। একটা পেশান্ট ছিলো মারাত্মক রকমের ইঞ্জুরড। ট্রাকের সাথে ধাক্কা লেগে শরীরের একপাশ থেঁতলে গেছে। এরকম পেশান্টের অপারেশান তিনি এই প্রথম করলেন। ভয়ে বুক ধুঁকপুক করছিলো।
তবু, ভালোই ভালোই অপারেশান শেষ করলেন।
অপারেশান শেষ করে তিনি তাড়াতাড়ি ফ্রেশ হলেন। অন্যান্য সময় হলে তিনি এই মূহূর্তে বেশ কয়েক ঘন্টা রেস্ট করতেন।ঘুম দিতেন। এরকম ভয়ানক অপারেশান করার পরে ডাক্তারের অবস্থাও রোগির মতো হয়ে যায়। তারউপর OT তে সেই ডাক্তারটা যদি নতুন হয় তাহলে তো কথাই নেই।
কিন্তু হাসনাত সাহেব ফ্রেশ হয়ে সোজা টিভি রুমে চলে এলেন। কারণ, আজ বাংলাদেশের খেলা আছে। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে।আগ্রহটা আরো বেশি জায়গা দখল করে আছে, কারণ - এটি বাংলাদেশের শততম টেষ্ট ম্যাচ।
ক্রিকেট আমাদের একটা আবেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাঙালি হিসেবে, হাসনাত সাহেবও এর বাইরের নন। অন্য সবার মতোন বাংলাদেশের আজকের শততম টেষ্ট ম্যাচ নিয়ে উনার

আশা- আকাঙ্ক্ষা তাই একটু বেশিই। তারউপর, দল যখন ভালো পজিশনে, তখন প্রত্যাশার পারদটা আরো কয়েকগুণ বেড়ে গেছে।

হাসনাত সাহেব খুব মনোযোগ দিয়ে খেলা দেখছেন। শেষ দিনের খেলা আজ। তামিম যখনই লং অনে শট নিতে যায়, হাসনাত সাহেবের হার্টবিট যেন বন্ধ হয়ে যায়। ঠোঁটে ঠোঁট কামড়ে ধরে চোখ জোড়া বন্ধ করে থাকে। মনে হয় যেন- 'এই বুঝি সব শেষ।'...

সব শেষ হয়না। সকল জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে বাংলাদেশ তাদের শততম টেষ্টে তুলে

নেয় নবম জয়।

মানবজমিন পত্রিকা তৎক্ষণাৎ হেড লাইন করে- 'লঙ্কায় বাংলাকান্ড।'
হাসনাত সাহেব সোফা থেকে লাফ দিয়ে উঠে সোজা হাসপাতাল বারান্দার দিকে দৌঁড় দেন। আরো বেশকিছু রুম থেকে হাত তালি আর আনন্দোল্লাসের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। সবার মাঝেই মূহুর্তে নেমে এলো ঈদের আমেজ। হবেই তো। বাংলাদেশের 'লঙ্কা বিজয়' বলে কথা। তাও আবার তাদের মাটিতে।
হাসনাত সাহেব উনার ফেইসবুকে লগ ইন করলেন। উনি এই মূহুর্তে এতো পরিমাণ খুশি যে, OT'র ক্লান্তির লেশমাত্র আর শরীরে নেই। খুশির চোটে উনি কি লিখবেন ভেবেই পাচ্ছেন না। শুধু লিখলেন,- 'Proud Of you Team Bangladesh.... Congratulation.....'

(৩)

মঈন সাহেব। দেশের একটি প্রথম সারির ব্যাংকের ম্যানেজার। খুব একটা যে খেলাধুলা দেখেন তা নয়। কিন্তু আজ বাংলাদেশ খেলছে তাদের শততম টেষ্ট। আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু এটাই। তিনি একটু পর পরই খেলার আপডেট দেখছেন।
মোসাদ্দেক ছেলেটাকে তিনি তেমন চিনেন না। বললেন, 'আরে, নয়া পুলাডা তো জম্পেশ খেলে।' দিনের শেষ মূহুর্তে মোসাদ্দেকরা যখন জিতে যায়, মঈন সাহেব টেবিলে হাত চাপড়িয়ে বলে উঠলেন, 'Yessssss! We've done it......'
আজ, লঙ্কায় মোসাদ্দেকরা একা নন। মঈন সাহেবরাও আজ বাংলাদেশ।
মঈন সাহেব অনেকদিন হয় ফেইসবুকে যান না। কাজের চাপে যাওয়া হয়না। আজ উনি ফেইসবুকে এলেন। এসে লিখলেন, 'মোসাদ্দেকরা জিতলে জিতে যায় বাংলাদেশ।'

(৪)

রোমান। তামিম ইকবালের পাগলা ফ্যান। তামিমকে কেউ কিছু বললেই তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠে সে। তামিমের দূর্দান্ত ইনিংস এবং বাংলাদেশের শততম টেষ্টে জয় আজ তাকে দ্বিগুণ আনন্দ এনে দিলো। আহা!
সে আজ তামিম হেটারদের খোঁচায় নি। সব ভুলে আজ সেও আনন্দ মিছিলে শামিল।

(৫)

ফারিয়া। ফেইসবুকে সেলফি আপলোড করাই তার একমাত্র কাজ। বিভিন্ন অনুষ্ঠান, ভ্রমণ ইত্যাদিতে গিয়ে সেলফি তুলে তাতে ডজনখানেক বান্ধবিকে ট্যাগ করতে পারা পর্যন্তই তার

ফেইসবুক লাইফ। যে মেয়ে ছবি আপলোড দেওয়া ছাড়া কিছুই জানেনা, সেও বাংলাদেশের জয়ের পরে ফেইসবুকে লিখলো- 'Yaaaahooo we won it....'

(৬)

নাজমুন আরা বেগম। একজন নারীবাদী। নারীদের অধিকার আদায়ের আন্দোলন নিয়েই থাকেন। মিছিল, মিটিং, সভা,সেমিনার- সবখানেই জ্বালাময়ী বক্তব্য দিয়ে সবাইকেই চাঙ্গা করে রাখতে পারেন।

বাংলাদেশের এই জয় আজ তিনিও খুব উপভোগ করেছেন। দুপুর থেকে সারাক্ষণ টিভির সামনে ঠাঁই বসে ছিলেন। পুরো সময়টা জুড়েই মোবাইল সাইলেন্ট করে রেখেছেন। ইতিহাসের সাক্ষী হতে যাওয়া এরকম সময়ে ফোন কলের উপদ্রব সহ্য করার মানে হয় না। জয়ের পর এই ব্যস্ত মহিলা নেত্রীও উল্লাসে ফেঁটে পড়েন। ফেইসবুকে লিখেন, 'অভিনন্দন বাংলাদেশ।'

শুধু তাই নয়, বাংলাদেশী খেলোয়াড়েরা পেয়েছেন প্রধানমন্ত্রী থেকে ফোন কল। স্বনামধন্য সকল শীর্ষ পর্যায়ের সেলেব্রেটিরা বাংলাদেশ দলকে জানিয়েছে শুভেচ্ছা বার্তা। বিসিবি বাংলাদেশি ক্রিকেটারদের ১ কোটি টাকা পুরস্কারের ঘোষণা দিলো।

পত্রিকাগুলো ভাসিয়েছে প্রশংসার জোয়ারে। প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় খুশির বন্যা। গত কয়েকদিন আগেও যে সাংবাদিক কোচ হাতুরে সিংহের চৌদ্দ গুষ্ঠি উদ্ধার করে ছেড়েছিলো, সেও আজ হাতুরে সিংহের জন্য শিরোনাম করলো- 'Hero, behind the screen'.....

(৭)

১৯ শে মার্চ, ২০১৭।

একইদিন। একইসময়। একই ক্ষণ।

ভারতীয় পত্রিকা The Times Of India একটি খবর ছাপিয়েছে। শিরোনাম- 'Gang-Rape: Minor Bangladeshi girl accuses 14 of rape'

ধর্ষণের সংবাদ। বিস্তারিত অংশে যা লেখা হলো তা এরকম, '১৪ বছর বয়সী এক বাংলাদেশী বালিকা আত্মীয়ের ফাঁদে পড়ে ভারতে পাচার হয়ে যায়। পাচারকারীদের মাধ্যমে সে আহমেদাবাদে পৌঁছে। সেখানে প্রথমে তাকে ৭ জন পুরুষ মিলে গণ ধর্ষণ করে। এরপর তাকে পাঠানো হয় ম্যাঙ্গালোরে। সেখানে তাকে ধর্ষণ করে ১৪ জন পুরুষ। একসপ্তাহের মধ্যে এই ১৪ বছরের বালিকা মোট ২১ জনের হাতে গণ ধর্ষিত হয়। পরে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। জুনাগড়ে তাকে রাস্তায় কাঁদতে দেখে পুলিশ স্টেশনে পাঠানো হয়। ভাষাগত জটিলতায় তার সমস্যা বুঝা যাচ্ছিলো না। পরে, সেখানকার এক মহিলা আশ্রমে নিয়ে একজন দো-ভাষীর সহায়তায় তার কাছ থেকে বিস্তারিত জানা যায়।

দুটি ঘটনা একই দিনের। একটি বাংলাদেশের ক্রিকেটের ঐতিহাসিক জয় নিয়ে, অন্যটি একটি বাংলাদেশী বালিকার ধর্ষণের ঘটনা।

OT থেকে হন্তদন্ত হয়ে বের হওয়া হাসনাত সাহেব কি এই মেয়েটার ব্যাপারে জানেন? উনি কি এই ঘটনা শুনে রেগে ফেঁটে পড়েছেন? দু চার কলম লিখে মনের ঝাল মিটিয়েছেন? ক্রিকেট নিয়ে তার যে উন্মাদনা, সেটা কি মেয়েটার ব্যাপারেও আছে?

ব্যাংক ম্যানেজার মঈন সাহেব। খুবই ব্যস্ত লোক। তবুও, ব্যস্ততার মাঝেও মোসাদ্দেকের ব্যাটিং আপডেট নিচ্ছিলেন, তামিমের শট দেখছিলেন। দেখছিলেন সাব্বিরের মারকাট ব্যাটিং পারফরমেন্স। আচ্ছা, একই দিনের ঘটনায় উনি ঠিক কতোবার ভারতে ধর্ষিত বাঙালি মেয়েটার খোঁজ নিয়েছেন? সাত দিনে একুশ জনের কাছে ধর্ষিত হওয়া সেই বালিকাটা কেমন আছে তার কোন আপডেট মঈন সাহেব নিয়েছেন? মেয়েটা এখন কোথায়, কি করছে এসবের খোঁজ খবর নেওয়ার প্রয়োজন, সময়, ইচ্ছে কি মঈন সাহেবের ছিলো?

তামিমের সেই পাগলা ফ্যান, যে আজ সব ভুলে বাংলাদেশের জয় উদযাপন করছে, তার কাছে এই খবর পৌঁছেছে কি? পৌঁছালে তার রি-একশান কি হবে?

ফারিয়া। ছবি আপলোড দেওয়া ছেড়ে যে আজ বাংলাদেশের জয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে একলাইন লিখেও ফেললো, সে কী জানে ঠিক তার মতোই,তারই দেশের এক মেয়ে, সাত দিনে ২১ জনের কাছে ধর্ষিত হয়েছে?

নারীবাদী নাজমুন আরা বেগম কি জানেন যে তিনি যে সময়ে বাংলাদেশের জয় উদযাপন করছেন, ঠিক সে সময় বাংলাদেশের একটি মেয়ে গণ ধর্ষিত হয়ে মূমুর্ষ অবস্থায় পড়ে আছে? তিনি কি এটা নিয়ে কোন বিক্ষোভ মিছিল করবেন? মাইকে গলা ফাঁটাবেন? এই মেয়েটার জন্য কি উনার জ্বালাময়ী শব্দগুলো আরেকবার গলা দিয়ে বেরুবে?
প্রধানমন্ত্রী জানেন এই সংবাদ? কোন দুঃখ প্রকাশ? কোন পদক্ষেপ?
কোন সেলেব্রেটির ক্ষোভ? কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান কি মেয়েটার চিকিৎসার জন্য কোন অনুদান পাঠাবে?

বাংলাদেশের কোন টেলিভিশন, পত্রিকা এটা হেড লাইন করেছে?

নাহ! কেউ কিচ্ছু করেনি। করার দরকার মনে করেনি। কারণ, এরকম ১৪ বছরের বালিকা প্রতিদিনই গণ ধর্ষিত হচ্ছে, কিন্তু বাংলাদেশ তো আর প্রতিদিনই টেষ্ট জিতছে না। সাকিব প্রতিদিনই তো আর সেঞ্চুরি করেনা। মোসাদ্দেকরা কি আর প্রতিদিন জ্বলে উঠে? নাহ। আমাদের বিশ্বসেরা অলরাউন্ডার আছে। আমাদের আছে এখন শক্তিশালী একটি দল। আমাদের ক্রিকেট আছে। আবেগ আছে। ধর্ষণ তো সে রোজ হয়, ১০০ তম টেষ্টে কী প্রতিদিন জয় পাওয়া যায়? যায় না।
So, let's celebrate cricket.....

নাস্তিক মানেই বিনোদন!

অনেষ্টলি বলছি, ব্যক্তিগতভাবে আমি নাস্তিকদের ব্যাপারে একটা 'সৎ' ধারণা পোষণ করতাম। তাদের সাথে আমাদের যে দ্বন্ধ, সেটা কোন ধন-সম্পত্তির দ্বন্দ্ব নয়। দ্বন্দ্বটা 'আইডোলোজিক্যাল' এবং 'ইন্টেলেকচুয়াল।'

আমি ভেবেছিলাম, 'প্যারাডক্সিক্যাল সাজিদ' নিয়ে তারা যদি ভাবে, কথা বলে, সেটা হবে অত্যন্ত ভদ্রতার সহিত। তারা যেহেতু সবসময় 'লেখার জবাবে লেখা' এক্সপেক্ট করে, তাই ভেবেছি, অন্তত ব্যক্তি আক্রমণটা আসবে না।
তারা আমার বইয়ের বিরুদ্ধে বই লিখবে। আমার যুক্তিগুলো খন্ডন করবে। আমাকে ভুল প্রমাণ করবে।

কিন্তু না। আমি আসলে ভুল ছিলাম। অন্তত বাঙলা নাস্তিকদের বেলায়।
তারা প্রথমে বলেছে যে- তারা আমাকে গনায় ধরে না। বেশ! আলহামদুলিল্লাহ্।
কিন্তু বই বের হবার দু দিনের মাথায় অনলাইন নাস্তিককূলের শিরোমণি আমাকে এবং আমার বইকে নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করা শুরু করলেন। এটা কি রকম 'লেখার জবাবে লেখা' আমি ঠিক বুঝলাম না। যাহোক, উনার শিক্ষাগত যোগ্যতা অনেকের কাছে প্রশ্নবিদ্ধ। কারো কারো মতে উনি ইন্টারপাশ, কারো কারো মতে ইন্টারফেইল। তাই ধরেই নিলাম,উনি হয়তো 'প্যারাডক্সিক্যাল সাজিদ' এর বীপরিতে লজিক্যাল কিছু লেখার হিম্মত রাখেন না, তাই এমন ফাঁপর নিচ্ছেন।

কিছু পাতি নাস্তিক আছে অবশ্য। এরা এখনো 'খাদ্যজাল' এবং 'ক্রাইম সাইন্স' কি জিনিস তাও ঠিকমতো বুঝেনা। কিন্তু ভাব ধরে এমন, - এরা একেকজন থিওরি অফ রিলেটিভিটির মতো বৈজ্ঞানিক সূত্র আবিষ্কার করে বিপ্লব ঘটিয়ে ফেলেছে। এইসব পাতি নাস্তিকগুলা আমার বইয়ের পিডিএফ বের করেছে। সেখানে আমার নাম উল্লেখ করেছে 'ইডিয়ট আজাদ' হিসেবে। যাহোক, বাচ্চা নাস্তিকদের কাছ থেকে এরচেয়ে বেশি কিছু কি আশা করা যায়?
ঘটনা এতোটুকুতেই শেষ না। সেই পিডিএফ আবার তারা প্রচার করছে মুসলিম নিক নিয়ে। মুসলিম নাম দিয়ে আইডি খুলে, সেখানে দাঁড়ি-টুপিওয়ালা হুজুরের ছবি লাগিয়ে, সেখান থেকে ফেইক পিডিএফের লিঙ্ক মানুষের কমেন্টে আর ইনবক্সে ইনবক্সে গিয়ে ছড়ানো হচ্ছে। শুধু তাই না, প্যারাডক্সিক্যাল সাজিদের জন্য তারা আলাদা ব্লগ সাইটও ওপেন করেছে। মোষ্ট রিসেন্ট খবর হচ্ছে, গতকাল দেখলাম, আমার বই 'প্যারাডক্সিক্যাল সাজিদ' এর উপরে একটি ভিডিও করে সেটা তারা ইউটিউবেও আপলোড দিয়েছে।

আল্লাহ তা'লা এভাবে নাস্তিকগুলার মাধ্যমেও যে 'প্যারাডক্সিক্যাল সাজিদ' এর প্রচারণা করাই নিবেন, এইটা কেউ ভাবছিলো? ভাবে নাই। আমিও ভাবি নাই :-)

আল্লাহ বলেছেন, 'তারা চক্রান্ত করে, আল্লাহ কৌশল করেন। নিশ্চই, আল্লাহই সর্বোত্তম কৌশলী।'
আর, তাদের সিক্রেট গ্রুপগুলোতে এখন প্রতিদিন আমাকে নিয়ে যা কথা হয়, সেই সময়গুলো যদি তারা পড়াশুনা করতো,তাহলে এতোদিনে 'খাদ্যজাল' 'ক্রাইম সাইন্স' টপিকগুলো তাদের কাছে পানির মতো সহজ হয়ে যেতো। কোথাও এগুলোর ভুল প্রয়োগও আর করতো না :-)
চুলকানি পর্ব এখানেই শেষ হলে চুপ থাকতাম। কিন্তু না। বাঙলার পাতি নাস্তিক সম্প্রদায়ের চুলকানি এখানেই শেষ নয়। ব্যক্তিগত কাজের চাপে আমি ৩ দিন ফেইসবুকের বাইরে ছিলাম। এ্যাকাউন্ট ডিএক্টিভ করে।
এরমধ্যেই, সীতাকুন্ডে একটি 'জঙ্গী জঙ্গী' অভিযান শেষ হলো। বাঙলা নাস্তিককূল ফলাও করে প্রচার করতে লাগলো, আমি নাকি সেই গ্রুপের জঙ্গী :-)
পুলিশের প্যাঁদানি খাওয়ার ভয়ে নাকি আইডি ডিএক্টিভ করে পালিয়েছি। হা হা হা হা। শুধু কি তাই? এরমধ্যেই আমার নামে ফেইক আইডি খুলে ওরা প্রচার করতে লাগলো যে- আমি খুউউব সিকিউরিটি প্রবলেমে। তাই আপাতত বিদেশে চলে গেছি। :v
এই হচ্ছে বাঙলা নাস্তিকদের এখন পর্যন্ত বিনোদন পর্বের সর্বশেষ অবস্থা।

যেদিন থেকে আমি নাস্তিকদের ডিল করা শুরু করেছি, তারপর থেকে আমি আর ভুলেও কোন কমেডি শো দেখি না। টাইম লস মনে হয়। মানেন আর না মানেন, বিনোদনের জন্য বাঙলা নাস্তিকরাই সেরা।

‘মুসলিম, তোমরা যারা হোলি খেলো’

সাদমানকে এই মূহুর্তে খুব উৎফুল্ল দেখাচ্ছে। ফোনে কথা বলার সময় এতোটা উৎফুল্ল তাকে গত কয়েকদিনে দেখা যায়নি।
গত কয়েকদিন বলার কারন হলো, সাদমান এই রুমে উঠেছে মাত্র সপ্তাহ তিনেক। এই সময়ের ভেতরে তার সম্পর্কে যা ধারণা তা হলো, সে খুব স্মার্ট, বন্ধুবৎসল এবং ভদ্র।

আদনান আহমেদ। সাদমানের রুমমেট। বয়স আর ক্লাশ বিবেচনায় সাদমানের সিনিয়র। শুধু সাদমান নয়, এই মেসের সবার সিনিয়র এই লোক। সবাই উনাকে খুব ভক্তি আর শ্রদ্ধার চোখে দেখে। সবার জন্য উনি এই মেসে ‘বড় ভাই’ ভূমিকায় আছেন। সকলের সুবিধা,অসুবিধায়, সমস্যা-সমাধানে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকেন এই লোক। সকলে উনাকে ‘আদনান ভাই’ বলে ডাকে।

আজ বুধবার। আজ সাদমানের ভার্সিটিতে ক্লাশ নেই। যেদিন ক্লাশ থাকে না, সেদিন সাদমান ভার্সিটির ছাঁয়াও মাড়ায় না সাধারণত। এই রোদ, জ্যাম, ধাক্কাধাক্কি উপেক্ষা করে বিনা প্রয়োজনে ভার্সিটিতে গিয়ে ঘুরাঘুরি করার কোন মানে হয় না। আজ যে ভার্সিটিতে সাদমানের ক্লাশ নেই, সেটা আদনান ভাই জানেন। যেহেতু বড় ভাই তুল্য, তাই এইটুকু দায়িত্ব পালনে কার্পণ্য করেন না কখনো।

সাদমান ফোনে কথা বলছে। ও’প্রান্তের কেউ একজনের কথার জবাবে সে বললো, ‘হ্যাঁ, আসবো শিওর। আমি একটু পরেই বেরুচ্ছি।’
আদনান ভাই উনার পড়ার টেবিলে ছিলেন। পড়ছিলেন ম্যাক্সিম গোর্কির ‘মা’ উপন্যাস। বইয়ের পাতা থেকে মুখ তুলে সাদমানকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘তোমার আজ ক্লাশ আছে, সাদমান?’
সাদমান ব্যাগ গোছানোতে ব্যস্ত ছিলো। আদনান ভাইয়ের কথায় ব্যাগ গোছানো থামিয়ে বললো, ‘জ্বি না, ভাইয়া...’
– ‘ও আচ্ছা।’- আদনান ভাইয়ের স্বভাবজাত উচ্চারণ। ‘তাহলে কোথাও বেড়াতে যাচ্ছো নাকি?’
সাদমান বললো, ‘না ভাইয়া। একটু ভার্সিটিতে যাবো,এই আর কি...’
– ‘প্রোগ্রাম?’
– ‘জ্বি’
– ‘কিসের?’

সাদমান একটু থামলো। একমুহূর্ত ভেবে নিলো যে আদনান ভাইকে আসল কথা বলবে কি বলবে না।
'আদনান ভাই রক্তের কেউ না হলেও, উনার কাছে মিথ্যে বলাটা ঠিক হবেনা'- সাদমান মনে মনে ভাবলো।
এরপর বললো, 'জ্বি ভাইয়া, আসলে, আজকে তো হোলি উৎসব। তাই ডিপার্টমেন্টের ফ্রেন্ডরা মিলে চাচ্ছে একটু আনন্দ-টানন্দ করবে, তাই.......'
– 'ও আচ্ছা' বলে আদনান ভাই আবার 'মা' উপন্যাসে ডুব দিলেন।

গোসল-টোসল সেরে সাদমান একেবারে প্রস্তুত। নীল রঙা পাঞ্জাবি, সাদা রঙা পায়জামা। চোখে কালো সানগ্লাস। হাতে ঘড়ি।
বের হতে যাবে, অমনি আদনান ভাই বললেন, 'সাদমান শোনো......'
– 'জ্বি ভাইয়া, বলুন'
– 'হোলি উৎসবে তুমি কি নিজ ইচ্ছায় যাচ্ছো, নাকি বাধ্য হয়ে যেতে হচ্ছে?'
– 'ভাইয়া, আমি নিজ থেকেই যাচ্ছি। আসলে, আমার কিছু হিন্দু ফ্রেন্ড আছে। ওরা চাইছে আমরা একসাথে আজ কিছুক্ষণ মজা করি, তাই....'
– 'বেশ' – আদনান ভাই বললেন। এরপর আবার বললেন, 'তুমি কি মনে করোনা, এই উৎসবে যোগ দেওয়ার মাধ্যমে, তুমি এমন একটা কিছুকে স্বীকৃতি দিচ্ছো, মেনে নিচ্ছো, যার সাথে তোমার ঈমানের প্রশ্ন জড়িয়ে আছে?'
সাদমান বললো, 'ভাইয়া কি রকম?'
– 'তুমি কি হোলি উৎসবের কাহিনী জানো? ইতিহাস?'
– 'না ভাইয়া।'- সাদমান বললো।
– 'আমি যতোদূর জানি, হিন্দুদের অবতার শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক হোলিকা নামের এক রাক্ষসী বধ হয়। হোলিকা রাক্ষসীর দুষ্কর্মের সাজা সে পেয়ে গেছে ইহকালেই। তাই, দয়াপরবশ হয়ে শ্রীকৃষ্ণ তাকে রঙের মাদুলিতে পরিণত করে যাতে পরবর্তীতে সকল হিন্দুরা এই রঙ দিয়ে উৎসব করতে পারে।'
এতোটুকু বলে আদনান ভাই বললেন, 'তুমি বুঝতে পারছো,সাদমান?'
– 'জ্বি ভাইয়া।'
– 'এখন বলো, তুমি কি হিন্দু না মুসলিম?'
– 'মুসলিম'
– 'এই রঙ দিয়ে হোলিখেলার উৎসব কি তোমার জন্য চালু হয়েছে?'
সাদমান চুপ করে আছে। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললো, 'ভাইয়া, আমি হোলি উৎসব তো পালন করছিনা, কেবল তাদের একটু সঙ্গ দেবো, এই যাহ! আর, রঙ মাখলেই যে আমি হোলি উৎসবকে স্বীকৃতি দিচ্ছি, শ্রীকৃষ্ণ, হোলিকা রাক্ষসীকে স্বীকৃতি দিচ্ছি,তাও না। এটা আসলে আমার ইন্টেনশানের ব্যাপার। আমি কোন ইন্টেনশান থেকে যাচ্ছি বা করছি। একজন হিন্দু যে ইন্টেনশান নিয়ে এটা পালন করে, আমিও কী সে ইন্টেনশান থেকে যাচ্ছি, নাকি এমনি যাওয়ার

জন্যই যাচ্ছি- এটার উপর ডিপেন্ড করে।'
– 'সাদমান......'- আদনান ভাই বললেন।
– 'জ্বি ভাইয়া।'
– 'তুমি একজন মুসলিম,তাই না?'
– 'জ্বি অবশ্যই।'
– 'তুমি কি মনে করো দ্বীন ইসলাম একজন ব্যক্তির ইন্টেনশানের উপর ভিত্তি করে চলে? তোমার ইন্টেনশানই যদি আসল কথা হতো, তাহলে পশ্চিম দিকে ক্বেবলা নির্ধারণের কোন দরকার ছিলো না। তুমি যেকোন একদিকে মুখ করে পড়ে নিলেই হয়ে যেতো। হয় কি? হয় না। যদি তোমার ইন্টেনশানই সব হতো, তাহলে ফজ্বর সালাতের জন্য নির্দিষ্ট একটা টাইম ফিক্সড থাকতো না। তুমি দুপুর বারোটায় ধপাস করে ঘুম থেকে উঠে ফজ্বর পড়ে নিলেই হয়ে যেতো। এরকম হয় কি?'
সাদমান মাথা নিঁচু করে ফেললো। আদনান ভাইয়ের জায়গায় অন্য কেউ হলে সাদমান এসব কথাকে স্রেফ 'লেকচার' বলে উড়িয়ে দিতো। কিন্তু মানুষটা যেহেতু আদনান ভাই, তাই বুঝেই নিলো, এই কথাগুলোর নিশ্চই কোন রিজন আছে। তবু সে কাঁচুমাচু করে বললো, 'কিন্তু ভাইয়া.........'
তার মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে আদনান ভাই বললেন, 'একজন মুসলিম তার সবকিছুই সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছেই সোপর্দ করে। সুতরাং, তাতে কোন 'কিন্তু' 'যদি' 'অথবা' থাকতে পারেনা। থাকার কোন সুযোগ নেই।'
সাদমান আবার চুপ মেরে গেলো। আদনান ভাই আবার বলতে লাগলেন, – 'তুমি জানো, ঈমান এনেও যারা এসব ইন্টেনশানের দোহাই দিয়ে, মনোরঞ্জনের দোহাই দিয়ে, 'ধর্ম যার যার উৎসব সবার'- এরকম আপ্তবাক্যের দোহাই দিয়ে এসব অন্য ধর্মের কালচার নিজেদের মধ্যে প্রচলন করে, তাদের উদ্দেশ্য করে আল্লাহ সূরা ঈউসুফের ১০৬ নম্বর আয়াতে বলেছেন, 'অধিকাংশ লোক ঈমান আনা সত্ত্বেও মুশরিক।'
আয়াতখানা পড়তে যতোটাই হালকা মনে হচ্ছে, ওজনে,ভাবে আয়াতটা ততোটাই ভারি। এখানে সেইসব ঈমান আনা মুসলিমদের কথাই বলা হচ্ছে, যারা একইসাথে মুসলিম, আবার অন্তরে 'ধর্ম যার যার উৎসব সবার' টাইপ আপ্তবাক্য ধারণ করে। এদেরকেই আল্লাহ বলছেন,- এরা ঈমান আনে,তবুও এরা মুশরিক....'

সাদমান এবারও কিছু বললো না। আদনান ভাই এতোটুকু বলে আবার উপন্যাসের পাতায় ডুব দিলেন। ম্যাক্সিম গোর্কির উপন্যাস- 'মা'...

দুপুরের আজান হলো। মসজিদের মুসল্লিরা আসছে একে একে। তাদের মধ্যে নীল রঙা পাঞ্জাবি আর সাদা পায়জামা পরা সাদমানও আছে। সে অজু করছে। মুখে হাত দিয়ে ছড়াচ্ছে অজুর পানি। অথচ, এই মুখ,এই হাতে এখন অজুর পানির বদলে হোলির রঙ লেগে থাকার কথা ছিলো.......

‘তনু হত্যাকান্ড, নেপথ্যে কি সেনাবাহিনী? কিছু সংশয় এবং প্রশ্নঃ’

অনেকের মতো প্রথমে আমারও ধারনা হয়েছিলো তনুকে ধর্ষণ এবং হত্যাকান্ডের সাথে সেনাবাহিনীই জড়িত।

এইরকম ধারনা জন্মাবার পেছনে কয়েকটি কারন অবশ্য আছে।

১) তনুর লাশ যেখানে পাওয়া গিয়েছিলো, এলাকাটি সেনাবাহিনীর ক্যাম্পভুক্ত। এরকম একটি 'নিশ্চিদ্র' এবং 'মোষ্ট সিকিউরড' এলাকায় সাধারন জনগনের অবাধ যাতায়াতের কথা না। সেখানে বাইরের কেউ প্রবেশ করতে চাইলে, তাকে যথাযথ কারন, নাম,ঠিকানা,পেশা এবং পরিচিত কোন আর্মি অফিসারের বরাত দিয়েই প্রবেশ করতে হবে। সেখানে যখন এরকম একটি ধর্ষণ এবং হত্যাকান্ডের ঘটনা ঘটলো, সন্দেহের তীর সেনাবাহিনীর দিকে যাওয়াই স্বাভাবিক।

২) তনুর ভাই তার খালাতো বোনের বরাত দিয়ে বলেছে, 'কোন এক আর্মি অফিসার তনুকে বিরক্ত করতো।'

এখান থেকে কিছুটা সন্দেহ আসছে যে, এই ঘটনার পেছনে সেই সেনা কর্মকর্তা জড়িত নয় তো?

৩) তনুর হত্যাকান্ডটি ঘটেছে সেনানিবাসস্থ এলাকায়। কিন্তু এখন পর্যন্ত এই ঘটনায় সেনাবাহিনীর কোন প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি। তাদের নীরবতা তাহলে কি প্রমান করে?

৪) তনুকে ধর্ষণ এবং হত্যাকান্ড নিয়ে দেশের মেইনষ্ট্রিম প্রিন্ট মিডিয়া নীরব কেন? তারা কাদের অপরাধ ঢাকতে চায়?

উপরোক্ত সন্দেহগুলো থেকে এই ধর্ষণ এবং হত্যাকান্ডটি নিয়ে সেনাবাহিনীর দিকে আঙুল উঠা স্বাভাবিক।

তবে,সেনাবাহিনীকে দোষারোপ করার আগে আমি মনে করি আমাদের আরেকটু ভাবার যথেষ্ট দরকার আছে।

দরকার আছে, কারন–

১) দেশের অন্যান্য সেনানিবাস আর কুমিল্লা সেনানিবাসের মধ্যে একটি বেসিক পার্থক্য আছে।

পার্থক্যটি হোলো, - দেশের অন্যান্য সেনানিবাসগুলোতে প্রাইভেসি যতোটা জোরালো, কুমিল্লা সেনানিবাসে তারচেয়ে কিছুটা দূর্বল। কারন, এটির ভৌগলিক অবস্থানের কারনেই এটা সম্ভব না। কুমিল্লা সেনানিবাসের গা ঘেঁষেই অনেক পাবলিক স্থাপনা, দোকান-পাট, বাজার ইত্যাদি রয়েছে।

এমনকি, কুমিল্লা সেনানিবাসের বুক ছিড়েই চলে গেছে 'ঢাকা-চিটাগং' এবং 'সিলেট-চিটাগং' মহাসড়ক।

স্বাভাবিক কারনেই, দেশের অন্যান্য সেনানিবাসের চেয়ে কুমিল্লা সেনানিবাসে সাধারন জনগনের অবাধ যাতায়াত কিছুটা নয়, বরং অন্যগুলোর তুলনায় অনেক পরিমানেই বেশি।

এখন, যে সেনানিবাসে এরকম সাধারন জনগনের অবাধ যাতায়াতের বাঁধাদানে কিছুটা শীথিলতা অবলম্বন করা হয়, সেখানে একটি ধর্ষণ এবং হত্যার দায় আমরা একচেটিয়াভাবে সেনাবাহিনীর উপর চাপিয়ে দিতে পারিনা।

২) তনুর খালাতো বোন বলেছে, এক সেনা কর্মকর্তা তনুকে বিরক্ত করতো।

তনুর খালাতো বোনের এরকম জবানবন্দি কাউকে দোষী সাব্যস্ত করার জন্য মোটেই যথেষ্ট নয়।

কারন, তনুর বাবা নিজেও সেনানিবাসের একজন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারি। তারা থাকেও সেনানিবাসের মধ্যে একটি টিন-শেড ঘরে। এমতাবস্থায়, কোন সেনা কর্মকর্তা যদি কখনো তনুকে বিরক্ত করতো,তাহলে ব্যাপারটি তনু নিশ্চয় কোন না কোন সময় তার বাবাকে জানাতো। আর তার বাবাও নিশ্চয় ওই সেনা কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কমপ্লেইন করতো এবং এর রেকর্ডও থাকতো। কিন্তু এসবের কিছুই জানা যাচ্ছেনা। তাই, এই সময়ে বসে তার খালাতো বোন কি বলছে, তা কোনমতেই কাউকে দোষী বলার জন্য যথেষ্ট নয়।

প্রশ্ন উঠতে পারে, তার বাবা হয়তো চাকরি যাবার ভয়ে ওই সেনা কর্মকর্তার বিরুদ্ধে নালিশ করার সাহস পায়নি।

তাদের উদ্দেশ্যে বলছি, সেনাবাহিনীতে নিয়োজিত কোন চাকরিজীবীর (সে যে শ্রেণীরই হোক না কেন) চাকরি কোন সাধারন সেনা কর্মকর্তার মর্জি,ইচ্ছা,ভালো লাগা মন্দ লাগার উপর মোটেই নির্ভর করেনা। আর এই ব্যাপারটি তনুর বয়স্ক,অভিজ্ঞ পিতারও জানার কথা।

৩) তনুর ধর্ষণ এবং তদপরবর্তী ঘটনা নিয়ে এখনো কেনো সেনাবাহিনী নিশ্চুপ, সে ব্যাপারে অনেকেই সন্দেহ করছে।

যারা এই সন্দেহ করছে তারা হয়তো জানেনা যে, সামাজিক/গন যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে আমাদের সেনাবাহিনীর উপস্থিতি অন্যদের তুলনায় অনেক কম।

তারা এরকম কোন ঘটনার পর অফিসিয়াল বিবৃতি, শোক/দুঃখ প্রকাশ এসব করেনা।

আর, ঘটনা তদন্তের দায়ভার পুলিশ কাঁধে নিয়েছে। এমতাবস্থায় প্রমান ছাড়া আমরা কাউকেই

গড়পড়তা হারে দোষী বলে চালিয়ে দিতে পারিনা।
যারা বলছে, 'সন্দেহের তীর যেহেতু তাদের দিকে',
আরে ভাঈ, সন্দেহের তীর তাদের দিকে এটি আমি আর আপনি ভাবছি।আমাদের ভাবনা কি ১০০ ভাগ সত্য? আর, আমরা যে সেনাবাহিনীর দিকে আঙুল তুলছি তা হয়তো তারা জানেও না।জানবেও না যতক্ষন পর্যন্ত মূলধারার মিডিয়া ঘটনাটা তাদের কাছে ওইভাবে না পৌঁছাবে। এখন মিডিয়া তো আপনার বা আমার মতো আবেগপ্রবণ হয়ে সেনাবাহিনীকে দোষী বলে দিতে পারেনা। এরজন্য যথেষ্ট প্রমান চাই।

এবার একটু অন্যভাবে ভাবা যাকঃ

আচ্ছা, যদি যুক্তির খাতিরে ধরে নিই যে, এই ঘটনায় সেনাবাহিনী জড়িত,
তাহলে, আপনি কি মনে করেন এরকম কিছু করার পর সেনাবাহিনী তনুর লাশটিকে এরকম ওপেন প্লেসে ফেলে রেখে যাবে?
এইটুকু কমনসেন্স কি সেনাবাহিনীতে কর্মরত এরকম উচ্চপদের সৈনিকদের নেই?
তনুর লাশ যে স্থানে পাওয়া যায়, তার একটু দূরেই তার কিছু ছেঁড়া চুল পাওয়া গেছে। এখান থেকে বোঝা যায় যে, তাকে খুব নির্যাতন করেই ধর্ষণ করা হয়েছে।
এমতাবস্থায়, সেনাবাহিনীর মতো এরকম চৌকস সেনারা কি কোনভাবেই কোন এভিডেন্স আশ-পাশে রেখে যাবে? এত কাঁচা কাজ তারা করবে?

আচ্ছা, এখানে একটি 'পলিটিক্যাল গেইম' চলছে না তো?
দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ভোল্ট থেকে টাকা লোপাটের ঘটনায় সরকার এমনিতেই বেকায়দায়। গভর্নর বরখাস্ত হয়েছেন। সরকার বেশকিছু ইস্যু সামনে এনে এই ব্যাংক লোপাটের ঘটনাকে আড়াল করার চেষ্টা করেছে।এরমধ্যে, বাংলাদেশে জিকা ভাইরাস সনাক্ত ইস্যু, মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর রায়, কয়েকটি কলেজে হিজাব নিষিদ্ধ ইস্যু অন্যতম।
বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের দুই বোলার তাসকিন আহমেদ এবং আরাফাত সানীকে ICC কর্তৃক হঠাৎ ব্যান ইস্যুও এর মধ্যে ধরা যায়।
কিন্তু কোন ইস্যুই ব্যাংক ডাকাতির ইস্যুটাকে ধামাচাপা দিতে পারেনি।তাই সরকারের দরকার ছিল এমন কোন রগরগা ইস্যু, যা সহজেই ব্যাংক ডাকাতির ইস্যু থেকে জনগনের চোখ সরিয়ে আনতে পারবে।
তাহলে কি তনুকে রাজনৈতিকভাবে বলি হতে হোলো? ভাবুন।

আরেকভাবেও ঘটনাটির একটি ব্যাখ্যা দাঁড় করানো যায়ঃ

কয়েকদিন আগে একটি গুঞ্জন উঠলো যে,
'দেশের সেনানিবাসগুলোকে সরকারি আইনের আওতায় আনার প্রস্তাব উঠেছে মন্ত্রীসভায়।'
এটি হোলো আমাদের সেনাবাহিনীকে পুরোপুরি দলীয়করন করার পাঁয়তারা।
সেনানিবাসগুলোকে যদি সরকার তাদের আওতায় নিয়ে পরিচালনা করতে পারে, তাহলে কি ঘটবে ভাবতে পারছেন?
কিন্তু এই ব্যাপারে অন্য তিন বাহিনীর মতামত ভিন্ন ভিন্ন বলে ব্যাপারটি আপাতত ধামাচাপায় পড়ে গেছে।
এমতাবস্থায় সরকার যেকোন মূল্যে সেনাবাহিনীর ভিতর এরকম একটি ঘটনা ঘটিয়ে কি বোঝাতে চাইলো- 'সেনাবাহিনীর মধ্যে নৈতিক এবং মানবিক মূল্যবোধের ঘাটতি হয়েছে। নিজেদের সুরক্ষা এবং রিজার্ভড এলাকায় জনগনের সুরক্ষার ব্যাপারেও তারা উদাসীন। তাই এই মুহূর্তে সেনানিবাসগুলো সরকারি আইনের আওতায় আনাটা জরুরি।'

সরকার কি সেনাবাহিনী কে তাদের কব্জায় নিয়ে নিতে এই গেইম খেলছে না?
আরেকটি ব্যাপার, এই ঘটনা আমাদের মেইনষ্ট্রিম প্রিন্ট মিডিয়া চেপে যাচ্ছে।
তারা কি আসলেই চেপে যাচ্ছে না তাদের চেপে যেতে বাধ্য করা হচ্ছে, যাতে করে সেনাবাহিনীর প্রতি সাধারন নাগরিকের এই সন্দেহ সংশয় চরমে উঠে ক্ষোভ এবং একটি অঘটন ঘটানো যায়, এজন্যে?

আমরা আরো খেয়াল করেছি, শাহবাগ এই ইস্যুতে আন্দোলনে নেমেছে। বিগত কয়েকটি বছরে শাহবাগ এবং এর হর্তা-কর্তাদের চিনতে আমাদের কি আর কিছু বাকি আছে?
আমরা তো জানি তারা কার ইশারায় চলে। নির্দিষ্ট মহলের ইশারা না পেলে যে তাদের চেতনা বিস্ফোরিত হয়না, এটা তো সর্বজনবিদিত।
তা নাহলে, এর আগের এরকম অনেক ইস্যুতে তারা আন্দোলনে এলোনা কেনো?
বিশ্বজিত ইস্যু, পুলিশ কর্তৃক সাধারন জনগনকে ভোগান্তির ইস্যু, পুলিশ কর্তৃক চা দোকানিকে পুঁড়িয়ে মারার ইস্যু, মন্ত্রী কর্তৃক মদ খেয়ে শিশুর পায়ে গুলি করা, ছাত্রলীগ-যুবলীগ দ্বারা হিন্দু গর্ভবতী মহিলার পেটে লাথি দিয়ে পেটের সন্তান খুন, ব্যাংক লোপাট, সুন্দরবন ইস্যু সহ অনেক
ইস্যুতে তারা টুঁ শব্দও করেনি।
এমনকি, শাহবাগি মহিলা কর্মী কৃষ্ণকলির বাসায় ফ্যানের সাথে ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া গেছে কাজের মেয়ের ক্ষত-বিক্ষত লাশ। পুলিশ বলছে মেয়েটিকে ধর্ষন করে খুন করা হয়েছে। কিন্তু এটা নিয়ে শাহবাগিদের কোন সাড়াশব্দ নেই। কিছু বুঝছেন?
যেখানেই দেখবেন শাহবাগিরা কোন ইস্যু নিয়ে লাফাচ্ছে, তখনই বুঝে নিবেন- সামথিং হ্যাজ।

পরিশেষে তনু হত্যার সঠিক তদন্ত চাই। আসল অপরাধীদের কঠোরতম বিচার চাই। তনু যদি রাজনৈতিকভাবে বলির পাঁঠা হয়ে থাকে, এমন কুৎসিত রাজনীতির বিরুদ্ধে সকলের ঐক্যবদ্ধ অবস্থান চাই।

'ছদ্মবেশী জগলু দা'

ভিড়ের মধ্যে হঠাৎ আমি জগলু দা কে দেখলাম।
লম্বা আলখেল্লা পরা, দাঁড়ি-গোঁফে মুখ ভর্তি।
প্রথমে ভাবলাম ভুল দেখছি হয়তো। কিন্তু অনেকক্ষন পর বুঝতে পারলাম,- না, এটা আমাদের জগলু দা-ই।
এত বছর পরে জগলু দা'কে আবার দেখতো পাবো এটি স্বপ্নেও কখনো ভাবিনি। আমরা তো ধরেই নিয়েছিলাম যে জগলু দা মরে গেছে। তাই জগলু দা'কে দেখে প্রথমে ভূত দেখার মতোই খানিকটা চমকে উঠলাম।
জগলু দা যখন গুম হয়ে যায় তখন আমি বাড়ন্ত কিশোর, আর জগলু দা টগবগে যুবক। এতবছর পরে জগলু দার আমাকে না চেনাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু জগলু দা কে আমি ঠিকই চিনেছি।
'
জগলু দা খুব সাবধানে ভিড়ের মধ্যে মিলিয়ে যাচ্ছে।
দ্রুতবেগে ভিড়ের মধ্যে পা চালাচ্ছে। আমি পেছন পেছন তাকে অনেকক্ষন ফলো করলাম। কাছাকাছি গিয়ে একবার ভাবলাম যে, জগলু দা বলে চিৎকার দিই। জগলু দা চমকে যাক। আবার ভাবলাম,- নাহ! আগ-পিছ না ভেবে ডাক দেওয়াটা ঠিক হবেনা। আমি স্পষ্টই বুঝতে পারছি জগলু দা নিজেকে কেমন যেন লুকোচ্ছে। মাথার গোল টুপিটা বারবার চোখ বরাবর টেনে দিচ্ছে যেন কেউ তার চেহারা দেখতে না পায়।
অনেকক্ষণ পিছু পিছু হাঁটার পর একটি নীরব কোলাহলমুক্ত জায়গায় এসে ডাক দিলাম,- 'জগলু দা?'
সে বৈদ্যুতিক শক খাওয়ার মতোই চমকে উঠলো।
এভাবে না চমকালে হয়তো আমিই বিভ্রান্ত হতাম যে এটা আদৌ জগলু দা কিনা। এখন পুরোপুরি নিশ্চিত যে এটা আমাদের সেই জগলু দা।
আমি বললাম,- 'কেমন আছো জগলু দা?'
জগলু দা চেহারায় এমন একটি ভাব আনলো যেনো আমি ভিন গ্রহের কোন প্রাণী, আর তার সাথে বাংলা ভাষায় কথা বলছি বলে সে যারপরানই অবাক হচ্ছে।
আমি আবার বললাম,- 'ওমা! আমায় চিনছো না? আমি বদিউল।'
সে জিজ্ঞেস করলো,- 'কোন বদিউল?'
আমি চোখ বড় বড় করে বললাম,- 'অই যে, ছোটবেলায় তোমাদের দোকান থেকে লজেন্স

কিনতাম? মনে নেই?'

জগলু দা'র চাহনি একটু স্বাভাবিক হলো।আমার বাম হাত ধরে আমাকে টেনে পাশের জারুল গাছের তলায় নিয়ে গেলো।বললো– 'তুই আমাকে কিভাবে চিনলি রে?'

আমি মুচকি হাসি দিয়ে জবাব দিলাম,-'তোমার কাঁধে চড়ে কতোবার মেলায় গেছি তার ইয়ত্তা নেই।তোমার কোলের উপর বসে নাগরদোলায় কত্তো চড়েছি।সেই তোমায় চিনবো না বুঝি?'

জগলু দা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো।বললো– 'আচ্ছা, আমাকে দেখেই চিনে ফেলেছিস? নাকি অনেকক্ষন পরে চিনেছিস?'

আমি বললাম,-'দেখা মাত্রই চিনবো কি করে বলো? তুমি যেরকম কাবুলি ওয়ালার বেশ নিয়েছো।'

-'কেউ চিনে ফেলবে না তো?'

-'চিনে ফেললে কি হবে?'

-'ও তুই বুঝবিনা।আগে বল।'

-'না, চিনবেনা।'

'

জগলু দা'কে আমার বাসায় নিয়ে এলাম।খেতে খেতে বললাম, -'তুমি এতবছর কোথায় ছিলে গো?'

জগলু দা বললো,-'মরে গিয়েছিলাম।'

-'ভূত হয়ে এসেছো বুঝি? হা হা হা হা'।

-'হ্যাঁ, ঘাড় মটকানোর জন্যই ভূত হয়ে এসেছি।'

জগলু দা'র চোখ–মুখ শক্ত।

আমি বললাম,-'কার ঘাড় মটকাবে? আমার?'

জগলু দা ভারি গলায় জবাব দিলো– 'সোলেমান বেপারির।'

আমি একটু থতমত খেলাম। সোলেমান বেপারির কথা বললো কেন জগলু দা?

আমি বললাম, -'জগলু দা, আমি ঠিক বুঝিনি।মজা করছো?'

জগলু দা ধমকের সুরে বললো,-'তোর কি মনে হয় আমি মজা করার জন্যে এই বেশে এখানে এসে উঠেছি?'

জগলু দা'র কন্ঠে রাগ ঝরছে।বুঝতেই পারছি সিরিয়াস কিছু।অতো ছোটবেলার কথা আমার মনে পড়ছেনা।তাই বুঝতে পারছিনা আসল ঘটনা কি।

আমি বললাম,-'ওমা! তুমি না বললে আমি কি করে বুঝবো,বলো?'

জগলু দা তার আলখেল্লার পকেট থেকে একটি কালো রঙের পিস্তল বের করে বললো,- 'সোলেমান বেপারিকে খুন করতে এসেছি।'

আমি কিছুক্ষনের জন্য বাকশক্তি হারিয়ে ফেললাম।লোকটা বলে কি?

আমি বললাম,-'এবার কিন্তু তুমি মজা করছো।'

- 'না, মজা নয়। সত্যি।'
আমি বললাম,- 'কিন্তু তুমি সোলেমান বেপারিকে খুন করবেই বা কেন?'
জগলু দা বললো,- 'তুই জানিস, এই সোলেমান বেপারির জন্যই আমার মা'কে মরতে হয়েছে।'
জগলু দা'র চোখে অশ্রু। জগলু দা গুম হবার আগে তার মা মরে গিয়েছিলো জানি, কিন্তু তার জন্য যে সোলেমান বেপারি দায়ী জানতাম না।
জগলু দা বলে যাচ্ছে,- 'সেদিনের সেই বৃষ্টির রাতে সোলেমান বেপারি যদি একটু সাহায্য করতো, তাহলে আমার মা'কে হাসপাতালে নিয়ে যেতে পারতাম। মা আমার রক্তবমি করে মরতো না।'
জগলু দা অঝোর ধারায় কাঁদতে লাগলো। জগলু দা'র কান্না দেখে আমারও কান্না পাচ্ছে। মনে পড়লো, এক তুমুল বৃষ্টির দিনে জগলু দার মা মারা গেছিলো। জগলু দা'র সে কি আকাশ-পাতাল এক করা আহাজারি!
আমি বললাম,- 'ঠিক আছে, আমিও আছি তোমার পাশে। শালারে উচিত শিক্ষা দিবো।'
'
আজকে সোলেমান বেপারির এলাকায় একটা সভা আছে। কমিশনারে দাঁড়াচ্ছে।
জগলু দা'কে নিয়ে আমি সভাস্থলে চলে এলাম। একদম সামনের দিকে এসে বসেছি দু'জনে। কালো পিস্তলটি জগলু দা'র পকেটে। সোলেমান বেপারি আসলেই এ্যাকশান হবে।
আমি চুপিসারে জগলু দা'র কানে কানে বললাম,- 'জগলু দা, পিস্তলটা দাও তো একটু। ধরে দেখি।'
জগলু দা ধমক দিয়ে বললো,- 'চুপ কর।'
আমি একদম চুপ করে গেলাম।
জগলু দা বললো,- 'হ্যাঁ রে বদা, শুনছিস?'
আমি জবাব দিলাম না। জগলু দা আবার বললো,- 'কি হলো? রাগ করেছিস?'
আমি মুখ ভার করে বললাম,- 'আমার নাম বদা নয়। বদিউল।'
জগলু দা হো হো করে হেসে উঠলো। বললো,- 'আমার নাম কি জগলু নাকি? আমায় কেনো জগলু দা ডাকিস?'
তাই তো। জগলু দা'র ভালো নাম কি তা তো আমরা কেউই জানিনা। বললাম,- 'তোমার ভালো নাম কি গো?'
জগলু দা হেসে এড়িয়ে গেলো। বললো,- 'আচ্ছা বদিউল, সোলামান বেপারির একটি মেয়ে আছে নাকি?
- 'হ্যাঁ।'
- কি নাম?
- রেণু।
- বয়স?

-৮ বছর।

-শুনলাম, মেয়েটার একটা কিডনি নাকি নষ্ট?

আমি বললাম,-'কার কাছে শুনলে?'

-'পাল্টা প্রশ্ন করবি না তো।যা জিজ্ঞেস করেছি তার উত্তর দে।'

-হ্যাঁ।

জগলু দা বললো,-'তাহলে সোলেমান বেপারিকে এখন খুন করবো না।কি বলিস?অই ব্যাটাকে এখন মেরে ফেললে মেয়েটার চিকিৎসা আটকে যাবে।'

'

এর এক সপ্তাহ পর এক সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি জগলু দা নেই।

চারপাশে অনেক খুঁজলাম।নাহ,কোথাও নেই জগলু দা।আবার গুম হয়ে গেছে।'

'

এলাকায় কানাঘুঁষা চলছে, সোলেমান বেপারির মেয়েটার জন্য কোন এক অজ্ঞাত ব্যক্তি কিডনি দিয়ে গেছে।অজ্ঞাত ব্যক্তির নাম ঠিকানা জানা যায়নি।তবে নাম জানা গেছে, -জহিরুল ইসলাম।

কোথাকার কোন জহিরুল কে জানে! আমি জগলু দা'র অপেক্ষায় আছি। কখন আসবে কখন আসবে। সোলেমান বেপারিকে একটা শিক্ষা দেওয়া খুব দরকার।

'

সেদিন ভোরে আমার ড্রয়ার খুলতেই হঠাৎ দেখলাম সেখানে জগলু দা'র সাথে আনা পুটলিটা রাখা।এই রে!! পুটলি রেখেই গুম হয়ে গেছে বেচারা!!

আমি পুটলিটা খুললাম।একটি ডায়েরি,একটি আয়না,একটি চিরুনি আর সেই কালো পিস্তলটি।

ডায়েরির প্রথম পাতা উল্টালাম।

সেখানে এড্রেসে লেখা– নাম– মোঃ জহিরুল ইসলাম (জগলু)।

বয়স– ৩৭

আমি যেন মূহুর্তেই কোথায় হারিয়ে গেলাম।

কালো পিস্তলটি হাতে নিলাম। একদম হালকা জিনিস।একটু নাড়াচড়া করে বুঝলাম এটি খেলনার পিস্তল।ছোটবেলায় কতো কিনতাম।জগলু দা–ই কিনে দিতো।

এরপর আরো ৮ টি বছর কেটে গেলো।কিন্তু জগলু দা'র দেখা আর পাইনি।

আলখেল্লা পরা কাউকে দেখলেই আমার ইচ্ছে হয় ডাক দিই– 'জগলু দা, ও জগলু দা............?'

'আল কোরআনের ভাষাশৈলি – এক অনন্য মুজিজা (আয়াতুল কুরসি)'

আয়াতুল কুরসী সম্পর্কে এতদিন শুধু এটুকুই জানতাম যে, এটা তিলাওয়াত করলে এত এত নেকি হয়। ফেরেস্তারা প্রটেক্ট করে ইত্যাদি। কিন্তু এটার মাঝে যে এত মিরাকল,এত বিস্ময় লুকিয়ে আছে জানতাম না। ওস্তাদ নুমান আলি খানের কাছেই জানলাম কতো বিস্ময়ই না ধারন করছে আল কোরআনের সূরা বাকারা'র এই অংশটুকু।
আপনাদের সাথে শেয়ার করছি। অনেকেই হয়তো জানেন সেটা। যারা জানেন না, তাদের জন্য।

আয়াতুল কুরসী'তে মোট বাক্য আছে নয়টি।
মিরাকলটা বুঝার আগে কিছু হিন্টস দরকার,এতে সেটা বুঝতে অনেক সহজ হবে।
মিরাকলটা হলো এই,- নয় বাক্যের প্রত্যেকটি অন্যটির সাথে ভাবে,অলঙ্কারে,অর্থে হুবহু মিলে যাবে। কিন্তু মিলবিন্যাসটা হবে উল্টোদিক থেকে।
মানে, ১ নং বাক্যের সাথে একদম শেষ বাক্য। অর্থাৎ, ১ এর সাথে মিলবে ৯।
২ এর সাথে মিলবে ৮।
৩ এর সাথে মিলবে ৭।
৪ এর সাথে মিলবে ৬।
কিন্তু ৫ নং বাক্যে থাকবে একলা। এটির সাথে কোন বাক্যের ম্যাচ হবেনা। আর, এটিও অন্যতম একটা বিস্ময়।
এবার সরাসরি আয়াতুল কুরসীতে চলে যাওয়া যাক। আমরা উপরে উল্লিখিত সিকোয়েন্স অনুযায়ী মিরাকলটা দেখবো। (১-৯) (২-৮) (৩-৭) (৪-৬) এভাবে।
আয়াতুল কুরসীর প্রথম বাক্য হলো–
'আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই, তিনি চিরঞ্জীব (হাইয়্যুল) ,চিরস্থায়ী (কাইয়্যুম) ।'
খেয়াল করুন, উল্লিখিত বাক্যে আল্লাহর দুটি গুণ/অবস্থা/নাম (সিফাত) এর উল্লেখ আছে।
একদম শেষ বাক্যে চলে যাই। শেষ বাক্য অর্থাৎ ৯ নং বাক্যটি হলো– 'তিনিই সর্বোচ্চ (আলিয়্যুল) এবং সর্বাপেক্ষা মহান (আজীম)।'

দুই বাক্যেই আল্লাহর সিফাতের বর্ণনা,এবং দুটিতে আল্লাহর দুটি করে সিফাতের উল্লেখ আছে।(১ এর সাথে ৯ এর এটাই হলো সিকোয়েন্স)

দুই নম্বর বাক্যে যাওয়ার আগে একটা বিষয় জানা জরুরি।তা হলো- ঘুম আর তন্দ্রার মধ্যকার পার্থক্য।ইংরেজি,বাংলা ইত্যাদি ভাষায় 'ঘুম' আর 'তন্দ্রা' র জন্য আলাদা শব্দ/অর্থ নেই।এসব ভাষায় ঘুম মানে যা বোঝায়, তন্দ্রা মানেও তা বোঝা হয়।
কিন্তু আরবিতে সেরকম না।
ঘুম মানে- যখন আমরা একদম মৃত্যুর মত হয়ে যায়।কিছুর খেয়ালে থাকিনা।কিছুই বুঝিনা,কিছুই শুনিনা।
আর তন্দ্রা হলো- ঘুমের প্রাথমিক পর্যায়।যেটাকে আমরা অন্যভাবে 'ঝিমুনি' বলি।তন্দ্রা কিন্তু ঘুম নয়,ঘুমের প্রাইমারি ষ্টেপ।
আরবিতে ঘুমকে বলে- নাঊম।আর তন্দ্রা/ঝিমুনিকে বলে- 'সীনা'।
এইজন্যে ফজরের সালাতে মুয়াজ্জিন বলে- 'আচ্ছালতু খাইরুম মিনানাঊম'।ঘুম হতে সালাত উত্তম।
মুয়াজ্জিন কিন্তু বলেনা- 'আচ্ছালাতু খাইরুম মিনাসসীনা'।
যাইহোক, আমরা বাক্যটি দেখি।বাক্যটির অর্থ হলো- 'তাঁকে তন্দ্রাও স্পর্শ করতে পারে না এবং নিদ্রাও নয়।'
এটি হচ্ছে ২ নং বাক্য।এবার শেষ থেকে ৮ নং বাক্যটি দেখি।(কারন সিকোয়েন্স অনুযায়ী ২ এর সাথে ৮ এর মিলবিন্যাসের কথা বলেছি)।
৮ নং বাক্যটি হচ্ছে- 'আকাশ এবং জমিন নিয়ন্ত্রন করা আল্লাহর জন্য কঠিন নয় (তিনি তাতে ক্লান্ত হন না)।'
খেয়াল করুন, ২ নং বাক্যে বলা হয়েছে- ঘুম আর তন্দ্রা আল্লাহকে স্পর্শ করেনা।
আমাদের কখন ঘুম বা তন্দ্রা/ঝিমুনি আসে?
যখন আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়ি।
৮ নং বাক্যেও আল্লাহ বলেছেন একইরকম কথা।
'আকাশ এবং জমিন নিয়ন্ত্রনে তিনি ক্লান্ত হন না'- কারন (২ নং বাক্যেই তিনি বলে এসেছেন, ঘুম এবং তন্দ্রা তাকে স্পর্শ করতে পারেনা।)
২ নং বাক্যের সাথে ৮ নং বাক্যের এই হলো অসাধারন মিল।

৩ নং বাক্যে যাওয়ার আগে আপনাকে আরো একটি বিষয়ে ক্লিয়ার হতে হবে।সেটি হচ্ছে- 'মালিক' দুই রকমের।একটি হচ্ছে ক্ষুদ্র জিনিসের মালিক,একটি বড় জিনিসের মালিক।
একটির ব্যবহার ক্ষুদ্রার্থে, অন্যটি বৃহদার্থে।
যেমন, আপনার হাতে একটি কলম থাকলে আপনি বলেন,- আমি এই কলমের মালিক।কিন্তু

আপনি বলেন না যে,- আমি এই কলমের রাজা। কারন, কলম শব্দের মালিকানার সাথে 'রাজা' শব্দ ম্যাচ হয়না। রাজা শব্দটি ম্যাচ হয় বিশাল রাজত্ব বুঝাতে,যার ব্যাপ্তি বিশাল।
এবার ৩ নং বাক্যটি দেখুন। বাক্যটি হলো- 'আসমান ও যমীনে (ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র) যা কিছু রয়েছে, সবই তাঁর।'
এবার ৭ নং বাক্যে কি আছে দেখুন।
সেটি হলো- 'তাঁর সিংহাসন সমস্ত আসমান ও যমীনকে পরিবেষ্টিত করে আছে।'
এখানে লক্ষ্যনীয় ব্যাপার, ৩ নং বাক্যের বিষয় আর ৭ নং বাক্যের বিষয় একই। তা হলো- আল্লাহর মালিকানা। ৩ নং বাক্যে তিনি আসমান আর জমিনের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জিনিসের মালিকানা যে তার,সেটা ঘোষণা করেছেন, আর ৭ নং বাক্যে এতদমধ্যে, ক্ষুদ্র-বিশাল যা কিছু আছে,সব কিছুই যে তার, সেটার ঘোষণা।
৩ আর ৭ এর মধ্যে এটাই হলো আশ্চর্য রকম মিল।

এবার ৪ নম্বর বাক্যে যাওয়া যাক। এখানে বলা হচ্ছে-
'কে আছ এমন, যে সুপারিশ করবে তাঁর কাছে তাঁর অনুমতি ছাড়া?'
খেয়াল করুন, আল্লাহ প্রশ্ন ছুড়ছেন, কে আছ এমন কিয়ামতের দিন সুপারিশ করার মতো আল্লাহর কাছে?
এর ঠিক পরেই আল্লাহ একটা 'কিন্তু (but) লাগিয়ে বলছেন- 'আল্লাহর অনুমতি ছাড়া'।
অর্থাৎ, কেউই সেদিন আল্লাহর কাছে সুপারিশ করতে পারবেনা। শুধু সেই-ই পারবে, যাকে তিনি পারমিশান দিবেন।
এবার শেষ থেকে ৬ নং বাক্যে যাই। সেখানে আল্লাহ বলছেন-
'তাঁর জ্ঞান সম্পর্কে তারা কোন কিছুই জানেনা কিন্তু ততটুকু (তারা জানতে পারে) যতটুকু তিনি ইচ্ছা করেন।'
দেখুন, ৪ নম্বর বাক্যে বলা হলো- সেদিন কেউ সুপারিশ করতে পারবেনা,শুধু সে ব্যতীত যাকে তিনি পারমিশান দিবেন।
প্রথমে বলেছেন কারো ক্ষমতা নেই সুপারিশের যতক্ষন না তিনি অনুমতি দিচ্ছেন।
৬ নম্বর বাক্যে বলছেন, - তার জ্ঞান সম্পর্কে কেউই জানেনা, যতক্ষন না তিনি ইচ্ছামাফিক কাউকে জানাচ্ছেন। দুটি বাক্যেই দুটি Clause ব্যবহৃত হয়েছে।
এটিই হলো ৪ আর ৬ মধ্যে চমৎকার মিলবিন্যাস।
আর বাকি রইলো- ৫।
১ এর সাথে ৯ গেলো।
২ এর সাথে ৮।
৩ এর সাথে ৭।
৪ এর সাথে ৬।

৫ রয়ে গেলো একা। মোষ্ট সারপ্রাইজিং ম্যাটার ইজ, এই ৫ নং বাক্যে এমন কিছু বলা হয়েছে,যার সম্পর্কে ১-৪ বা ৬-৯ কোথাও কিছু বলা হয়নি।
পুরো ৯ বাক্যের মধ্যের বাক্য হচ্ছে এই ৫ নম্বর বাক্যটি। আর, ১-৪ এবং ৬-৯ বাক্যগুলোর মধ্যে অসাধারন এক সামঞ্জস্য নিয়ে বলা হয়েছে এই বাক্যে।
বাক্যটি হলো- 'দৃষ্টির সামনে কিংবা পিছনে যা কিছু রয়েছে সে সবই তিনি জানেন।'
খেয়াল করুন, বাক্যটি এমন এক জায়গায় (৫ নম্বরে), যার আগের বাক্য আর পরের বাক্যে আল্লাহ তার রাজত্ব,ক্ষমতা,গুণ,সিফাত,সৃষ্টির কথা বলেছেন।
তিনি বাক্যটি একদম মাঝখানে দিলেন, আর বলছেন 'এর সামনে পেছনে যা আছে তার সবই আমি জানি।'
এরকম করে কোন সাহিত্যিক, কোন কবি কি বলতে পারবে?
শুরুর প্রথম বাক্যের সাথে শেষের শেষ বাক্যের মিল। শুরুর দ্বিতীয় বাক্যের সাথে শেষের দ্বিতীয় বাক্যের মিল। শুরুর তৃতীয় বাক্যের সাথে শেষের তৃতীয় বাক্য। শুরুর চতুর্থ বাক্যের সাথে শেষের চতুর্থ বাক্য।
আর, তার মাঝখানে এমন একটি বাক্য যা সমন্বয় করছে আগে পরের সবকিছু? সুবাহান আল্লাহ ওয়া বিহামদিহি!

কোরআনের এমন ভাষা শৈলি,এমন বর্ণনা ভঙ্গি,এমন চমৎকার উদাহরন।
এইজন্যেই আল্লাহ সুবাহান ওয়া'তালা বার বার চ্যালেঞ্জ করেছেন- 'তোমরা (অবিশ্বাসীরা) যদি পারো অন্তত এর মতো (কোরানের) একটি আয়াত লিখে আনো।'

‘জীবন যেখানে যেমন.....’

(১)

লাশটাকে দাফন করার যাবতীয় কাজ মর্গেই সেরে ফেলা হয়েছে।গোসল, কাফন ইত্যাদি। সাধারনত মর্গে এসব কাজ করা হয়না, তবে এই মহিলার সাথে কেনো করা হলো সেটা বোঝা যাচ্ছেনা।হতে পারে কারো নির্দেশে।
নির্দেশটা কার হতে পারে?
ইনি একজন পতিতা। সভ্য সমাজে একজন পতিতার জন্য 'ইনি' সম্বোধন যথারীতি বাড়াবাড়ি।আমরা যারা সভ্য সমাজের সভ্য মানুষজন, তারা এই ক্যাটাগরির মহিলাদের সাধারনত তুই তুকারি করি।তবুও এই মহিলার জন্য কেনো জানি 'ইনি' ব্যবহার করতে ইচ্ছে হচ্ছে।
এই মহিলার লাশটাকে ঘিরে একটি হুলস্থুল কান্ড শুরু হয়েছে।
রফিক সাহেব মহল্লার সবচেয়ে ধনী লোক। পাঁচতলা আলিশান ফ্ল্যাট উনার।এই মহল্লা তো বটেই, আশপাশের চার-পাঁচ মহল্লাতেও এরকম নয়নাভিরাম দালান দ্বিতীয়টি নেই।
রফিক সাহেব কোনমতেই এই পতিতার লাশ মহল্লার গোরস্থানে দাফন করতে দেবেন না।
'দূর্ঘটনায় মরছে তো কি হইছে? সে তো পতিতা।'- রফিক সাহেবের জোরালো যুক্তি।
দুনিয়ার চিরাচরিত নিয়ম- ভারি জিনিসের দিকেই পাল্লা ঝুঁকে পড়ে।
রফিক সাহেব ভারি মানুষ।টাকা-পয়সায় ভারি। যশ-খ্যাতিতে ভারি।দাপট-ক্ষমতায় ভারি।মেদবহুল শরীর,তাই স্বাস্থ্যের দিক থেকেও উনি খুব ভারি।তাই সমর্থনের পাল্লাটাও উনার দিকে ঝুঁকে পড়লো।মহল্লার সবাই এক বাক্যে বলে উঠলো,- 'পতিতার লাশ মহল্লার গোরস্থানে দাফন হবেনা।'
.
তার পরের বছর আমরা ঢাকা চলে আসি।বনানী দিয়ে রোজ আসা-যাওয়া।
রফিক সাহেবও পরিবার নিয়ে ঢাকা চলে আসেন।
এক ছুটির দিনে কোন একটি কাজে কাঁটাবন গিয়েছিলাম।ফিরতে ফিরতে প্রায়ই সন্ধ্যা হয়ে এলো।যে পথ দিয়ে আসছি তার পাশেই একটি পতিতালয় আছে।
ভদ্র ভাষায় বলে 'নিষিদ্ধপল্লী'।
ছুটিরদিন।খদ্দেরদের আনাগোনা স্বাভাবিক।
কোন এক আশ্চর্য কারনে একজন লোকের দিকে আমার চোখ আটকে গেলো।

কৌতুহলী মনের কৌতুহল মেটাতে লোকটার পিঁছু নিলাম।
অনেকক্ষন ধরে অনুসরন করার পর লোকটাকে আমি চিনতে পারলাম।
ইনি আমার এলাকার সেই রফিক সাহেব।সুরসুরিয়ে ঢুকে পড়লেন ভিতরে।এপাশ-ওপাশ তাকানোর ফুসরত নেই।
একবছর আগে সেই পতিতার লাশকে মর্গের লোকেরা ঠিক কি করেছে আমার জানা নেই। হয়ত কোন নদীতে ফেলে দিয়েছে।কুমির-হাঙ্গরের খাদ্য হয়েছে শত শত পুরুষকে তৃপ্ত করা দেহখানা।
সেই পুরুষগুলোর মধ্যে কি রফিক সাহেবও একজন? আমি জানিনা।
আচ্ছা, যারা দেহ বিক্রি করে তাদের আমরা 'পতিতা' বলি, যারা দেহ ভোগ করে তাদের কি বলা হয়? আমি জানিনা।
রফিক সাহেব মারা গেলে কি তাকে মহল্লার ওই গোরস্থানে দাফন করা হবে যেখানে একজন পতিতার লাশ দাফন করতে দেওয়া হয়নি?
যে দেহ বিক্রি করে আর ওই দেহ যে ভোগ করে তাদের মধ্যে পার্থক্য কি?
রফিক সাহেবের লাশকে কি নদীতে ফেলে দেওয়া হবে?
নাকি তার কবরের উপর হাজার হাজার টাকার ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হবে?
'

(২)

ইউনিভার্সিটির ট্রেনে বসে আছি। হঠাৎ চারপাশ কাঁপিয়ে ট্রেনে উঠে এলেন এক সুদর্শনা নারী।
উনি উঠামাত্রই ট্রেনের সিটে বসে থাকা এক জুনিয়র ছোট ভাই ধপ করে নিজের সিট ছেড়ে দিয়ে উনাকে বসতে দিলেন।
জুনিয়র ভাইটা সকাল সকাল এসে এই সিটখানা দখল করেছিলো।বেচারা হয়তো এই সিট ধরার জন্য সকালের নাস্তাও করেনি।
কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা ইন্ডিরেক্ট কমান্ড হলো এই- সিনিয়র কাউকে দেখামাত্রই জুনিয়রেরা তাদের সিট ছেড়ে দিতে বাধ্য থাকিবে।
তবে শর্ত হলো- এই সিনিয়রকে অবশ্যই 'পলিটিক্যালি' ক্ষমতাসীন দলের সিনিয়র হতে হবে। হাবাগোবা অথচ নন-পলিটিক্যাল সিনিয়র কারোর ক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রযোজ্য নয়।
যেই মহিলাকে দেখামাত্রই ছোট ভাইটি সিট ছেড়ে দিলো, উনি একটি হলের নারী নেত্রী।উনার কর্তৃত্ব শুধু মহিলা হলেই নয়, পুরুষ হলেও ব্যাপক লক্ষ্যনীয়।
যাহোক, সিনিয়র এই ছাত্রী নেত্রী আসা মাত্রই আড্ডা জমে উঠলো।উনার ভক্তবৃন্দ উনার নানান বিষয়ে 'হ্যাঁ-না' 'হ্যাঁ-না' করছে।
একপর্যায়ে নেত্রী বললেন,- 'গার্মেন্টসে যেসব মেয়েরা চাকরি করে, এরা আর ক' টাকা বেতন

পায়? এদের বেশিরভাগ দেহ বিক্রি কইরা চলে।প্রতিটা গার্মেন্টস আর প্রতিটা বস্তি একেকটা পতিতালয়।'

আমি বিস্মিত হলাম। সকলে তার এই কথায় সাঁয় দিলো।

বুঝে সাঁয় দিলো, নাকি না বুঝে সাঁয় দিলো বুঝলাম না।

গার্মেন্টসের মেয়েরা সকাল ৭ টায় কর্মস্থলে যায়, ফিরতে ফিরতে রাতের ৮ টা থেকে সাড়ে ৮ টা বাজে। এরপর তাদের দেহবিক্রির সময়,সুযোগ,শক্তি থাকে কিনা আমি জানিনা।

অথচ, গার্মেন্টসের মেয়েদের দিকে দেহ বিক্রির অভিযোগের আঙ্গুল তোলা এই মহিলা সম্পর্কে আমি জানি।

ইনি রাত-বিরাতে ছেলেদের হলে যাওয়া আসা করেন। ছাত্রনেতাদের সাথে রাত-দুপুরে মিটিং করেন। গভীর রাত অবধি ক্যাম্পাসে ঘোরাঘুরি করেন। রাতের বেশিরভাগ সময়ে উনার বিভিন্ন পার্টি থাকে।দু-তিনজন ছেলের সাথে একই রিক্সায় চড়তে হরহামেশাই দেখি।গাড়িতে ছেলেদের গা ঘেঁষে বসেই যাওয়া-আসা করেন।

তাহলে, দেহ বিক্রির সুযোগ কার বেশি? গার্মেন্টস মহিলা কর্মীর? নাকি, হলের মহিলা নেত্রীর?

‘কৃত্রিম মানব’ (!) তৈরীর সত্যাসত্য...’

বাংলাদেশের প্রথম সারির একটি পত্রিকার একটি চটুল শিরোনামে একবার আমার চোখ আটকে যায়। শিরোনামটি ছিলো দেশের একজন প্রথম সারির অভিনেতাকে নিয়ে (নামটা ঠিক মনে নাই)।
শিরোনাম ছিলো এমন , ‘অমুক আর নেই’....

খুবই আগ্রহ উদ্দীপক শিরোনাম। ইংরেজিতে ‘He is no more’ আর বাংলায় ‘তিনি আর নেই’ বাক্যদ্বয় দেখামাত্রই আমাদের মনে যা আসে তা হলো, – কেউ একজন ভবলীলা সাঙ্গ করে অনন্ত পথে পাড়ি জমিয়েছেন।
সেদিন আমারও ঠিক তাই মনে হলো। ধরেই নিয়েছিলাম যে, ভদ্রলোক হয়তো আর বেঁচে নেই। একে তো নামকরা পত্রিকা, তারউপর আবার এরকম চটুল শিরোনাম।
যাহোক, সাতপাঁচ না ভেবে ক্লিক করলাম পুরো নিউজটা পড়ার আশায়। মূল আর্টিকেলটা পড়ে আমি তাজ্জব বনে গেলাম। মূল আর্টিকেলে যা ছিলো তা হলো,- অই অভিনেতাকে একটা ছবিতে অভিনয়ের একপর্যায়ে ‘মারা যাবে’ এরকম দৃশ্যে দেখা যাবে......’
হোয়্যাট দ্য হেল!! পত্রিকার সম্পাদককে সেদিন হাতের কাছে যদি পেতাম, দুইটা থাপ্পড় দিয়ে জিজ্ঞেস করতাম সাংবাদিকতা কোথা থেকে শিখছে।
কিন্তু না। বাংলা পত্রিকা জগতে এরকম চটুল সংবাদ শিরোনামের দেখি রমরমা অবস্থা। ‘এ কি করলেন অমুক’ ‘এ কি দেখালেন তমুক’ এই টাইপের চটুল শিরোনামে ভর্তি পত্রিকাগুলো। দেখে এমন রাগ হয় যে সিরিয়াস সংবাদটাও আর এখন পড়তে ইচ্ছে হয়না। বাটপারি, দুই নাম্বারি আর জালিয়াতি যে বাঙালির রক্তে মিশে আছে, সেটার আরেকটা প্রমাণ এই পত্রিকাওয়ালারা....

যাহোক। আজকে যে কারণে এই লেখার অবতারণা তা হচ্ছে, গত ৪ তারিখে আমাদের ‘বিবিসি বাংলা’ একটি সংবাদ ছেপেছে।
সংবাদের শিরোনাম ‘ল্যাবরেটরিতে এই প্রথম তৈরি হলো কৃত্রিম জীবন’...
বরাবরের মতোই আগ্রহ উদ্দীপক শিরোনাম। এরকম শিরোনাম নিয়ে আমাদের মুক্তমনা মহলে একটা হৈচৈ পড়ে যায়। তারা ঈদের চাঁদ দেখার মতোই খুশিতে বাকবাকুম বাকবাকুম করতে থাকে। তারা বলে,- এই যে, বিজ্ঞানীরা কৃত্রিম প্রাণ তৈরি করে ফেলেছে। আল্লার কারিশমার দিন শ্যাষ!
এরকম একটা হৈচৈ বাঙাল মুক্তমনা মহলে ২০১০ সালে দেখেছিলাম। ক্রেইগ ভেন্টর নামের এক বিজ্ঞানী গবেষণাগারে জীবিত ছত্রাকের (Yeast নামক ছত্রাক) DNA থেকে কিছু অংশ নিয়ে, এরপর, একটি ব্যাকটেরিয়ার জিনোমকে কম্পিউটারের মাধ্যমে গবেষণাগারে সংশ্লেষণ করে,

পরে সেই অংশটুকু আরেকটি জীবিত ব্যাকটেরিয়ার ক্রোমোজমে প্রতিস্থাপিত করে। এরপর দেখা যায়, প্রতিস্থাপিত জিনোমটি ফাংশান করছে।
এই খবর মিডিয়ায় আসার পরে বাংলা মুক্তমনা মহল থেকে ঈদের আমেজ পাওয়া গিয়েছিলো সেবার। তারা দাবি করে বসলো, এইটা নাকি কৃত্রিম প্রাণ। প্রয়াত অভিজিৎ রায় তো মুক্তমনা ব্লগে তৎক্ষণাৎ একটি আর্টিকেলও লিখে ফেললো। শিরোনাম- 'মানুষের 'ইশ্বর' হয়ে উঠার গল্প'...
হাহাহা। বাংলা মুক্তমনা মহলকে আর পায় কে।

হালকা পাতলা বিজ্ঞান নিয়ে ধারণা আছে এমন যেকেউই বুঝতে পারবে যে, এটাকে কোনভাবেই কৃত্রিম প্রাণ বলা যাবে না। প্রথমত, এই কথিত কৃত্রিম প্রাণ তৈরি করতে যা যা উপাদান লেগেছে, তার সবটিই প্রাকৃতিক। যে DNA নিয়ে কাজ করেছে, সেটাও একটা জীবন্ত ছত্রাক থেকে ধার করা। এমনকি, সংশ্লেষিত সেই জিনোমকে প্রতিস্থাপিতও করা হয়েছে নতুন আরেকটি জীবন্ত ব্যাকটেরিয়াতে। এরফলে সেটা ফাংশান করে। যার সব উপাদানই প্রাকৃতিক, সেটা নাকি 'কৃত্রিম' প্রাণ? হাহাহা।
যাহোক, এটা নিয়ে দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক মুক্তমনা সম্প্রদায় কিছুদিন খুব নাচানাচি করে। পরে যেসব পত্র-পত্রিকা এবং সাইন্স ম্যাগাজিন এটাকে 'কৃত্রিম প্রাণ' দাবি করে আর্টিকেল লিখেছিলো, তারাই আবার এটাকে অস্বীকার করে, নিজেদের ভুল স্বীকার করে নেয়। কিন্তু এই ঘটনার পরে (মানে আসল কাহিনী সামনে আসার পরে) বাঙাল মুক্তমনাদের প্রতিক্রিয়া আর জানা যায় নি। তারা বরাবরই ধরা খাওয়ার পরে গর্তে ঢুকে পড়ে....

যাহোক, রিসেন্টলি, বিবিসি বাঙলা এরকম আরেকটি চটুল শিরোনামের সংবাদ ছেপেছে। বলছে, গবেষণাগারে তৈরি হলো কৃত্রিম প্রাণ। এবার এটা করেছে ক্যামব্রিজের একদল গবেষক।
আমি বেশকিছু জার্নাল,সাইন্স ম্যাগাজিন ঘাঁটাঘাঁটি করলাম , কিন্তু কোথাও দেখলাম না এই গবেষণাকে 'কৃত্রিম প্রাণ তৈরি' বলে দাবি করতে।
সাইন্স জার্নাল থেকে যা জানলাম তা হলো, ক্যামব্রিজের গবেষকেরা করেছে কি, একটা জীবিত ইঁদুরের ভ্রুণ কোষ নিয়ে, তার সাথে আরেকটি এক্সট্রা বাইরের কোষের মধ্যে জেনেটিক চেইঞ্জ ঘটিয়েছে। এই গবেষকদের যিনি প্রধান, তার নাম ম্যাগডালিনা জেনরিকা গোয়েৎস। ভদ্রমহিলা এই কাজের পরে বললেন, – "Both the embryonic and extra-embryonic cells start to talk to each other and become organised into a structure that looks like and behaves like an embryo,"
অর্থাৎ, জীবিত ইঁদুরের কোষ, এবং তার সাথে সংযুক্ত করা এক্সট্রা এম্ব্রায়োনিক কোষ মিলে স্বভাবজাত স্বাভাবিক এম্ব্রায়োনিক কোষের মতোই ফাংশান করছে।
উল্লেখ্য, এখানেও কিন্তু উপাদানগুলা প্রাকৃতিক।

বিবিসির সংবাদের শুরুতেই ঝুলিয়ে রেখেছে এরকম কথাবার্তা, যে- 'খুব শীঘ্রই কৃত্রিম উপায়ে মানুষের জন্ম দেওয়া সম্ভব হবে বলে বিজ্ঞানীরা আশা করছেন।'

হাহাহা। অথচ, এইটাকে কাভার করা কোন সাইন্স ম্যাগাজিনে আমি এরকম কথাবার্তার লেশমাত্র পেলাম না। উপরন্তু, ভদ্রমহিলা ম্যাগডালিনা জেনরিকা গোয়েৎস, যিনি এই পুরো গবেষণার হেড, তিনি যা বলেছেন তা হলো, “We are very optimistic that this will allow us to study key events of this critical stage of human development without actually having to work on embryos. Knowing how development normally occurs will allow us to understand why it so often goes wrong ”
তিনি বললেন যে, ‘এই গবেষণার পরে বিজ্ঞানীরা ভ্রুণপর্যায়ে হিউম্যান ডেভলপমেন্টের ক্রিটিক্যাল ষ্টেইজ সম্পর্কে আরো ভালোভাবে জানতে সাহায্য করবে। এও জানা যাবে যে, কেন মাঝে মাঝে অনেকে গর্ভপাতে অসফল হয়।’

এই হচ্ছে গবেষক দলের প্রধানের সারকথা। কোথাও একটিবারের জন্যও তিনি কিন্তু বলেন নি যে তাঁরা এই গবেষণার মাধ্যমে কৃত্রিম উপায়ে মানুষ তৈরি করতে পারবে।
আমাদের বিবিসি বাংলা এই উড়ো খবর যে কোথায় পায় আমি বুঝি না। সন্দেহ হচ্ছে, বিবিসি বাংলায় নিয়োজিত সাংবাদিকরা কি কোনসময় মুক্তমনা ব্লগে লেখালেখি করতো? অথবা, নিয়মিত মুক্তমনার পাঠক ছিলো? নইলে এরকম খবরের এরকম চটুল শিরোনাম আর আজগুবি কথা কিভাবে লেখে ওরা?
যাকগে, বিবিসি বাংলার এরকম চটুল শিরোনামের ‘কৃত্রিম মানুষ তৈরি’র সংবাদে আমরা যতোই মুচকি মুচকি হাসি না কেনো, বাংলার লেঞ্জাওয়ালা সম্প্রাদায়কে দেখলাম এটা ব্যাপকহারে শেয়ার করেছে, মাশা’আল্লাহ।

'বাংলাদেশের ঐতিহাসিক 'ক্যামেরা' বিজয়ের গল্প

গণভবন চত্বরে সকাল থেকেই উৎসব উৎসব আমেজ চলছে। দেশ-বিদেশ থেকে আকাশপথে উড়ে এসেছেন নামী দামী ব্যক্তিবর্গগণ। এসেছেন আমেরিকার বর্তমান প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা। সম্ভাব্য প্রেসিডেন্ট ডোলান্ড ট্রাম্প এবং হিলারি ক্লিনটন।
পৃথিবীর আনাচে-কানাচে চিপায়-চাপায় যতো নাম জানা না জানা সেলেব্রেটিরা লুকিয়ে আছে, তাদের সকলেই নিজেদের প্রাইভেসি 'অনলি মি' থেকে 'পাবলিক' করে দিয়ে ভোরের ফ্লাইটেই ধরেছেন ঢাকার পথ।
পৃথিবীর তাবৎ মিডিয়া কর্মীরা তাদের প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন ভোরেই।
কথা ছিলো সবার সামনে থাকবে বাংলাদেশি মিডিয়ার লোক। কিন্তু না। সেখানেও দাদাগিরি শুরু করেছে বন্ধুপ্রতীম দাদার দেশের মিডিয়া কর্মীরা। তারা বলছে,- 'ইয়ে বাঙলা হামারা আধীন মে। ইস ধারতি পে হামারা আধীকার জারা হ্যায়।'

ভারতের এক মিডিয়া কর্মীর মুখে এরকম কথা শুনে সাংবাদিক মুন্নী সাহা তার লম্বাটে মুখটাকে বাঙলা পাঁচের মতো করে বললো,- 'হুহ, ঢং দেখে বাঁচিনা। ভাবখানা এমন, যেন আমরা এখনই ভারতের অংশ হয়ে গেছি।'
এরচেয়ে বেশিকিছু উচ্চারণ করার সাহস মুন্নী সাহার নেই। সে জানে, সবার চোখ আর কানকে ফাঁকি দেওয়া গেলেও, ভারতের গোয়েন্দা বাহিনী 'র' কে ফাঁকি দেওয়া যায়না। একবার যদি তারা জানতে পারে যে মুন্নী সাহা ভারতের মিডিয়া কর্মীদের দিকে মুখ ভেঙচিয়েছে, তাহলেই হবে। পৃথিবীর বুক থেকে সেদিনই ইলিয়াস আলির মতো তার নামটাও গুম হয়ে যাবে।
মুন্নী সাহার পাশে বসে আছে আরেক সাংবাদিকা নবনীতা চৌধুরি। মুন্নী সাহা মনে মনে বললো,- 'কি জানি বাপু! নবনীতা হয়তো 'র' এর কোন বিশেষ গোয়েন্দাও হয়ে যেতে পারে। রিস্ক নেওয়া ঠিক হবে না।'
ভারতের মিডিয়া কর্মীদের কাছে খ্রেট খেয়ে এই মূহুর্তে মুন্নী সাহার মন ভেঙে চুরমার। তার মনে পড়ছে একটি বাঙলা গান,- 'বন্ধু তুমি, শত্রু তুমি.........'
হঠাৎ, নবনীতার স্পর্শে তার সম্বিৎ ফিরলো। সে দেখলো, নবনীতা তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। মুন্নী সাহা বললো,- 'কি হয়েছে? বলদ গরুর মতো দাঁড়িয়ে আছিস কেনো এভাবে?'
নবনীতা হাসি হাসি মুখে শরীর নাড়তে নাড়তে বললো,- 'মুন্নী দি,দেখো তো, লাল টিপে আমাকে কেমন মানিয়েছে?'

এমনিতেই মুন্নী সাহা এই মূহুর্তে মানসিক বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। তারউপর নবনীতার এমন আদিখ্যেতা দেখে রাগে একেবারে তার গা জ্বলতে শুরু করলো। মুন্নী সাহা দেখলো, নবনীতা তার কপালে একটি বিশাল সাইজের লাল টিপ দিয়েছে। গায়ে পরেছে ভারতের পতাকার রঙের সাথে ম্যাচ করা শাড়ি।

মুন্নী সাহা জিজ্ঞেস করলো,- 'সাংবাদিকতা করতে এসেছিস নাকি ফটোসেশান করতে এসেছিস এখানে?'

নবনীতার মুখাবয়বে এতক্ষণ টলোমলো করতে থাকা হাসিটা মূহুর্তেই ম্লান হয়ে গেলো। সে মুখ কালো করে বললো,- 'ইশ! ওপার বাঙলার কত্তো কিউট কিউট হ্যান্ডসাম সাংবাদিক দাদারা এসেছে আজকে। এমন দিনে একটু খাঁটি অসাম্প্রদায়িক সাজ না হলে কি হয়,বলো?' - এই বলে নবনীতা আবারো তার শরীরকে এপাশ-ওপাশ দুলাতে লাগলো।

মুন্নী সাহার ইচ্ছে করছে নবনীতাকে এক্ষুণি একটা রামচড় দিয়ে টিপের মতো তার গালটাকেও লাল করে দিতে। নেহাৎ সেও 'র' এর কোন বিশেষ সদস্য হয়ে যায় কিনা- এমন একটা ডাউট থেকেই নিজেকে এরকম কাজ থেকে সংবরণ করলো মুন্নী সাহা।

-

সভাস্থলে ইতোমধ্যেই পৌঁছে গেছেন বাংলার সকল মন্ত্রী,উপমন্ত্রী, আমলারা।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই সভায় প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেছেন। তার ঠিক পাশের সিটেই আছেন মহামতি নরেন্দ্র মোদি। তিনি আজ সার্ফ এক্সেল দিয়ে ধোঁয়া ধুতি পরে এসেছেন এখানে। ইতোমধ্যেই মোদি-হাসিনা একবার চোখাচোখি হয়ে গেছে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার হচ্ছে, সেই মূহুর্ত বেশিক্ষণ দীর্ঘ হোলো না। কারণ, ঠিক যেই মূহুর্তে তারা চোখাচোখি হয়েছে, সেই মূহুর্তেই পশ্চিমাকাশ থেকে বোঁ বোঁ শব্দ করতে করতে নেমে এলো একটি বিশাল সাইজের বিমান। বিমানটি ল্যান্ড করা মাত্রই একদল বিশেষ প্রশিক্ষিত সেনারা কমান্ড তুলে স্যালুট দিতে দিতে হেঁটে গিয়ে বিমানের দরজা উন্মুক্ত করে দিলো। তাবৎ পৃথিবী দেখলো, বিমানের ভেতর থেকে তিনজন মহাপুরুষ ধীর পায়ে নেমে এলেন।

এই দৃশ্য দেখে সভার এক কোণায় আর এফ এলের একটি ভাঙা চেয়ারে বসে থাকা বিখ্যাত কবি নির্মলেন্দু গুণ তার সেই বিখ্যাত কবিতা থেকে মনে মনে দু'টি লাইন আবৃত্তি করলেন। লাইনটি ছিলো,- 'রবীন্দ্রনাথের মতো দৃপ্ত পায়ে হেঁটে
অতঃপর কবিরা এসে – জনতার মঞ্চে দাঁড়ালেন।'

অবশেষে উপস্থিত সেই মাহেন্দ্রক্ষণ, যার জন্য এত আয়োজন, এত কৌতূহল, এত অপেক্ষা। সবাই দেখলো, এই তিনজন ব্যক্তি একটি ক্যামেরাকে খুব সযত্নে ধরে আছে। এমনভাবে ধরে আছে, যেন এটিকে ধরতে পারলেই জীবন ষোল আনায় পূর্ণ হয়ে যায়।

মিডিয়া কর্মীরা এই তিনজন লোক, এবং সেই ক্যামেরাটার ছবি তুলছে। কেউ কেউ এই ফাঁকে ক্যামেরাটিকে ফ্রন্টে রেখে সেলফিও তুলে নিচ্ছে। কারো কারো আপসোস! – ইশ! ক্যামেরাটা

যদি অটোগ্রাফ দিতে পারতো!'

ফটোসেশান পর্ব শেষ। এবার জার্মানি থেকে উদ্ধার করে আনা সেই বিশেষ ক্যামেরা এবং সেই তিনজন জাতীয় বীর মঞ্চে উঠে দাঁড়ালেন। তাদের মধ্যকার হ্যান্ডসাম, গুড লুক ওয়ালা বীরটা এগিয়ে এসে মাইক্রোফোন হাতে নিয়ে বললেন,- 'উপস্থিত জনতা! শান্ত হোন। মহামূল্যবাণ এই ক্যামেরাকে জার্মানি থেকে আমরা তিনজন গিয়ে উদ্ধার করে এনেছি। এটা আজ থেকে আমাদের জাতীয় সম্পদ। আমরা এক্ষুণি এই ক্যামেরার বিশেষ পার্টগুলোকে আপনাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেবো।'
বক্তার কথা শুনে সভাস্থলে তালির জোয়ার পড়ে গেলো। তিন মিনিট ধরে শুধু তালির মূহুর্মূহুর শব্দ ছাড়া আর কিছুই শোনা গেলো না।
এবার পেছন থেকে আরেকজন বীর সামনে এগিয়ে আসলেন। তিনি ক্যামেরাটি যেই মাত্র হাতে তুলে নিলেন, তৎক্ষণাৎ বিশাল জনতার দৃষ্টি গিয়ে পড়লো ক্যামেরাটির উপর। সবাই মনে মনে বলতে লাগলো,- 'আহা! এই সেই ক্যামেরা! এই টাই?'
মঞ্চে আসীন ব্যক্তি এবার আস্তে করে ক্যামেরাটির একটি পার্ট খুলে নিলেন। উপস্থিত জনতার মধ্যে তক্ষুণি কান্নার রোল পড়ে গেলো। সবাই সমস্বরে বলতে লাগলো,- 'না না না! এমন নিষ্ঠুর কাজ করবেন না, প্লিজ। ক্যামেরাটিকে এভাবে কষ্ট দিবেন না। '
কিন্তু ততক্ষণে যা হবার হয়ে গেছে। লোকটি ক্যামেরাটির একটি পার্ট খুলে নিয়ে সবার উদ্দেশ্যে বললেন– 'প্রাণ প্রিয় জনতা! এই যে, এইদিকে দেখুন। এইটা হচ্ছে এই ক্যামেরার CCD, মানে Charged-Coupled Device. এইটা দিয়ে ছবি রেকর্ড করা হয়।'
এই দৃশ্য যেন সবার মধ্যে একটা শিহরণ দিয়ে গেলো। সবাই জোরে জোরে হাত তালি দিয়ে জানালো যে, তারা এটা দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেছে।
এরপর তিনি বললেন,- 'এই যে দেখুন, এটা হচ্ছে এই ক্যামেরার লেন্স। এইটা দিয়ে ছবি তোলা হয়।'
সবাই আবার জোরে জোরে হাত তালি দিলো। আহা! এমন জিনিস পৃথিবীবাসী আগে কোনদিন দেখেছে কিনা নিশ্চই সন্দেহ আছে। নইলে, একটি ক্যামেরা আনতে তিনজন লোককে রাষ্ট্রীয় খরচায় জার্মানি কেউ পাঠায়?
মঞ্চের শেষ প্রান্তে এক বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই দৃশ্য দেখছিলেন। বৃদ্ধের পাশেই ছিলো মুন্নী সাহা। বেচারি থ্রেট খেয়ে আর সামনে এগুবার সাহস করেনি। সে বৃদ্ধ লোকটির দিকে ক্যামেরা তাক করে বললো,- 'কাণ্ড, এইরকম অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখে আপনার অনুভূতি কি?'
বৃদ্ধ হাসিমুখে মুন্নী সাহাকে সাকা চৌধুরির সেই বিখ্যাত বাণীটি শুনিয়ে দিলো....।

নোটঃ (জার্মানি থেকে একটি ক্যামেরা কিনে আনার জন্য আমাদের সরকার তিন তিনজন সরকারি কর্মকর্তাকে জার্মানি পাঠিয়েছেন। সেই খবরকে ভিত্তি করেই এই ছোট গল্পের অবতারনা)

'জাফর স্যার, আপনার চেতনা স্লো নাকি?'

জাকির নায়েক কে নিয়ে জাফর ইকবাল এরকম নির্লজ্জ মিথ্যাচার না করলেও পারতো।

জাফর ইকবাল গতকাল তার কলামে বলেছেন,- 'যখন কেউ নিজের ধর্মকে ব্যাখ্যা করার জন্য অন্য ধর্মকে উপহাস করতে থাকে সেটি পৃথিবীর জন্যে শুভ হতে পারে না।'
আমি জাফর ইকবালের কাছে জানতে চাই, জাকির নায়েক কখন, কোথায়, কোন লেকচারে অন্য ধর্ম নিয়ে উপহাস করেছেন? তিনি কি রেফারেন্সবিহীন, যুক্তিবিহীন কোন কথা কোনদিন কোন ধর্মের ব্যাপারে বলেছেন? আমি শুধু একটি প্রমান চাই।
জাফর ইকবাল আরো বলেছেন,- 'অন্য অনেক দেশের মতো জাকির নায়েককে বাংলাদেশেও নিষিদ্ধ করা হয়েছে।'
চরম মিথ্যাচার করেছেন জাফর ইকবাল।
উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবেই জাফর ইকবাল এটা করেছেন।
জাকির নায়েক বাংলাদেশে নিষিদ্ধ নয়। জাকির নায়েক 'অনেক' দেশে নিষিদ্ধ নন, তিনি কেবল ব্রিটেনেই নিষিদ্ধ। জাফর ইকবাল জেনে অত্যন্ত দুঃখিত হবে যে, কিছুদিন আগেই জাকির নায়েক চীন-মালেশিয়ায় কনফারেন্স করে এসেছেন। শুধু ২০১৫ সালেই তিনি মোট ১২ টা দেশে সমানভাবে ধর্ম প্রচার করেছেন।
পৃথিবীর এক তৃতীয়ভাগ মানুষ যে ভাষায় কথা বলে, সেই 'মান্দারিন' ভাষায় তার 'পিস টিভি' চালুর কাজ প্রায় সম্পন্ন।
জাফর ইকবাল তার সেই কলামে জাকির নায়েককে অন্য ধর্ম নিয়ে উপহাস (!) করার জন্য তিরস্কার করেছেন, অথচ অই একই কলামে তিনি শাহবাগি নাস্তিক রাজিব ওরফে থাবাবাবার জন্য তার সহানুভূতি উগরে দিয়েছেন।
জাকির নায়েক নিজ ধর্মকে ব্যাখ্যা করতে অন্য ধর্মকে উপহাস (!) করলে তা যদি পৃথিবীর জন্য শুভ না হয়, তাহলে আমি জাফর ইকবালের কাছে জানতে চাই, 'ধর্মকারি ব্লগ' 'মুক্তমনা ব্লগ' 'আমার ব্লগ' আর 'নূরানি চাপা' ব্লগে রাজিব ওরফে থাবাবাবা যে রাসূল (সাঃ) এবং উনার স্ত্রীদের নিয়ে অশ্লীল, কুৎসিত, জঘন্য নোংরা ভাষায় গালাগালি করতো,
ইসলামের বিভিন্ন বিষয়, ঈদ,কোরবান, ঢিলা-কুলুগ,হজ্ব,যাকাত নিয়ে উপহাস করতো, বিশ্রী, কদর্য ভাষায় গালাগালি করতো, তা পৃথিবীর জন্য ঠিক কতোখানি শুভ? জাফর ইকবাল কি উনার 'চেতনাফাইং' গ্লাস দিয়ে আমার কাছে এই ব্যাখ্যাটি পরিষ্কার করবেন,প্লিজ?

থাবা বাবার কিছু 'শুভ' কাজের নমুনাঃ

নমুনা ০১

এই হোলো জাফর স্যারের 'সিমপ্যাথি' পাওয়া কথিত দ্বিতীয়

মুক্তিযুদ্ধের শহীদ থাবা বাবার কিছু শুভ কাজের নমুনা যেগুলোর মাধ্যমে বেচারা দুনিয়াময় শান্তি বিতরন করেছেন। ধিক্কার জাফর ইকবালদের জন্য,যারা জাকির নায়েকের মত যুক্তি এবং প্রমান দিয়ে ধর্ম প্রচারকের কাজকে পৃথিবীর জন্য 'শুভ নয়' বললেও, কথায় কথায় রাজিব ওরফে থাবা বাবাদের মতো নিকৃষ্ট, গালিবাজ,অশ্লীলতা প্রচারকারিদের ডিফেন্ড
করে সবসময়। জাফর ইকবাল, এটাই কি আপনার সেই আসল 'নাস্তিক' রূপ?

জাফর ইকবাল বলেছেন, এই সময়টা তিনি বিদেশে কাটালেও, উনি 'ইন্টারনেট' এর মাধ্যমে দেশের পরিস্থিতির খবর ঠিকই রাখছেন।গুলশান হত্যাকান্ডে জঙ্গীরা যে নিয়মিতই জাকির নায়েকের লেকচার শুনতো, সে খবরও তিনি পেয়ে গেছেন।
জাফর ইকবালদের এরকম মিথ্যাচার আর দলান্ধতা দেখে এখন আর অবাক হইনা। জাফর ইকবাল বিদেশে বসে 'ইন্টারনেট' থেকে সব খবর নিতে পেরেছেন, অথচ, 'ডেইলি ষ্টার' যে জাকির নায়েককে নিয়ে মিথ্যা সংবাদ ছাপিয়ে পরে তা তুলে নিয়ে ভুল স্বীকার করেছে সে খবর জাফর ইকবালের 'ইন্টারনেট' এ এখনো পৌঁছেনি। ভারতের প্রথম শ্রেণীর পত্রিকা 'দ্য হিন্দু'র রিপোর্ট মতে, ভারতের গোয়েন্দারা যে জাকির নায়েকের লেকচারে কোন জঙ্গীবাদ,সন্ত্রাসবাদের ছিটেফোঁটাও পায়নি, সে খবরও জাফর ইকবাল এখনো তার 'ইন্টারনেট' এ পান নি।

গুলশান ঘটনার আজকে ১৫ দিন পার হচ্ছে। এতদিন পরে জাফর ইকবালের চেতনা জাগ্রত হয়েছে।উনি গুলশান হত্যাকান্ডে নিহত বিদেশিদের জন্য এতদিন পরে এত্তগুলা সিমপ্যাথি দেখিয়ে কলাম লিখেছেন।

উনার কাছে আমার শেষ প্রশ্ন,- 'জাফর স্যার, আপনার চেতনা স্লো নাকি?'

‘জানার আছে অনেক কিছু- ০৫/’

ফরেনসিক সাইন্সের জগতে ফিঙ্গারপ্রিন্টের যে কতোটা গুরুত্ব সেটা ব্যক্তি মাত্রই এবং এই ফিল্ডে নিয়োজিত সবাই খুব ভালোমতোই অনুধাবন করতে পারে। পৃথিবীর বুকে যতোটা পুলিশ এজেন্সি রয়েছে, তাদের প্রত্যেকের ‘Criminal History’ ফাউন্ডেশনের মূল বেইসিসটাই হচ্ছে এই ফিঙ্গারপ্রিন্ট।

ফিঙ্গারপ্রিন্টের ইতিহাসটি বেশ পুরোনো নয়। ১৮৭০ সালে ফ্রেঞ্চ এন্থ্রোপোলজিষ্ট Alphonse Bertillon অপরাধী সনাক্তকরণের একটা পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। পদ্ধতিটি ছিলো এরকম, – প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা ব্যক্তির শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের রেকর্ড সংগ্রহ করা এবং পরবর্তীতে প্রয়োজনে এই রেকর্ডগুলো মিলিয়ে ব্যক্তি সনাক্তকরণ। দীর্ঘ ৩০ বছর ফরেনসিক মহলে এই পদ্ধতি বেশ ভালোমতোই গৃহীত হয়। কিন্তু গোলমাল বাঁধে ১৯০৩ সালে। আমেরিকার ক্যানসাসের একটি কারাগারে Will West নামের এক লোককে Alphonse Bertillon এর উদ্ভাবিত পদ্ধতি অনুসরণ করে ক্রিমিনাল কেইসে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। এর কিছুদিন পরে তারা আবিষ্কার করে ঠিক Will West এর মতোই এক লোক কারাগারে রয়ে গেছে। Will West এর সাথে সেই লোকের এতোটাই মিল ছিলো যে কারাগারের সব লোক দিন দুপুরে ভূত দেখার মতোই চমকে গেলো।

কি ব্যাপার?

এই লোককে তো কিছুদিন আগে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিলো। তাহলে এই লোক আবার ফিরে আসলো কিভাবে? তারা কারাগারের ‘Criminal History’ চেক করলো। দেখলো, এই লোকের নাম Will West নয়, William West. কিন্তু Alphonse Bertillon কর্তৃক উদ্ভাবিত পদ্ধতি মতে রেকর্ডকৃত, মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত ব্যক্তি Will West এর সকল শারীরিক তথ্য এবং William West এর রেকর্ড করা সকল শারীরিক তথ্য শুধুই এক নয়, হুবহু এক। এরকম আশ্চর্যজনক ঘটনা দেখে সবাই খুব অবাক হয়ে গেলো। কিন্তু, কেবলমাত্র একটা জিনিস দেখে বুঝা গেলো যে Will West এবং William West একক কোন ব্যক্তি নয়, আলাদা আলাদা ব্যক্তি। যা দেখে বুঝা গেলো সেটা হলো ফিঙ্গারপ্রিন্ট। এরপর থেকেই ফরেনসিক সাইন্সে শরীরের অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গের রেকর্ডকৃত এভিডেন্সের চেয়ে ফিঙ্গারপ্রিন্টের প্রায়োরিটি অনেক অনেক বেশি। পৃথিবীতে বিলিয়ন বিলিয়ন মানুষ বাস করে। কিন্তু, একজন ব্যক্তির আঙুলের ছাপ (ফিঙ্গারপ্রিন্ট) কখনোই অন্য আরেকজনের সাথে ম্যাচ হয় না।
আধুনিক বিজ্ঞানের সুবর্ণ সময়ে বসেও বাঙালীদের যখন ভোটার আইডি কার্ডের জন্য এবং সিম রেজিষ্ট্রেশানের জন্য ফিঙ্গারপ্রিন্ট দেওয়া লাগে, তখন নিশ্চই এর প্রয়োজনীয়তা এবং

অথেনটিসিটি নিয়ে প্রশ্ন থাকার কথা না।
পৃথিবীতে ক্রিমিনাল সনাক্তকরণের সবচে যুগান্তকারী পদ্ধতিই হলো এই ফিঙ্গারপ্রিন্ট।

এইবার সূরা ক্বিয়ামাহ থেকে নিচের দুটি আয়াত দেখি।

‘Does man think that We will not assemble his bones?’
[মানুষ কি মনে করে যে, আমি তার হাড়গুলোকে একত্রিত করতে পারব না?] ‘Yes. [We are] Able [even] to proportion his fingertips.’
[অবশ্যই আমি (আল্লাহ) তাদের আঙুলের ডগা (ফিঙ্গারপ্রিন্টের অংশ) পর্যন্ত বানিয়ে দিতে সক্ষম]

– Al Qiyamah 3-4

আয়াত দুটিতে দুটি সুক্ষ্ম ব্যাপার লক্ষ্যণীয়। প্রথমত, খেয়াল করলে বুঝা যায়, এই আয়াতের লক্ষ্য সেই সব মানুষ, যারা অবাধ্য, পাপী, অবিশ্বাসী। অর্থাৎ, আল্লাহর হুকুম আহকাম না মেনে যারা (আল্লাহর বিধানমতে) অপরাধী, ক্রিমিনাল। কারন, এর পরের আয়াতেই বলা আছে মানুষের পাপের কথা। বলা হচ্ছে– ‘But man desires to continue in sin’
[কিন্তু মানুষ তার আগামী দিনগুলোতেও পাপাচার করে যেতে চায়]

তাহলে এই আয়াতের টার্গেট অডিয়েন্স বুঝা যাচ্ছে তারাই, যারা বিশ্বাস করতে চায়না যে মৃত্যুর পরে শরীর মাটির সাথে মিশে যাওয়ার পরে আল্লাহ তাদের আবার (পরকালে) জীবিত করতে সক্ষম। শরীয়াহর দৃষ্টিকোণ থেকে এরা হচ্ছে ক্রিমিনাল ক্যাটাগরির লোক।

এবার দেখুন, এই ক্রিমিনালদের চিহ্নিত করার জন্য আল্লাহ উপমা দিয়ে ঠিক কিসের উদাহরণ টানলেন?
আল্লাহ বললেন, – তারা মনে করছে আমি তাদের মিশে যাওয়া হাঁড়গুলো একত্র করতে পারবো না? বস্তুত, আমি তাদের আঙুলের ডগা (জনে জনে চিহিত করার জন্য) পর্যন্ত তৈরি করতে সক্ষম।’
অর্থাৎ, ফাঁকি দেওয়ার কোন চান্সই নেই।

দুনিয়াতে ক্রিমিনাল ধরার সর্বোৎকৃষ্ট পদ্ধতির উপমাটি ব্যবহার করেই আল্লাহ বুঝালেন যে অপরাধ করে ফাঁকি দিয়ে পার পেয়ে যাওয়ার কোন সুযোগ নাই।
কথা হলো, ১৮৭০ সালে দিকে আবিষ্কৃত ফরেনসিক সাইন্সের এই জিনিস ১৪০০ বছর আগে মুহাম্মদ (সাঃ) মরুভূমির বালুতে ঠিক কোথা থেকে পেলেন?

‘কোরআন এবং বিজ্ঞান- দ্বন্ধ না সামঞ্জস্য?’

কোরআনে সূর্য, সূর্যের উদয়স্থল এবং সূর্যের অস্তাচল নিয়ে বিভিন্ন আয়াত আছে। এগুলোর কোনটি একবচনে, কোনটি দ্বি-বচনে আবার কোনটি বহু-বচনে ব্যবহৃত হয়েছে।তাই কোরআন বুঝতে হলে আরবি ব্যাকারণ বুঝা জরুরি।
যাহোক, প্রথমে আমরা সূরা 'আর রহমান' এর ১৭ নং আয়াত দেখবো।
আয়াতটি হলো- 'রাব্বুল মাশরিকাঈনি ওয়া রাব্বুল মাগরিবাঈন'
'[He is] Lord of the (place of) two/
double (Star/Sun) risings and Lord of the
(place of) two/double (Star/Sun) settings'।
অর্থ- ['তিনিই (আল্লাহ) দুই উদয়াচল আর দুই অস্তাচলের মালিক'।]
এখানে 'উদয়াচল' এবং 'অস্তাচল' হচ্ছে সূর্য/নক্ষত্রের উদিত হবার এবং অস্ত যাবার স্থান।
উক্ত আয়াতে ব্যবহৃত 'মাশরিকাঈন' আর 'মাগরিবাঈন' শব্দদ্বয় দারুন অর্থব্যঞ্জক।
আরবি ব্যাকরণে 'মাশরিক' এবং 'মাগরিব' ব্যবহৃত হয় এক বচনের ক্ষেত্রে।
'মাশরিকাঈন' এবং 'মাগরিবাঈন' ব্যবহৃত হয় 'দ্বি-বচন/ দুই বচনের (Dual Form) ক্ষেত্রে। (১)
এবং, 'মাশরিকি' আর 'মাগরিবি' ব্যবহৃত হয় বহু বচনের জন্য (দুইয়ের অধিক)।(২)
সুতরাং, উক্ত আয়াত অনুযায়ী আল্লাহ সুবাহান ওয়া'তালা বলছেন যে, 'তিনি দুই উদয়াচল আর দুই অস্তাচলের মালিক'।
আপনি কি মনে করেন এখানে স্পেশেফিকলি 'দুই উদয়াচল' আর 'দুই অস্তাচল' শব্দের ব্যবহার নিছক কাকতালীয়?
নাহহহ!! নিশ্চয় তার রয়েছে গূঢ় রহস্য। কি সেই রহস্য? আসছি একটু পরে...
তার আগে বলে নিই, অনেকেই সূরা আর-রহমানের এই আয়াতের 'দুই অস্তাচল' আর 'দুই উদয়াচল' দিয়ে পৃথিবীর সূর্যকে বোঝান।
কিন্তু এটা কোনমতেই সম্ভব না।
প্রথমত, একসাথে দুইটি উদয় আর দুইটি অস্তের জন্য দরকার আলাদা আলাদা দুটি সূর্যের।
কিন্তু আমাদের পৃথিবীর আছে কেবল একটি সূর্য এবং সেটাকে কেন্দ্র করেই পৃথিবী ঘোরে।
দ্বিতীয়ত, উক্ত আয়াতের 'মাশরিকাঈন' এবং 'মাগরিবাঈন' শব্দের সাথে 'শামসু' (সূর্য) শব্দ নেই।
কিন্তু অন্যান্য অনেক স্থানে আল্লাহ 'মাশরিক' এবং 'মাগরিব' শব্দের সাথে 'শামসু' শব্দ ব্যবহার

করেছেন।

সুতরাং, যেখানে 'মাশরিক' এবং 'মাগরিব' শব্দের সাথে 'শামসু' শব্দ কানেক্টেড, সেটাকে আমরা অবশ্যই এটাকে পৃথিবীর সূর্য বলে ধরে নেবো।

কিন্তু যেখানে সরাসরি 'শামসু' শব্দের উল্লেখ নেই, আমাদের সেসব নিয়ে গভীর চিন্তা করতে হবে।

এখন আমাদের দেখতে হবে, আদতে দুইটা সূর্যওয়ালা কোন গ্রহ মহাবিশ্বে আছে কি? যেখানে একদিনে দুবার সূর্যোদয় এবং দুবার সূর্যাস্ত হয়।

'

২০১১ সালে বিজ্ঞানী সংস্থা 'NASA' তাদের এক গবেষণায় একটি নতুন গ্রহ আবিষ্কার করেছে।

দূরবীক্ষণ যন্ত্র 'কেপলার' এর সহায়তায় এই গ্রহটি আবিষ্কৃত হওয়ায় তারা গ্রহটির নাম দিয়েছে 'কেপলার ১৬ বি'। গ্রহটির অবস্থান আমাদের গ্রহ থেকে ২০০ আলোকবর্ষ দূরে। অবাক করা বিষয় হলো, এই 'কেপলার ১৬ বি' গ্রহে বিজ্ঞানীরা সূর্যের মত দুটি নক্ষত্রের অবস্থান নির্ণয় করেছেন। (৩)

Luke Skywalker এর সাইন্স ফিকশান অনুযায়ী নির্মিত একটি মুভি 'Star Wars' এ এরকম একটি গ্রহের কথা আছে।

মুভিটিতে একটি গ্রহের কথা বলা হয়েছে যে গ্রহের সূর্য দুইটা।

Luke Skywalker এটার নাম দিয়েছিলেন 'Tatooine'। তাই, বিজ্ঞানিরা এই গ্রহকে 'Totooine-like plannet' নামেও উল্লেখ করে থাকেন।

'কেপলার ১৬ বি' গ্রহের সূর্য দুটির একটি লাল বর্ণের এবং অন্যটি হলুদ।

কখনো হলুদ বর্ণের সূর্যটি আগে উদিত হয়, কখনো লাল বর্ণের সূর্যটি। তাই স্বভাবতই এখানে একদিনে 'দুটি সূর্যোদয়' এবং 'দুটি সূর্যাস্ত' ঘটে থাকে।

এবার সূরা আর-রহমানের অই আয়াতের সাথে মিলিয়ে নিন- 'তিনিই (আল্লাহ) দুই উদয়াচল আর দুই অস্তাচলের মালিক'।

ভাবুন, NASA এটা আমাদের জানালো ২০১১ সালে। আজ থেকে কতোশতো বছর আগে আল-কোরআন এটা নিয়ে ইঙ্গিত দিয়ে রেখেছে। সুবাহান-আল্লাহ!!

'

কোরআন কি শুধুমাত্র দুইটা সূর্যের উদয়-অস্ত নিয়ে কথা বলেছে? না।

কোরআন অনেক জায়গায় সূর্যের মত এরকম নক্ষত্রের 'বহু উদয়' আর 'বহু অস্তাচলের' সংখ্যা নিয়ে কথা বলেছে। সংখ্যাটা কতো হতে পারে? অনির্দিষ্ট।

এটা হতে পারে ২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯.......

মানে, এমনও হতে পারে যে, এমন কোন গ্রহ আবিষ্কার হতে পারে যার সূর্য ৫ টা। সেখানে একদিনে ৫ বার সূর্যোদয় আর ৫ বার সূর্যাস্ত হয়।

এটা সম্ভব। যেহেতু আমরা দুটো সূর্যওয়ালা গ্রহ (কেপলার ১৬ বি) ইতোমধ্যে পেয়ে গেছি, এটাও অসম্ভব নয়।
কোরআন কি বলে দেখি। কোরআন বলছে, -
' তিনি আসমান সমূহ, পৃথিবী ও এ' দুয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর পালনকর্তা এবং পালনকর্তা বহু (নক্ষত্র/সূর্য) উদয়েরও (স্থানেরও)।- (সূরা আস-সাফফাত ০৫)
'(He is) Lord of the heavens and the earth
and that between them and Lord of the
multiple (Star/Sun) risings'..
এখানে ব্যবহৃত 'মাশরিকি' শব্দটি একটি বহু বচন।
এটা দু'য়ের অধিক থেকে শুরু করে অনেক হতে পারে। হতে পারে ৩,৪,৫,৬,৭,৮...........
আল্লাহ বলছেন, তিনি 'বহু' উদয়ের মালিক।
মানে, যেখানে একসাথে বহু সূর্যের উদয় ঘটে। কোথায় ঘটে? মহাবিশ্বের কোথাও না কোথাও। আরেকটি আয়াত-
'আমি শপথ করছি বহু (নক্ষত্র/সূর্য) উদয়ের (স্থানের) এবং বহু (নক্ষত্র/সূর্য) অস্তগমনের (স্থানের) পালন-কর্তার। নিশ্চয়ই আমরা সক্ষম'- (আল মা'আরিজ- ৪০)

' [So, I swear by the Lord of the (place
of) multiple (Star/Sun) risings and the (place of) multiple (Star/Sun) settings, that indeed We are able'..

এখানে, একই সাথে বহু/দুই এর অধিক উদয়ের (মাশরিকি) এবং বহু অস্তের (মাগরিবি) কথা বলা হয়েছে।
অর্থাৎ, এমন কিছু যেখানে একই সাথে একই দিনে বহু সূর্যোদয় ঘটে আর বহু সূর্যাস্ত ঘটে।
অবাক করা ব্যাপার কি জানেন? এই মাত্র কিছুদিন আগে, বিজ্ঞানীরা আরো একটি গ্রহ আবিষ্কার করেছে যেখানে তিনটি সূর্য/নক্ষত্রের অবস্থান নির্ণয় করা গেছে।
অর্থাৎ, সেই গ্রহে একদিনে একই সাথে তিনটি সূর্য/নক্ষত্রের উদয় এবং অস্তগমন ঘটে।
আরো ক্লিয়ারলি, গ্রহটি একসাথে একইদিনে সূর্যের মত তিনটি গ্রহকে প্রদক্ষিন করে আসে।
আর অই গ্রহে মাত্র সাড়ে তিন দিনে একবছর হয়।
গ্রহটি আমাদের পৃথিবী থেকে ১৪৯ আলোকবর্ষ দূরে। বিজ্ঞানিরা এই গ্রহের নাম দিয়েছে 'HD 188753'। (৪)
'
সুবিশাল মহাকাশের সিকি ভাগ রহস্যও বিজ্ঞান এখনো ভেদ করতে পারেনি।
এরই মধ্যে আমরা দুটি সূর্যওয়ালা গ্রহ এবং তিনটি সূর্যওয়ালা গ্রহের সন্ধান পেয়ে গেলাম যার উল্লেখ কোরআন বহু শতাব্দী আগে করে রেখেছে।

অবিশ্বাসীদের কাছে কোরআনের সত্যতা প্রমানে এসব যদি যথেষ্ট না হয়,
তারা যদি এসব দেখেও না দেখে, বুঝেও না বুঝে,
তাহলে আল্লাহর কিতাবের সেই বাক্যগুলির পুনঃপাঠ করে বলতে হয়-
'ওরা বোবা, বধির, অন্ধ। ওরা ন্যায়ের পথে ফিরে আসবেনা'- আল বাকারা ১৮।

রেফারেন্সঃ-

১) কোরানের শব্দকোষ। 'মাশরিকি' এবং 'মাগরিবি' শব্দের এ্যারাবিক গ্রামারের রূপ-
http://corpus.quran.com/qurandictionary.jsp?q=$rq#%2837:5:7%29
এবং- http://corpus.quran.com/wordbyword.jsp?chapter=37&verse=5#%2837:5:1%29

২) কোরানের শব্দকোষ। 'মাশরিকাঈন' এর এ্যারাবিক গ্রামাটিক্যাল রূপ-
http://corpus.quran.com/qurandictionary.jsp?q=$rq#%2837:5:7%29

৩) দুইটি সূর্যওয়ালা গ্রহ 'কেপলার ১৬ বি' নিয়ে বিখ্যাত সাইন্স পেপার 'দি টেক' এর রিপোর্ট- http://tech.mit.edu/V131/N37/kepler16b.html

সাইন্স নিউজের রিপোর্ট- https://www.sciencenews.org/article/kepler-16b-shadows-come-pairs

'দ্যা হিন্দু' পত্রিকার রিপোর্ট - http://www.thehindu.com/todays-paper/tp-international/article2460806.ece

৪) তিনটি সূর্য/নক্ষত্র ওয়ালা গ্রহ 'HD 188753' নিয়ে 'স্পেস ডট কম' পত্রিকার রিপোর্ট-
http://www.space.com/1311-triple-sunset-planet-discovered-3-star-system.html

'সাইন্স ডেইলি'র
রিপোর্ট- http://www.sciencedaily.com/releases/2005/07/050715222557.htm

কবিতা

কর্পোরেট ইশ্বরের পূঁজো

হে উপমহাদেশীয় দেবতা-
ভারত মহাসাগর চীন সাগর আর
পদ্মা মেঘনা যমুনার কোলজুড়ে
প্রসারিত বিস্তৃত সম্প্রসারিত
হে আঞ্চলিক ভূ-রাজনৈতিক ইশ্বর-
ইংরেজদের প্রেতাত্মাবাহী
দিল্লীর মসনদে সমাসীন
হে উপমহাদেশীয় মুনি-ঋষী-
আমি সিকিম থেকে বলছি
আমি কাশ্মীর থেকে বলছি
আমি হায়দ্রাবাদ থেকে বলছি
বলছি নেপাল আর বাংলাদেশ থেকে-
সিকিম আর হায়দ্রাবাদ ভক্ষণ করে
আপনার ক্ষুধা নিবৃত হয়নি, জানি
ইশ্বররুপী বণিকের ক্ষুধা
নিবারণযোগ্য নয় - তা ও মানি
তাই আপনার পূঁজোর বেদিতে
থরে থরে সাজিয়ে রেখেছি সব;
এই দ্যাখুন -
এখানে সুন্দরবন আছে
জীব বৈচিত্র্যের বাতিঘর এই ম্যানগ্রোভ বন
আপাতত আপনার সাম্রাজ্যভুক্ত নয়;
তাই, আপনি চাইলেই আপনার সম্প্রসারণমান
পুঁজিবাদী আধিপত্য স্থাপন করতে
গিলে নিতে পারেন এই বনটিকে;
আপনার পুঁজোর জন্য প্রাণ চাই

রক্ত চাই
মানবের বলিদান ছাড়া জগতে
আধিপত্যবাদী কোন ইশ্বরের পুঁজো হয়?
পশ্চিমা ইশ্বরের পূঁজোর জন্য যেমন
প্রতিনিয়ত বলি হচ্ছে আফগান ফিলিস্তিন
আর সিরিয় আবাল বৃদ্ধ বনিতা;
আপনার পূঁজোর জন্যও
সীমান্তে আমরা বুক পেতে বসে থাকি
হে কর্পোরেট ইশ্বর;
আপনি আমাদের রক্ত চুষে নিন
তারপর প্রাণহীন দেহ কাঁটাতারে ঝুলিয়ে দিন
যেমন করে ঝুলিয়ে দিয়েছেন ফেলানিকে;
সীমান্তে আপনাকে চোখ রাঙানোর
আর কেউ নেই
বিডিআর? সে তো ইতোমধ্যেই মরে কুটে হয়েছে নপুংশক;
আমাদের নদীপথে বাঁধ দিয়ে
ওগুলোকে শীর্ণ করে দিন
নিন ট্রানজিট, গিলে খান
পদ্মা-মেঘনা-যমুনা
পাঠ্যবইয়ের পাতায় পাতায়
ঢুকিয়ে দিন আপনার
শ্রেষ্ঠত্বের কল্পকাহিনী
তব পুঁজোর মন্ত্র
আমাদের মাথাগুলো কিনে নিন
মগজে বুনে দিন
দালালি আর দাসত্বের বীজ-
মেরুদণ্ডহীন বুদ্ধিজীবীদের আপাতত
আপনার 'পদ্মভূষণ' দিয়ে শান্ত করুন;
তবু, পুঁজিবাদের হে রঙীন ইশ্বর-
আপনি তৃপ্ত হোন
আপনার ক্ষুধা নিবৃত হোক
নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হোক আপনার আধিপত্যের পুঁজো;

ললুব্ধ ক্ষুধায় কাতর হে নৈর্ব্যক্তিক ঈশ্বর–
আপনার উদরপূর্তির তরে
গিলে খাচ্ছেন আমাদের মাঠ
আমাদের ব্যাংক
আমাদের রাজনীতি অর্থনীতি
সমাজনীতি আর মূল্যবোধ যেটুকু ছিল;
ক্রমশঃ গলাধঃকরণ করছেন
আমাদের সংস্কৃতি
আমাদের ধর্ম;
এরপর এক কোটি দু কোটি তিন কোটি করে
ষোলকোটি সবাইকে হজম করে ফেলুন
আমরা আপনার পুঁজোর জন্য উৎসর্গিত
এ আমাদের কৃতজ্ঞতার নিদর্শন।
পৃথিবীর বুকে আমরা
বড়োই কৃতজ্ঞ জাতি যে;
আপনি আমাদের ধন্য করুন
হে ভারতমাতা;

বিদগ্ধ সময়

নিয়তির মানদন্ড আমাকে বড্ড
একা করে দিয়েছে
কর্পোরেট দুনিয়ায় সবকিছু যখন
অর্থের পেছনে মোহগ্রস্ত
যখন নিলামে উঠছিলো ভিঞ্চির
মোনালিসা
বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠদান কক্ষে
যখন গোগ্রাসে গিলা হচ্ছিলো
দস্তয়ভস্কি টলষ্টয় আর
শেক্সপিয়ারকে
শিল্প আর সাহিত্যকে
প্রেম আর কামকে যখন
মাপা হচ্ছিলো পুঁজিবাদের
বাটখারা দিয়ে-
তখনও পৃথিবীর কোন এক প্রান্তে
আমি চাষাবাদ করেছি নিখাদ সবুজের
কপটতাহীন এক সভ্যতার বুননে
আমি রচনা করে গেছি
বিশুদ্ধ প্রেম আর কাব্যের;
বিষাক্ত বাতায়নে যুক্ত করেছি
পরিশুদ্ধ বায়ু
আমার লোকালয়ে বিশ্রাম নিয়েছিলো
পথ যাত্রায় ক্লান্ত হওয়া
কতো পথিক
এক গর্ভবতী হরিণী
আমার উপত্যকায় প্রসব করেছিলো
তার অনাগত ভবিষ্যৎকে
কতো যুদ্ধাহত বীর আশ্রয় নিয়েছিলো

আমার নিরাপদ ঢেরায়;
স্রোতের বীপরিতে গিয়ে
আমি এই অভয়ারণ্য তৈরি করেছিলাম
আমাদের জন্যে;
ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস দ্যাখো–
যান্ত্রিক জীবনের যান্ত্রিকতায় মিশে
তুমিও আজ রোবট সদৃশ এক নারী
যার কাম আছে
জৈবিক চাহিদা আছে
প্রেম নেই;
কিন্তু আমার প্রেম চাই
আমার সমস্ত সত্বা
সমস্ত সৃষ্টির বিনিময়ে হলেও;
নক্ষত্রদের সংঘর্ষে নিক্ষিপ্ত উল্কার দহনে
বিদগ্ধ হয়েছি কতো রাত;
অথচ, চাইলেই তুমি আমার আকাশের
একটি শ্রাবণ সন্ধ্যা হতে পারতে
কিংবা, জ্যোস্না প্লাবিত একটি রাত
আমার শহরের;

মা

প্রসব বেদনা বড় কষ্টের, তবু মা'য় করে চুপ
নাড়িছেড়া ধন নয়ন মেলিবে ফুটফুটে চাঁদমুখ;
শত অপেক্ষার অবসানে আজ হাসবে আবার ধরা
বহুদিন পর ঘুচবে মায়ের বন্ধ্যাত্বের খরা;
জন্মের পর প্রথম মা'য়ে নিল তার কোলে তুলি
কতনা সোহাগে জড়িয়ে ধরেছিল প্রসব বেদনা ভুলি;
জাদু আমার, মানিক আমার মিষ্টি গোলাপ ফুল
কতনা উপমায় ডেকেছিল মা'য় নেই তার কোন কূল;
সর্বদা মা'য়ে রাখত খেয়াল যদি অঘটন কিছু হয়
কি করে নিজেকে সামলাবে মা'য়ে এই ছিল তার ভয়;
বর্ষার জলে পেছনের খাল হত টইটুম্বুর
চিন্তায় মা'য়ের ঘুম হতনা, ভাবত রাতদুপুর;
খোদা না করুক,যদি কোনভাবে, খোকা যায় জলে পড়ে
সাঁতরায়ে সে কি পারবে বাঁচতে?সাধ্যি কি কূল ধরে;
গ্রীষ্মের সেই কাঠফাঁটা রোদে হতে দিতনা বাহির
শুনাতো মা'য়ে শিয়রে শুয়ায়ে কত জ্ঞান করত জাহির;
রৌদ্রের তাপে চুল পড়ে যায়,চামড়া যায় রোদে খসে
তার চেয়ে ভাল,ঘরে বসে খোকা,খেলে যাও অনায়েসে;
কৈশোরেও মায়ের দিব্যি খেয়াল,দিব্যি যত্ন ঢের
এই বুঝি খোকা না খেয়ে পালালো,মাঠ পানে হল বের;
পাড়ার মাঠে ফুটবল খেলে রোজ ভাঙ্গিতাম পা
সেই ভাঙ্গা পায়ে রাত্তিরে বসে মলম লাগাত মা;
শাসাত মা'য়ে,- আর যদি দেখি গেছ ওই পোড়া মাঠে
কাল থেকে তোমার দরোজা বন্ধ,থাকো তুমি পথে ঘাটে;
আমি কি ডরাতাম মায়ের বকুনি?তবু খেলতাম ফাল
রাত্তিরে মা'য়ে করত মালিশ আর দিত গালাগাল;
নাওয়া–খাওয়া নিয়ে কত অভিযোগ দিত মা'য় বাবার কানে
সব শুনে বাবা মুচকি হাসত, চেয়ে মোর মুখ পানে;

মা'র খোকা আর ছোট ছিলনা, যুবক হয়েছে সে
খুশিতে মায়ের বুক ভরে যায়, সে গর্বিত মা যে;
ছেলে তার এখন দিব্যি বড়,চুকিয়েছে সব পাঠ
ঘরের ছেলে ফিরবে ঘরে,দাপাবে মাঠ ঘাট;
কত স্বপ্ন মায়ের দু'চোখ জুড়ে,সময় ফারাক শুধু
ঘোমটা মুখে লাল টুকটুকে আসবে পুত্রবধূ;
এখানেই শেষ নয়–
রোজ চিঠি লিখে বলত মা'য়ে,- 'খোকা,বাড়ি এলে কি হয়?'
চিঠির উত্তরে দেখাতাম আমি এটা ওটা অজুহাত
অভিমানী মা'য় বলত আমায়,- 'মা হওয়াই অপরাধ'
বহুদিন মা'য়ে লিখেনা চিঠি,নেয় না খোঁজখবর
অজানা কোন এক ভয় এসে হায় ঘিরে বসে অন্তর;
আচমকা এক চিঠি হাতে আসে বাবার নামের পরে
লিখেছে বাবা,- 'খোকা রে তুই, জলদি ফির আয় ঘরে;
যেদিন আমি বাড়ি ফিরেছিলাম, সেদিন চৈত্রমাস
উঠোনের কোণে একদল লোকে কাটছিল কাঁচা বাঁশ;
আর একপাশে চাচী–জেঠি মিলে কাঁদছে বিলাপ সুরে
'বড় ভাল ছিল, খোদা যেন তারে বেহেস্ত নসীব করে' ;
মুচড়ে উঠল মন–
কি হল এখানে? বুঝিনা কিছুই, কেন এই আয়োজন?
দেয়ালের সাথে হেলান দিয়ে বাবা দাঁড়িয়ে ঠাঁয়
প্রাণটা আছে,নি:শ্বাসও আছে, তবু যেন তিনি নাই;
ঘরের পানেতে তাকাতেই যেন বজ্র পড়ল গায়
ঘরের মেঝেতে উত্তর–দক্ষিনে শুয়ে আছে মোর মা'য়;
নরম কাপড়ে মায়ের মুখখানি রাখা হয়েছিল ঢাকা
সেটি দেখে আমি মূর্ছা গেলাম,যায়নি দাঁড়িয়ে থাকা;
প্রায়ই মা বলত,- 'থাকতে পারবি মাকে তুই না দেখে?
যদি চলে যাই না ফেরার দেশে,তোকে আমি একা রেখে?
সত্যি সত্যিই চলে গেল মা'য়, না ফেরার সেই দেশে
কেউ আর বলেনা,- 'আয় খোকা খাবি' একটুখানি হেসে;
মায়ের স্মৃতি রেখেছি বুকেতে আদর যত্নে বাঁধি
মা'র কথা রোজ মনে করে আমি আজো সিজদাতে কাঁদি;
নিশুতি রাতে ঝরঝর করে অশ্রু ফোয়ারা ঝরে
মাগো! কি করে বোঝাবো, প্রতি মূহুর্তে তোমাকেই মনে পড়ে;

ঠোঁটকাটা

দেওয়ার কথা অভয় তোমায়,নিরাপত্তার আস্তালয়
তার বদলে রাষ্ট্র কেবল দিচ্ছে তোমায় মরার ভয়;
স্বাধীনতার স্বাধীন বুলি সংবিধানে ছাপলো অই
স্বাধীনভাবে কথা বলার স্বাধীনতা থাকলো কই?
মরলে মরুক না খেয়ে আর দেশটা তবে চুলোয় যাক
মুচকি হেসে রাষ্ট্র বলে,- ৫৭ তে বন্দী থাক;
দিন-দুপুরে ঘটেও যদি রাষ্ট্রীয় সব ব্যাংক লোপাট
চুপটি থেকো সামলে রেখো তোমার ঘরের দোর-কপাট;
তোমার টাকায় খাচ্ছে পুলিশ, বিজিবিরা মানছে পোষ
তোমার কেন চাকরি পেতে লক্ষ টাকার লাগছে ঘুষ?
তোমার ট্যাক্সে রাষ্ট্র চলে,অর্থনীতির বাঁক ঘুরে
শেয়ার বাজার কেলাঙ্কারিই কেন তোমার ঘর পুড়ে?
তোমার শ্রমে দেশ চলে ভাই,তা কি গো আর যায় মাপা?
রানা প্লাজার ইটের নিচে তুমিই কেন রও চাপা?
তুমিই যখন জাতি গড়ার দায়িত্বটি নাও কাঁধে
তোমার শ্রমের মূল্য দিতে রাষ্ট্রের এত কি বাধে?
রাষ্ট্র তোমায় বাধ্য দিতে শিক্ষা লাভের সব উপায়
কোন সাহসে রাষ্ট্র তোমার শিক্ষার উপর ভ্যাট বসায়?
ঘাম ঝরানো তোমার টাকা রাষ্ট্রকে ভাই দিচ্ছ রোজ
নিচ্ছ খবর? তোমার টাকায় সংসদে হয় মন্ত্রী-ভোজ;
মন্ত্রী বছর ঘুরছে বিদেশ তোমার টাকায় ভর করে
দেশে তুমি খাচ্ছ লাথি,খাচ্ছে তারা পেট পুরে;
খেয়ে না খেয়ে জমিয়ে টাকা,করছো বড় অঙ্কটা
তোমার টাকা করছে চুরি সংসদের ওই মন্ত্রীটা;
সোনালি হোক রুপালি হোক,ডাকাতি হয় সবখানে
করছে কারা লোপাট এসব,টাক মন্ত্রীটা সব জানে;
সর্বোচ্চ সতর্কতায় হয় কি করে প্রশ্ন ফাঁস?
তোমার মেধা করছে চুরি,করছে জাতির সর্বনাশ;
রাষ্ট্র তোমার থামচে ধরা হিংস্র শকুন,সাপ-খোপে

সত্য কথা বললে রে ভাই কল্লা নেবে এক কোপে;
পত্রিকা আর পত্রিকা নেই,সরকারি সব চামচ্চা তে
দেখছি শেষটা,ভরলো দেশটা মীর জাফর আর আমলাতে;
সংসদে ভাই মন্ত্রী মশাই দাঁড়িয়ে বলে,- 'সব রবে'।
আলাদীনের চেরাগ ফুঁড়ে পদ্মা সেতু বের হবে;
এই রাষ্ট্রের ভীষণ প্যারা নোবেল জয়ী ইউনুসে
আমেরিকা চাপ দিলে তা,কে শোনে?আর কে পুঁছে?
দেখলে বসে টিভি চ্যানেল,খুললে পরে পত্রিকা
মনে হবে দেশটি আমার হয়েই গেল আম্রিকা;
রাশিয়া থেকে বিরাট অঙ্কের অস্ত্র করে আমদানি
তারপরেও ফেলানী খাতুন সীমান্তে হয় কোরবানি;
ভুরি ভুরি উন্নয়নের শুনছি কত সুখ-বাণী
'নোংরা শহরে' শীর্ষ দুইয়ে আমার দেশের রাজধানী;
উন্নয়নের এমন জোয়ার মিছেও তাতে নাই ভাঁটা
এসব কথা বললে পরে, আমি নাকি ঠোঁটকাটা?

শুভেচ্ছা নাও শুভেচ্ছা নাও

রক্তমাখা এই সকালের, তরতাজা এক শিশুর লাশের,
রাস্তাজুড়ে ছড়িয়ে পড়া,পিন্ড মগজ রক্তধারা
গাড়ির চাকায় পিষ্ট হওয়া- এক পথিকের শুভেচ্ছা নাও।

বস্তাভর্তি লাশের টুকরো,ট্রাম চাপা এক বোবা কান্না-
গর্ভবতী হিন্দু মায়ের, ভাগ্য-ফেরে লাথির দায়ের
প্রসবকৃত মৃত শিশুর- শুভেচ্ছা নাও শুভেচ্ছা নাও;

প্রশ্নফাঁসে স্বপ্নভাঙার দায় মেটাতে,
যে মেয়েটি একটু আগে, ফ্যানের সাথে জড়িয়ে দিলো তার গলাটা;
পুলিশ সমেৎ যে জননী
সেদিন হলো গণধর্ষিত-
সেই সে মায়ের ইজ্জতের এই সোনার দেশের
সাত সকালের মিষ্টি হাওয়ার শুভেচ্ছা নাও শুভেচ্ছা নাও;

রাজনীতির এক দাবার চালে
মূর্তি ভাঙার অন্তরালে
পূজোর নামে চাঁদাবাজির,উৎসবপ্রিয় এই এক জাতির
ভাগাভাগির-দাগাদাগির, কাটা-কাটির শুভেচ্ছা নাও;

শুভেচ্ছা নাও রানা প্লাজার সেই শ্রমিকের
পাথর চাপায় হারিয়েছে যে দু দু'টি পা
কিংবা নিও রাজন নামের সেই বালকের
চুরির দায়ে মরতে হলো লোহার ঘাতে;

দিন-দুপুরে মার্ডার হওয়া তরুণ লেখক
তাজা রক্তে আর্দ্র হওয়া শক্ত মাটির
কাঁটাতারে কাকের মতোন
ঝুলন্ত এক মৃত কিশোরীর

নির্দোষ বলে মুক্তি পাওয়া সেই খুনীদের-
অট্টহাসি খেল-তামাশার
শুভেচ্ছা নাও শুভেচ্ছা নাও;

শুভেচ্ছা নাও সেই বাবাটির
ছেলের শোকে করুণ সুরে,
আকাশ-পাতাল এক করে যার আহাজারি
বৃদ্ধ মায়ের চোখের জলের
বুক ফাঁটানো আর্তনাদের
গুমরে কাঁদা ভাইয়ের শোকে প্রিয় বোনটির;
শুভেচ্ছা নাও শুভেচ্ছা নাও;

শুভেচ্ছা নাও বাঙলাদেশের
বুকজুড়ে যার মৃত্যু লেখা
সর্বক্ষণ মৃত্যু যেথা-
তোমার-আমার ভাগ্য রেখা;
শুভেচ্ছা নাও, শুভেচ্ছা নাও....

সমাপ্ত

হারুন ইয়ায়াহিয়ার বই-

http://harunyahya.com/list/type/1/name/Books/

২০০০ এর ও বেশি বই-

https://drive.google.com/drive/shared-with-me

বই ডাউনলোড করার কিছু ভাল ওয়েবসাইট-

Kalamullah.com

Muslim e-Library

Icsbook.com

Youtube এর ভাল কিছু চ্যানেল-

Rational Believer

FreeQuranEducation

Guide to Islam

The Productive Muslim

Onereason.org

eDialogue.org

LinguisticMiracle

Productivemuslim.com

কিছু ভাল অ্যাপ-

Ihadis

Mecca3D

Bangla Hadis

Hisnul Muslim

Hadith.do

Arabic Learnig Game by Darul Arqam studios

Donate Quran

Pocket Dawah App

Al Quran (green tech)

মুসলিম গ্যালারি

Zakir Naik

জাকির নায়েক

আরিফ আজাদ

Nouman Ali Khan

FATIH
SEFERAGIC

Harris J

আসছে...

মুসলিমদের
লেখা